লোককবি রাধারমণ : জীবনদর্শন ও কবিতা

মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত **লোককবি রাধারমণ : জীবনদর্শন ও কবিতা** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ৩-১৪
রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থের জীবনবৃত্তান্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫-৪১
রাধারমণের জীবনদর্শন

তৃতীয় অধ্যায় ৪২-৯২
বৈষ্ণব পদাবলির ধারায় রাধারমণের কবিতা

চতুর্থ অধ্যায় ৯৩-১৩২
রাধারমণের কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক

পঞ্চম অধ্যায় ১৩৩-১৫২
রাধারমণের পদাবলিতে মানুষ ও সমাজ

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৫৩-১৬৯
বৈষ্ণবপদ রচনায় রাধারমণের স্বকীয়তা

সপ্তম অধ্যায় ১৭০-১৯৫
রাধারমণের রচনায় পূর্ববর্তী সাহিত্যের প্রভাব

অষ্টম অধ্যায় ১৯৬-২০৮
পরবর্তী কবিদের রচনায় রাধারমণের প্রভাব

নবম অধ্যায় ২০৯-২২০
রাধারমণের অন্যান্য গান

দশম অধ্যায় ২২১-২২৫
উপসংহার

সহায়ক গ্রন্থ ২২৬-২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

লোককবি রাধারমণ : জীবনদর্শন ও কবিতা

মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের লোককবিদের মধ্যে রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ (১৮৩৪-১৯১৫) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শতবছর আগে তিনি দেহত্যাগ করলেও তাঁর গানের বাণী এবং সুর আমাদের এখনো আকৃষ্ট করে।

বর্তমান গবেষণাকর্মে আমরা রাধারমণকে প্রধানত দুই রূপে প্রত্যক্ষ করি : সাধক এবং কবি। তিনি বিশিষ্ট সাধনরীতির অনুসারী উপাসক এবং বৈষ্ণব পদাবলির ধারার গীতিকবি।

রাধারমণের জন্ম বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জে। তাঁর পিতা রাধামাধব দত্তের কবিখ্যাতি ছিল এবং তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। রাধারমণ সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন কি-না - এ তথ্য অজ্ঞাত। তবে কবিতার রস ও ছন্দ-অলংকার এবং অধ্যাত্মসাধনা সম্পর্কে যে প্রজ্ঞার পরিচয় তাঁর পদে পাওয়া যায় তাতে বলা যায় যে, পাঠ-চর্চার অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি স্বশিক্ষিত তথা সুশিক্ষিত হয়েছিলেন।

জন্মের পূর্বেই পিতৃহারা এবং শৈশবে মাতৃহারা রাধারমণের জীবনে অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অবগুণ্ঠন প্রত্যক্ষ। পরে চার পুত্রের মধ্যে তিন পুত্রের অকাল মৃত্যু এবং স্ত্রীর প্রয়াণে তিনি গৃহত্যাগী হন। ক্রমশ নির্জন আশ্রমে সাধনায় মগ্ন হন এবং তখনি রচিত হতে থাকে বৈষ্ণবপদ। তিনি মুখে মুখে তা রচনা করতেন এবং শিষ্যরা তা মুখস্থ করে রাখত। এভাবে মুখে মুখে তাঁর গান ছড়িয়ে পড়ে। এ-পর্বে তিনি সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন।

তাঁর কবিতা বা গানে বৈষ্ণব, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলতত্ত্বের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে কোন ধর্মমতকে তিনি জীবনার্থ অনুসন্ধানে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তা নির্ণয় করা কঠিন। কবিতায় বৈষ্ণব হিসেবে রাধারমণের যে আত্মপ্রকাশ, তা ভাগবৎ অনুসারী ভক্তিতত্ত্ব অতিক্রম করে গৌড়ীয় প্রেমভক্তিতে উপনীত। এযাবৎ প্রকাশিত তাঁর সহস্রাধিক পদের সিংহভাগের বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এর মধ্যে শ্রীচৈতন্যবিষয়ক পদের প্রাচুর্য বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। গৌড়ীয় গোস্বামীগণ বৈষ্ণবদর্শনের যে-নতুন ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাতে রাধাকৃষ্ণের প্রতীকে জীবত্মা-পরমাত্মার যে-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা-ই প্রস্ফুটিত কবির পদে। এই বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয় হলেও রাধারমণের গানে বা কবিতায় দেহবাদী সাধনা এবং গুরুকেন্দ্রিক যে-সাধনভজনের উল্লেখ রয়েছে তা বৈষ্ণবের অনুষঙ্গ নয়। তন্ত্র-যোগ সাধনার ধারবাহিকতায় বিকশিত সহজ-সাধনা এবং বৈষ্ণব-সাধনার সমন্বয়ে পুরুষ-প্রকৃতি, প্রজ্ঞা-উপায়ের সাথে রাধাকৃষ্ণ মতবাদ যুক্ত হয়ে যে-নতুন ধর্মমত তৈরি হয়, তার নাম বৈষ্ণব সহজিয়া। রাধারমণের কবিতায় বৈষ্ণব ও সহজিয়ার যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

সহজিয়া বৈষ্ণবের সাধনপদ্ধতির সঙ্গে গভীর সাযুজ্য রয়েছে বাউলমতের। দুটোরই রয়েছে দেহবাদী সাধন-রীতি এবং গুরুকেন্দ্রিক ধর্মাচার। রাধারমণের জীবনদর্শনকে জানার জন্য বৈষ্ণব, সহজিয়া-বৈষ্ণব এবং বাউলমতের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, সহজিয়া বৈষ্ণবের দর্শনই তাঁর জীবনদর্শন।

বৈষ্ণবপদ রচনায় রাধারমণের স্বকীয়তা হল : আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভাষা, রাধাকৃষ্ণের চরিত্রচিত্রণ, বাঁশির উপস্থাপনা, ভণিতা, গীতিধর্মী পদ, গভীর আবেগের প্রাবল্য। তাঁর কবিতার মৌল বিষয় প্রেম – রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। প্রার্থনা, দেহতত্ত্ব এবং শ্রীচৈতন্যও তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়। এছাড়া শক্তিবন্দনা, ত্রিনাথবন্দনা, বিয়ে, সমসাময়িক বিষয় নিয়েও তিনি গীতিকবিতা রচনা করেছেন।

রাধারমণের পদাবলি বৈষ্ণবের সাধনকথা হলেও তা মানবিক ভাবাধারে প্রকাশিত। এর অন্তরে তত্ত্বকথা, কিন্তু বাইরে মানবিক প্রেমের উপাখ্যান। এর চরিত্রগুলো রাগ-অনুরাগ, বিরহ-মিলনের দুঃখ-সুখকে ধারণ করে আছে, যা ধর্ম-বর্ণ-স্থান-কালের অতীত। ফলে রাধারমণ দত্তের পদের দুটি মাত্রা : একটি সাধনার, অপরটি শিল্পের। রাধারমণ পাঠক-শ্রোতার নিকট স্থায়ী হয়ে আছেন যতটা না সাধকরূপে, তার চেয়ে বেশি কবিরূপে। প্রেম-সম্পর্কের নানা দিক প্রকাশের যে শিল্পপ্রচেষ্টা, তা সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালি পাঠক-শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করেছে। ফলে রাধারমণের পদ কেবল রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকথা প্রকাশের বাহন আর থাকেনি, মানবিক চিরায়ত প্রেমগাথার আধার হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থের জীবনবৃত্তান্ত

১.১ রাধারমণের জন্ম

লোককবি রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থের জন্ম বর্তমান সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার অন্তর্গত কেশবপুর গ্রামে। কবির জন্মস্থান সম্পর্কে ঐকমত্য থাকলেও (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৮, চৌধুরী গোলাম আকবর ১৯৮১ : সংগ্রাহকের কথা, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ১৯৮৮ : আ-৩, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৯১ : ৩, নন্দলাল শর্মা ২০০২ : ১) তাঁর জন্ম-সাল নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। রাধারমণ আতুয়াজান পরগণার কেশবপুরের দত্তবংশে আনুমানিক ১২৪০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বলে জীবনীকার উল্লেখ করেন (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৮)। কবির প্রপৌত্র নিশিতরঞ্জন দত্ত কবির জন্ম-সাল হিসেবে ১২৪০ বঙ্গাব্দ (১৮৩৩ খ্রি.) উল্লেখ করেছেন (নিশিতরঞ্জন দত্ত ২০১২)। কবির উত্তরপুরুষ কর্তৃক সম্পাদিত *রাধারমণ-এর নির্বাচিত গান*-সংকলন উপর্যুক্ত সালকেই সমর্থন করে। 'সাধক বাউল রাধারমণ: জীবনগাথা' প্রবন্ধে জীবনীকার জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক কবির বর্তমান প্রজন্মের অভিমতকে নিঃসংশয়ভাবে গ্রহণ করেন (নূরুল ইসলাম : তা.বি., পৃ.ন.বি.)। *বাউলকবি রাধারমণ গীতিসংগ্রহ* গ্রন্থেও একই তথ্য পাওয়া যায় (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ১৯৮৮ : ৩)। তবে ভিন্নমত পোষণ করেন *রাধারমণ গীতিমালা*র সংগ্রাহক ও সম্পাদক নন্দলাল শর্মা। তাঁর অভিমত, কেশবপুরে রাধারমণের ভিটা খননকালে পিতলের তৈরি একটি প্রাচীন সিলমোহর পাওয়া যায়। তাতে লেখা '১২৪১ বাং শ্রীরাধাকিসব দত্ত পাঁচ তারিক শ্রীরাধামাধব দত্ত আতুয়াজান'। রাধাকিসব (রাধাকেশব) নামে রাধামাধব দত্তের কোনো সন্তানের নাম পাওয়া যায় না। রাধারমণের অনুজ কেউ ছিলেন না। 'রাধারমণের পিতৃদত্ত নাম রাধাকেশব হতে পারে। গুরুদত্ত নাম হতে পারে রাধারমণ।...কাজেই ১২৪১ বঙ্গাব্দকেই তাঁর জন্মসাল বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত' (নন্দলাল শর্মা ২০০২ : ১-২)। তাঁর অনুমান রাধারমণের জন্মতারিখ বৈশাখ থেকে পৌষ মাসের মধ্যে যেকোনো মাসের পাঁচ তারিখ। তবে এই অনুমানের কোনো কারণ উল্লেখ করেননি।

উপর্যুক্ত অনুমানকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সংশয়মুক্ত হওয়া যায় না, যদিও পিতলের সিলমোহরে অঙ্কিত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তি আছে। উক্ত গ্রন্থের (*রাধারমণ গীতিমালা* : জুন, ২০০২) সম্পাদক নন্দলাল শর্মা রাধারমণ দত্ত ১২৫০ বঙ্গাব্দে পিতৃহারা হন বলে তথ্য প্রদান করেছেন। অথচ, এর কয়েক বছর পর প্রকাশিত একই লেখকের *সিলেটের জনপদ ও লোকমানস* (প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০০৬) গ্রন্থে রাধারমণের পিতা রাধামাধবের প্রয়াণ সম্বন্ধে উল্লেখিত হয় : '১২৪০ বাঙ্গাব্দের দিকে তিনি পরলোকগমন করেন' (নন্দলাল শর্মা ২০০৬ : ৯৬)। নন্দলাল শর্মা পরিবর্তিত তথ্য-বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। সর্বশেষোক্ত তথ্যকে যদি অধিকতর নির্ভুল ধরে নেই, তবে রাধামাধব দত্ত তার

সন্তানের নামকরণ করে যেতে পারেননি – এ ভাবনাই যুক্তিসংগত। কবির পদও এই ভাবনাকেই সমর্থন করে :

গুরু আমার উপায় বল না
জন্মাবধি কর্মপোড়া আমি একজনা।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল
সুখ বুঝি আর দিলায় না ॥
শিশুকালে মইরা গেলা মা
গর্ভে থইয়া পিতা মৈলা চক্ষে দেখলাম না।
গুরু কে করিবে লালন পালন কে করিবে তুলনা ॥
...
ভাইবে রাধারমণ বলে মানবজনম যায় বিফলে
গুরুর চরণ পাব প্রাণ জুড়াব এই আশা মোর পুরল না ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬)

মাতৃগর্ভে থাকাকালে পিতার মৃত্যু এবং শৈশবে মাতৃবিয়োগের যে তথ্য আমরা উপর্যুক্ত পদ থেকে প্রাপ্ত হই, তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভিত্তি পাওয়া যায়। পদটি রাধারমণের কি না এ-বিষয়ে কারো কারো দ্বিমত থাকলেও এটি রাধারমণের নামাঙ্কিত এবং এ-পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রতিটি সংকলনে এর অন্তর্ভুক্তি রয়েছে।

এসব বিবেচনায় নিলে রাধারমণ দত্ত ১২৪১ বঙ্গাব্দে (১৮৩৪ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে জন্ম তারিখ বা মাস নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না বলে আমরা উপরি-উক্ত অনুমানকে সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করতে পারি না।

রাধারমণ গুরুপ্রদত্ত নাম – এ ভাবনার সাথেও দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ রয়েছে। রাধারমণ পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান। নামকরণের ক্ষেত্রে ভাইবোনদের মধ্যে ধ্বনিগত মিল রাখার রীতি প্রাচীন। রাধানাথ, রাধামোহন – এর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রাধারমণ-ই ধ্বনিগত সাম্য তৈরি করে। তবে পারিবারিকভাবে কারো একাধিক নাম থাকারও রীতি আছে। বাল্যাবস্থার পরে হয়তো কোনো একটি নাম টিকে থাকে। অনুমান করি, রাধারমণের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে।

১.২ রাধারমণের বংশপরিচয়

রাধারমণ দত্ত প্রবাদপ্রতিম আয়ুর্বেদ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্তের বংশজাত সন্তান (অমলেন্দু ভট্টাচার্য ২০০৪ : ৪-৫)। বীরভূম জেলার অধিবাসী এই ভিষগাচার্য সে যুগের বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'আয়ুর্বেদ দীপিকা' ও 'ভানুমতী' নামে যথাক্রমে 'চরক' ও 'সুশ্রুতে'র ওপর দুখানি টীকা রচনা করেন। এছাড়া তাঁর রচনার মধ্যে

রয়েছে *শব্দচন্দ্রিকা*, *দ্রব্যগুণ সংগ্রহ* ও *চিকিৎসা সংগ্রহ* – চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ রচনা। চক্রপাণি দত্তের পিতামহ নরহরি দত্ত দশম শতাব্দীতে রাজা মহীপাল দেবের সভাচিকিৎসক ছিলেন; এবং পিতা নারায়ণ দত্ত বঙ্গাধীশ জয়পাল দেবের রসবত্যাধিকারী ছিলেন (নন্দলাল শর্মা ২০০২ : ১)। *বাঙলী ও বাঙলা সাহিত্য* গ্রন্থে চক্রপাণি দত্তকে একাদশ শতকের বিশিষ্ট বৈদ্যক শাস্ত্রবিদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (আহমদ শরীফ ২০০০ : ৫৯)। *চক্রপাণি বংশ* গ্রন্থে চক্রপাণি দত্তের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় :

সুশ্রুত চরক ভাষ্য রচিলা না করি লাস্য
অন্যগ্রন্থ চিকিৎসা-সার ।
শব্দচন্দ্রিকা আখ্যানে খনিজদ্রব্য ব্যাখ্যানে
আয়ুর্বেদ তাঁর আবিষ্কার।
(উপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৪৬ : ৩২)

চক্রপাণি দত্তের সিলেটে আগমন এবং তাঁর বংশধরদের এখানে স্থায়ী হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও জানা যায়।

শ্রীহট্টের রাজা প্রথম গোবিন্দকেশব দেব (ভাটেরা তাম্রশাসন অনুযায়ী ১০৪৯ খ্রি.) কঠিন উদরপীড়ায় আক্রান্ত হলে তাঁর প্রাণ-সংশয় দেখা দেয় (নন্দলাল শর্মা ২০০২ : ১)। দেশের সেরা চিকিৎসকগণ বহু চেষ্টা করেও তাঁকে আরোগ্য করতে ব্যর্থ হলেন। এমতাবস্থায় ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্তকে শ্রীহট্টে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে নদীয়ায় দূত প্রেরিত হলো। রাধারমণের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক কবিতায় এ ঘটনার বিবরণ আছে :

নদীয়ার রাজা স্থানে লিপি লিখে ততক্ষণে
পাঠাইতে দত্তের কুমার।
অতি বৃদ্ধ চক্রদত্ত দূরে চলিতে অশক্ত
রাজ আজ্ঞা যায় নদীয়ায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৯৩)

বৈদ্যপ্রবর জরাগ্রস্থ – অতি বৃদ্ধ। মানবসেবায় নিবেদিত ও বিষয়-নির্লিপ্ত এই চিকিৎসক বার্ধক্যজনিত কারণে সিলেটে আসতে সম্মত হননি। অন্য একটি কারণও অবশ্য ছিল – গঙ্গার তীর ত্যাগ করে একপদও অন্যত্র গমনের অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। সুতরাং, গঙ্গাহীন শ্রীহট্টে আসতে তিনি সম্মত হননি। দূতের মুখে এই সংবাদ শ্রবণে রাজা নিরাশ হলেন। ততোধিক হতাশ এবং উপায়হীন হলেন রানি – মহারাজের সুস্থ হবার সম্ভাবনা লুপ্তপ্রায়। শেষপ্রচেষ্টা হিসেবে রানি নিজের অঙ্গের সমস্ত অলংকার উন্মোচন করে, বৈদ্যপ্রবরকে পিতা সম্বোধন করে দূত মারফত বলে পাঠালেন – ভিষগাচার্য না আসাতে মহারাজের আরোগ্যের আশা নেই। তাই এই

অলংকারেরও আর প্রয়োজন নেই। তাঁর দুঃখিনী কন্যা এ অলংকার আর পরিধান করবে না – রাজার অনুগামিনী হবে। বয়োবৃদ্ধ চিকিৎসক চিন্তিত হলেন – যদি রাজার মৃত্যু হয় তবে তিনি নারীবধের কারণ হবেন। দয়া এবং ধর্মভয় চক্রপাণি দত্তের দৃঢ় সংকল্পকে ভেঙে দিল – তিনি প্রাণাধিক পুত্রগণসহ সিলেটের দিকে রওয়ানা হলেন। চক্রপাণি দত্তের চিকিৎসায় রাজা আরোগ্য লাভ করলেন এবং রাজা গোবিন্দ তাঁকে বিশাল জনপদ প্রদান করে শ্রীহট্টে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন। ধর্মভীরু বৈদ্য গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের বাসনায় রাজার অনুনয়-প্রার্থনা রক্ষা করতে পারলেন না। তবে মধ্যম এবং কনিষ্ঠ পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দকে এদেশে রেখে জ্যেষ্ঠপুত্র ক্রমদীশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশপ্রত্যাবর্তন করলেন। রাজা সসম্মানে মহীপতি এবং মুকুন্দকে সেই ভূ-সম্পত্তি দান করে তাদের সম্মানিত করলেন। (অচ্যুতচরণ চৌধুরী ২০০৯ : ২১০-২১২, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ২০০৬ : ১৮২)

মহীপতি দত্তের পূর্ববর্তী নিবাস সপ্তগ্রামের অনুকরণে নতুন আবাসস্থলের নাম করা হয় সাতগাঁও। পর্যায়ক্রমে এদের বংশধরগণ বালিশিরা, সতরসতী, জগন্নাথপুর, ব্রাহ্মণশাসন, প্রভাকরপুর, কেশবপুর, দত্তবিনসনা, লাখাই, মিরাশি প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে (নন্দলাল শর্মা ২০০২ : ১)।

১.২.১ পূর্বপুরুষদের কয়েকজন

রাধারমণ দত্তের পূর্বপুরুষদের অনেকেই স্বনামে খ্যাত হয়েছিলেন। মহীপতি দত্তের অধঃস্তন নবম পুরুষের নাম বামন – কল্যাণ ও কন্দর্প নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। এদের মধ্যে কল্যাণ বিয়ে করেছিলেন তিনটি। তাঁর পুত্রের সংখ্যা আঠার এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সে সময় স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি এবং সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কল্যাণের একপুত্র প্রভাকর আতোয়াজান পরগণা – বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলায় বসতি স্থাপন করেন। আতোয়াজানের তৎকালীন রাজা দুর্বার খাঁ (১৪৪৫-১৫০৫) প্রভাকর দত্তকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। সেই স্থান প্রভাকরপুর নামে খ্যাত হয় (নূরুল ইসলাম : তা.বি, পৃ.ন.বি.)। *গঙ্গা থেকে সুরমায়* বর্ণিত হয়েছে এর ইতিকথা :

> প্রভাকরের পৌত্র জগন্নাথের নামে জগন্নাথপুর মৌজার নামকরণ হয়। জগন্নাথপুরের সপ্তদশ শতকের রাজা বিজয় সিংহ জগন্নাথের পুত্র শম্ভুদাসের যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্ত্রীপদ দান করেন। শম্ভুদাসের পুত্র কেশবদাস দত্তের নামেই হয়েছে কেশবপুর। কেশবপুরের দত্তবংশ শ্রীহট্টে প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত। (সুনির্মল দত্ত চৌধুরী ১৯৮৮ : ৮২, উদ্ধৃত : অমলেন্দু ভট্টাচার্য ২০০৪ : ভূমিকা ৫)

চক্রপাণি দত্তের বংশধরগণ পরবর্তীতে জগন্নাথপুরের রাজকর্মচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দেওয়ান–মন্ত্রীসহ নানা পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত হন (মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ২০০৬ : ১৮২)। হবিব খাঁ কর্তৃক বিজয় সিংহ নিহত হলে রাজপরিবারের মতোই দুর্দশা নেমে আসে রাজকর্মচারীদের ওপর। অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির বর্ণনায় দত্তবংশের পরবর্তী ইতিহাস উল্লেখিত হয়েছে এভাবে :

> গৃহবিবাদে জগন্নাথপুরের রাজবংশীয়গণ দারিদ্রের চরমসীমায় উপস্থিত হইলেন।...জগন্নাথপুরের অধঃপতন সংঘটন হইলে,– বিধি-চক্রে রাজবংশীয়গণ দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদের কর্মচারী, কেশবপুরের দত্তবংশীয়গণ অন্য কাহারও দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা রাজ আশ্রিত ছিলেন, রাজার অবস্থা বিপর্য্যয়ে অন্যের দ্বারস্থ হইতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই,– তাঁহারা অনন্যচিত্তে সাহিত্য-চর্চ্চায় মনঃনিবেশ করেন। (অচ্যুতচরণ চৌধুরী ২০০৯ : ৩৯৩)

এ বংশের রাধামাধব দত্ত একজন 'সাহিত্যিক' এবং রাধারমণ দত্ত একজন সাধক কবির খ্যাতি অর্জন করেন (মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ২০০৬ : ১৮২)।

১.২.২ পিতা ও পরিবার

রাধারমণ দত্তের পিতা রাধামাধব দত্ত পুরকায়স্থ এবং মাতা সুবর্ণা দেবী। রাধামাধব দত্ত কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। বাংলা এবং সংস্কৃত – উভয় ভাষায় গ্রন্থরচনা তাঁর পাণ্ডিত্য এবং সৃজনশীলতার পরিচয়বহ। তিনি কাব্য-ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় কবি জয়দেবকৃত *গীতগোবিন্দ* কাব্যের টীকা, *ভারত সাবিত্রী*, *ভ্রমরগীতা* রচনা করেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে – *কৃষ্ণলীলা কাব্য*, *পদ্মপুরাণ*, *সূর্য্যব্রত পাঁচালী*, *গোবিন্দ ভোগের গান* (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৮)। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে* (প্রথম প্রকাশ ১৯১০ খ্রি.) অপর-কোনো গ্রন্থের নাম উল্লেখিত না হলেও সম্প্রতি মেঘালয়ের শিলঙ্ থেকে প্রকাশিত *মনসা পাঁচালী* গ্রন্থ রাধামাধব দত্তের শিল্প-দক্ষতা এবং সৃজনশীল কবি-প্রতিভার সাক্ষ্যবহন করে। অমলেন্দু ভট্টাচার্যের ভাষায় :

> রাধামাধব দত্ত প্রশংসনীয় সৃজনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাব্যনির্মাণ কলায় তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল। গ্রন্থসূচনায় কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,'কবিতা কমল অতি/ নানা ভাসা নানাবিধ ছন্দ'। কোমল কাব্যদেহকে অলংকৃত করার জন্য তিনি ছন্দ নির্মিতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বাণী ভঙ্গিমায় ভারতচন্দ্রকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর এই মহত্তম কবি প্রতিভার অনুরূপ দক্ষতা তাঁর ছিল না। তবে ছন্দনির্মাণ কলায় রাধামাধবের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। (অমলেন্দু ভট্টাচার্য ২০০৪ : ২২-২৩)

রাধারমণ দত্ত তাঁর পিতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন এভাবে :

ক. সেই বংশে সম্ভ্রান্ত যে রাধামাধব দত্ত
বহু তত্ত্ব গ্রন্থে অধিকার।
জয়দেব পাণ্ডবগীতা জ্যোতিষাদি ভ্রমরগীতা
মনসা পুরাণের পয়ার।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

খ. তাল রাগ অনুবন্ধ দ্বিপদী ত্রিপদী ছন্দ
মূলকবি শ্লোকার্থ অনুসার।
সুবর্ণে মণিমুকুতা অতি সুকোমল গাথা
কবিতা মাধুর্য চমৎকার।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৯৫)

রাধামাধব দত্তের তিন পুত্র – রাধানাথ দত্ত, রাধামোহন দত্ত এবং কনিষ্ঠ রাধারমণ দত্ত।

সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান পরিবার-পরিমণ্ডলে জন্ম নেয়া রাধারমণ রাজবৈদ্য এবং রাজকর্মচারীর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে পশ্চাতে ফেলে, পিতার রীতি-ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে নিজস্ব এক মার্গের গূঢ় সাধনাকে অনুসরণ করে জীবন-যাপনের নিগূঢ় দার্শনিকতায় এবং শিল্পের নান্দনিকতায় আত্মপ্রকাশ করলেন।

১.৩ শৈশব থেকে জীবন-সায়াহ্ন

রাধারমণ দত্তের শৈশব-কৈশোর সম্বন্ধে তেমন জানা যায় না। তাঁর বিদ্যাভ্যাসের হাতেখড়ি কোথায় হয়েছিল – তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন কি-না – এ তথ্যও অজ্ঞাত। তবে তাঁর স্বচ্ছ-সুন্দর হাতের লেখা যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের অভিমত – রাধারমণ শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেটা পরিবারের নিজস্ব পরিসরে হতে পারে, আবার কোনো প্রতিষ্ঠানেও হতে পারে (অমিত বিজয় চৌধুরী ২০১২)। তবে কবিতার ছন্দ-অলংকার, কাব্যচর্চা এবং অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাস সম্বন্ধে যে জ্ঞান-প্রজ্ঞার পরিচয় তাঁর পদে পাওয়া যায়, তাতে নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, পাঠ-চর্চার অনুশীলনের মাধ্যমেই তিনি স্বশিক্ষিত তথা সুশিক্ষিত হয়েছিলেন।

রাধারমণ শৈশবে মাতৃহারা হন এবং তাঁর জন্মের পূর্বেই পিতা রাধামাধব দত্ত ইহধাম ত্যাগ করেন। ফলে, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে রাধারমণের মধ্যে অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অবগুণ্ঠন প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি মৌলভীবাজারের নিকটবর্তী আদিপাশা গ্রামের শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ সেন শিবানন্দের বংশীয় নন্দকুমার সেন অধিকারীর কন্যা গুণময়ী দেবীকে ১২৭৫ বঙ্গাব্দে বিয়ে করেন (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ১৯৮৮ : আ-৩, নন্দলাল শর্মা ২০০২ : ২, নূরুল ইসলাম : তা.বি., পৃ.ন.বি.)। তাঁদের চারপুত্র – রাসবিহারী, নদীয়াবিহারী, রসিকবিহারী ও বিপিনবিহারী দত্ত (নূরুল ইসলাম : তা.বি., পৃ.ন.বি.)। কিন্তু 'জন্মাবধি কর্মপোড়া' রাধারমণের গৃহীর সুখ বোধহয় বিধিলিপিতে লেখা হয়নি। বাল্যাবস্থায় পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে যে বিয়োগব্যথাকে তিনি অন্তরে লালন করছিলেন, সময়ের আবর্তে তা-ই বহুগুণে বর্ধিত হয়ে উপস্থিত হয় তাঁর জীবনে। একে একে তিন পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটে – যা তাঁর মধ্যে সংসার-অনাসক্তি এনে দেয়। অতঃপর প্রিয়তমা পত্নীর আকস্মিক দেহত্যাগ তাঁর ইহলৌকিকতার বন্ধনকে একেবারে ছিন্ন করে দেয়। স্ত্রীর প্রয়াণের পর রাধারমণের একমাত্র জীবিতপুত্র বিপিনবিহারী মৌলভীবাজারে মাতুলালয়ে গমন করেন। স্ত্রী-

পুত্রকে হারিয়ে সংসার-বিবিক্ত রাধারমণ তত্ত্বানুসন্ধানী সিদ্ধার্থের মতোই জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর উৎসানুসন্ধানে গৃহত্যাগী হলেন। পশ্চাতে পড়ে থাকলো বিষয়-সম্পত্তির প্রলোভন, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতার বন্ধন। কবির বয়স যখন পঞ্চাশ – ১২৯০ বঙ্গাব্দে মৌলভীবাজারের ঢেউপাশা গ্রামের রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তাঁর স্থায়ী গৃহত্যাগ এবং সহজ-সাধনার আরম্ভ। তিনি ব্যক্তিগত জীবনাচরণ, চিন্তাসূত্র এবং সংগীতচর্চায় গুরু রঘুনাথের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। রাধারমণ নিজগ্রাম কেশবপুরে বাড়ির কাছে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ১৯৮৮ : আ–৪, মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন ২০০২ : ২১, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ২০০৪ : ৩১-৩৩, স্বপন নাথ ২০১১ : ১৯৮)। কবির পদে এর উল্লেখ রয়েছে :

অরণ্য জঙ্গলার মাঝে বানাইয়াছি ঘর
ভাই নাই বান্দব নাই কে লইব খবর।
অকুল সমুদ্রমাঝে ভাসিয়া ফিরে পেনা
কতদিনে দয়াল গুরু লওয়াইবায় কিনারা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮৫)

নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী লোককবির জীবনকথায় উল্লেখ করেছেন :

> প্রথম জীবন থেকেই রাধারমণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। তিনি ঈশ্বরলাভের উপায় জানিবার জন্য সমসাময়িক সাধকদের উপদেশাদি শ্রবণ করিয়াছেন। শাক্ত, বৈষ্ণব সকল মতবাদেরই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার চিত্ত সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। বয়স যখন পঞ্চাশের কাছাকাছি, তখন ইটা পরগণার ঢেউপাশা নিবাসী রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের অলৌকিক কার্য্যকলাপ ও সাধনার কথা শুনিয়া এক শুভমুহূর্তে তিনি ঢেউপাশা যাত্রা করেন। রঘুনাথের সান্নিধ্যে রাধারমণের তৃষিতহৃদয় বারির সন্ধান পাইল। রাধারমণ রঘুনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গুরুর উপদেশে রাধারমণের হৃদয়- কন্দরের শুষ্ক-সুপ্ত-প্রেম-নির্ঝরিণী পরিপূর্ণ ও জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি সহজিয়া পদ্ধতিতে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৮-১৭৯)

গৃহী থাকাবস্থায়ই তাঁর তত্ত্বানুসন্ধানের খবর আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প-বিস্তর ভক্ত-শিষ্যও জুটে যায়। শিষ্যবর্গের সহযোগিতায় ও রাধারমণের ধ্যান-সাধনায় আশ্রমটি কীর্তনমুখর হয়ে ওঠে। সহজিয়া পদ্ধতিতে তিনি সাধনায় উপনীত হন (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৯)। রাধারমণের পিতা রাধামাধব দত্ত 'বাংলা সাহিত্যের সমঝদার, কবি এবং ধর্মমতে সনাতনী হিন্দু, আধ্যাত্মিকতায় সহজিয়া বৈষ্ণব মনোভাবাপন্ন ছিলেন' (চৌধুরী গোলাম আকবর ১৯৮১ : গ)। সহজধর্মের সিদ্ধপুরুষ রঘুনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণকারী রাধারমণ মূলত সহজিয়া মতের বৈষ্ণব (নৃপেন্দ্রলাল দাশ ২০০৮ : ১৫)।

অর্ধ-শতাব্দীর অনভ্যাস ও বাধাকে অতিক্রম করে রাধারমণের কবিপ্রতিভা বিকশিত হতে আরম্ভ করলো। ভাবাবেশে কবির যখন যে-অনুভূতি হতো তা-ই সহজ-সরল নিজস্ব ভাষায় – নিগূঢ় প্রেম-রসাত্মক বাউল সংগীতের ভেতর দিয়ে তা প্রকাশ পেতে থাকল। 'যখন তিনি ভাবাবিষ্ট হইতেন, তখন তিনি সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ভাবাবেশ ব্যতীত সংগীত রচনা করিতে পারিতেন না। তাঁহার শিষ্যেরা সংগীতগুলি মুখস্থ করিয়া লইতেন' (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৯)। কবির পদ :

ক. ভোমর কইও গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাধার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া।
ও ভোমররে কইও কইও আরে ভোমর কৃষ্ণরে বুঝাইয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১৯)

খ. প্রাণসখীরে ঔ শোন কদম্ব তলে বংশী বাজায় কে?
বংশী বাজায় কেরে ধনি বংশী বাজায় কে।
মাথার বেণী বদল দেব তারে আনিয়া দে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩০০)

কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা রাধারমণের প্রেম-সংগীত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরীর গীতল ভাষ্য :

> প্রেমের নদী উজান বহে। রাধারমণের এই প্রেম-প্রবাহ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সমগ্র সুরমা উপত্যকায় প্রেমের বান ডাকিল। শত শত রস-পিপাসু রাধারমণের পদতলে মাথা লুটাইয়া দিল। রাধারমণ দত্ত – গোসাই রাধারমরণ আখ্যাপ্রাপ্ত হইলেন।...বঙ্গসাহিত্যের আদি কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদাবলীতে বাৎসল্য, শান্ত, আদিরসের একত্র সামাবেশ দেখিতে পাই, কিন্তু রাধারমণের ভাবাবিষ্ট হৃদয়ের পুণ্য প্রেমধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাউল সংগীতের মাধ্যমে যে ভাবে শ্রীরাধার বিরহবেদনা ও কাতরতা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে, তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্য কোথাও এমন প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে কিনা জানি না। (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৯-৮০)

রাধারমণ কয়েকহাজার গান রচনা করেছেন বলে অনুমান করা হয়। ইতোমধ্যে সহস্রাধিক গান বিভিন্ন সংগ্রাহক কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কবি যখন ভাবাবিষ্ট হতেন কেবল তখনই তিনি গীত রচনা করতে সক্ষম হতেন। শিষ্যরা তা মুখস্থ করে রাখতেন; এবং মুখে-মুখেই তা গীত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১: ১৭৯, শামসুল করিম কয়েস ২০১২ : ২০২)।[১]

---

১. রাধারমণ ভাবাবিষ্ট হলেই কেবল গান রচনা করতে পারতেন – এ তথ্যের সঙ্গে দ্বিমত করার সুযোগ কম। তবে তাঁর পদ পাঠ করে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে, তিনি ভাবপ্রবণ হয়ে মুখেমুখেই কেবল সাহিত্যরচনা করতেন – তেমন সবক্ষেত্রে সম্ভব না-ও হতে পারে। কবিতায় শব্দ, অলংকার এবং ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করলে এ কথা বলতেই হবে যে, তিনি লেখার মাধ্যমেও গান রচনা করতেন। গান লেখার জন্য তাঁর একটি প্রস্তুতিপর্বও ছিল বলে আমরা অনুমান করি। সেই সময়টা তাঁর জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছর কি-না তা ভাবনার বিষয় এবং এই অর্ধশতাব্দীকাল তিনি স্বাভাবিক গার্হস্থ্যজীবনের পাশাপাশি

১.৪ পেশা, প্রাত্যহিকতা এবং অন্যান্য

সদালাপী, মৃদুভাষী, মাঝারি গড়নের রাধারমণ সাদাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ধুতি আর নিমা (ফতুয়া) ছিল তাঁর প্রিয় পোশাক। নিরামিষাশী এই সাধককবি জীবনের সকলপ্রকার আড়ম্বরকে অপছন্দ করতেন (সাক্ষাৎকার : শুক্লা চৌধুরী ২০১২, অনিমেশ বিজয় চৌধুরী ২০১২)। শেষজীবনে কবিখ্যাতির পাশাপাশি সাধক হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে বলে লোকশ্রুতি আছে। বয়সে তাঁর কিছুটা ছোট হলেও লোককবি হাছন রাজা এবং তিনি একই সময়ে জীবিত ছিলেন। ফলে দুজনের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল তা অনুমান করা যায়। সমালোচকের মন্তব্য : 'রাধারমণ দত্ত ছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধক ও কবি এবং হাছন রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু' (প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ২০০৯ : ৬৭৯)। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনও লোককবির সঙ্গে হাছন রাজার বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেন (মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৩৮৪ : ২৯)। হাছন রাজার দৌহিত্র দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ দুই কবির মধ্যে পত্রযোগাযোগ ছিল বলে উল্লেখ করেন :

> হাসন রাজা রাধারমণের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের জন্য উৎসুক ছিলেন এবং প্রবাদ রয়েছে যে তার কাছে একখানা পত্র লিখে আমন্ত্রণও করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল : রাধারমণ তুমি কেমন, তোমায় আমি দেখতে চাই –।
> এ পত্রের উত্তরও নাকি রাধারমণ দিয়েছিলেন। তবে মূলপত্র ও তার উত্তর এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। (দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৯১ : ৪)

সাহিত্যপাঠ এবং সাহিত্যচর্চার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর পিতার সাহিত্যচর্চার যে ইতিহাস আমরা প্রাপ্ত হই তাতে বলতে পারি – পাঠ এবং চর্চার ক্ষেত্রে যে পরিবেশ প্রয়োজন, তা রাধারমণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্য রচনার জন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণবপদাবলি এবং বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসের প্রাথমিক পাঠ তিনি পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে পাঠের মাধ্যমে পেয়ে থাকতে পারেন যার প্রভাব আমরা তাঁর পদে লাভ করি। ফলে, আমরা অনুমান করি, রাধারমণ প্রথম জীবন থেকেই গান বা কবিতা রচনায় সচেষ্ট ছিলেন।

প্রসঙ্গত বলে নেয়া প্রয়োজন যে, রাধারমণ প্রায় শতবছর পূর্বে গত হয়েছেন এবং তাঁর বিষয়ে সামান্য কিছু লিখিত তথ্য আমরা প্রাপ্ত হই, তা-ও তাঁর মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পরে লেখা। ফলে তাঁর বিষয়ে তথ্য আবিষ্কারের জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে কবির বর্তমান প্রজন্মের সদস্যগণ, লোকশ্রুতি এবং কবির রচিত গান। এক্ষেত্রে শেষোক্ত উৎস আমাদেরকে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে প্ররোচনা জোগায়। দুএকটি উদাহরণ দেয়া যায় :

আশ্বিনে অম্বিকা দিলেন সুদেখা
জীবের উদ্ধারে।
যেই ভাগ্যবান করবে পূজন
সপ্তমী বাসরে ॥
হেরি মার শোভা অতি মনোলোভা
আনন্দ সাগরে।
দীন দুঃখী জনে অতি শ্রদ্ধা মনে
অন্নদান করে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৯)

এ প্রসঙ্গে হাছন রাজার প্রপৌত্রের বক্তব্য : 'পল্লী কবি রাধারমণের আর্থিক অসুবিধার সময় হাছন রাজা তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতেন' (দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা ২০০৯ : ৫৩)। তবে এ বিষয়ে তথ্যপ্রমাণ না পাওয়া গেলেও অনুমান করা যায় – দুই কবির মধ্যে পরিচয় এবং জানাশোনা ছিল।

সিলেটসহ নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে (বর্তমানে জেলা) তাঁর যাতায়াত ছিল বলে অনুমান করা হয় এবং কবির পদে নামসহ সে স্থানগুলোর উল্লেখ রয়েছে। ঢাকা এবং কলকাতায়ও তিনি কখনো গিয়েছেন বলে অনুমিত হয়। কলকাতায় বিমানের উড্ডয়ন প্রত্যক্ষ করার যে বর্ণনা তিনি কবিতায় দিয়েছেন তাতে বলা যায়, তাঁর কলকাতাদর্শন হয়েছিল। ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা যে তাঁর হয়েছিল তাও কবির পদে ফুটে ওঠে। রেলগাড়ি, রেলস্টেশন, স্টেশন মাস্টার, টিকিট ইত্যাদিকে বিষয় করে তিনি বেশকিছু পদ রচনা করেছেন।

আশ্রমবাসী হওয়ার পূর্বে তিনি সচ্ছল কৃষিজীবী ছিলেন (অমিত বিজয় চৌধুরী ২০১২)। 'ভূমিপুত্র' রাধারমণের (দীপংকর মোহান্ত ২০০৪ : ৭৫) কৃষিভিত্তিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা তাঁর কবিতায় উল্লেখিত হয়েছে :

...
ভাইবে রাধারমণ বলে বিপিন রে তুই কি কাজ কৈলে
ধান তুই বাইন করিলে শাইল ক্ষেতে আমন দিলে
আর কি বীচের নাগাল পাবে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৪)

বিপিন কবির একমাত্র দীর্ঘজীবী পুত্র। পুরো নাম বিপিনবিহারী দত্ত। কবির আত্মজীবনীতে তাঁর উল্লেখ

উপর্যুক্ত ত্রিপদীটি একটি শাক্তপদ। এরকম বেশকিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে যেখানে বৈষ্ণবপদের বাইরেও তিনি পদরচনা করেছেন এবং যেগুলো পয়ারের নানামাত্রিক প্রকাশ পাঠকের দৃষ্টি এবং শ্রুতিকে প্রীত করবে। অপর একটি শাক্তপদে আমরা লক্ষ করি কবি স্ত্রীপুত্রের বিষয়ে লিখেছেন :

আমি অনিত্য সংসার সুখে মত্ত
ভুলে ভুলে দিন যায় স্ত্রীপুত্রধনের মায়ায়
মোহের মদিরা পানে না চিন্তিলেম পরমতত্ত্ব
ত্রিতাপে তাপিত অঙ্গ অনুষঙ্গ হইল মা
মাগো মা বিনে সন্তানের দুঃখ কার কাছে কহিগো ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭৪)

এখানে স্ত্রীপুত্র-পরিবার রূপ জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে শক্তিদেবীর বর প্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে; এবং, অনুমান করি, তখন তাঁর স্ত্রীপুত্র জীবিত ছিলেন। ফলে এই পদগুলো বা বেশকিছু সংখ্যক পদ তিনি আশ্রমবাসী হওয়ার আগে বা গৃহী অবস্থায় রচনা করেছেন বলেই ধারণা করা যায়। তিনি সে পদগুলো নিজে লিখেই রচনা করেছেন। পরিবারের সদস্যদের নিকট কবির স্বহস্তে লিখিত কবিতার কোনো পাণ্ডুলিপি রক্ষিত নেই – কেউ দেখেছেন এমন কোনো তথ্যও নেই। জীবনীকারের মন্তব্য হচ্ছে: 'বাউল সাধক লিখতে পারতেন না এমন নয়। কিন্তু তিনি এই সংগীতসুধাকে সাধনার অঙ্গ মনে করতেন। তাকে টিকিয়ে রাখার কোন আগ্রহই ছিল না' (নূরুল ইসলাম : তা.বি., পৃ.ন.বি.)। যদিও জীবনীকারের উপর্যুক্ত মন্তব্য আশ্রমবাসী বৈরাগ্যধর্মী কবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – গৃহী রাধারমণের বেলায় নয়, এমন মনে করা অযৌক্তিক হবে না।

রয়েছে। তাঁর একমাত্র জীবিতপুত্র সম্বন্ধে কবির পদ :

আমার ঔরসজাত এক পুত্র ধীর শান্ত
যাহা লিখন ব্রহ্মার।
পেয়ে শ্বশুর সম্পত্তি হয়ে রাজ চক্রবর্তী
বৈসে সিংহাসনে মথুরার।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৫৬৫)

বিপিনবিহারী দত্ত মৌলভীবাজারের নিকটবর্তী ভুজবলের কর বংশের একমাত্র কন্যা কুঞ্জকুমারীকে বিয়ে করে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তবে 'বৈরাগ্য অবলম্বন'কারী পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ ছিল। তিনি ছেলেকে দেখতে নিজ শ্বশুরালয় আদিপাশা ও পুত্রের শ্বশুরালয় ভুজবলে যেতেন। বিপিনবিহারীও মাঝেমধ্যে পিতাকে দেখতে কেশবপুরে আসতেন (নূরুল ইসলাম : তা.বি., পৃ.ন.বি.)।

আশ্রমে কীর্তন হলো আরাধনার প্রধান অনুষঙ্গ। রাধারমণের কবিতায় চৈতন্যের জীবনের নানা ঘটনার উল্লেখ পাই। চৈতন্য বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখের বৈষ্ণবপদ দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন (বিমানবিহারী মজুমদার ১৯৬১ : ২২২) এবং সেসব বৈষ্ণবপদ শুনে তিনি প্রীতিবোধ করতেন – এ তথ্য, অনুমান করি, রাধারমণের অজানা ছিল না। ফলে, আশ্রমের কীর্তনে কেবল স্বরচিত গানই ব্যবহৃত হতো এমনটা প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁর গানে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব প্রত্যক্ষ করে প্রতীয়মান হয়, আশ্রমে রাধারমণ কীর্তন কিংবা পাঠে পূর্ববর্তী কবিদের বৈষ্ণবপদ ভক্তি ও মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করতেন।

'ধামাইল' গানের সঙ্গে রাধারমণের নাম জড়িয়ে আছে। 'ধামাইল' সিলেট বিভাগ ও আসামের বরাক অঞ্চলে প্রচলিত প্রসিদ্ধ নৃত্যগীতের নাম – সিলেটের নিজস্ব সম্পদ বললে অত্যুক্তি হয় না (মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ১৯৯৯ : ৩৯৯)। দু-হাতে তালি দিয়ে চক্রাকারে ঘুরেঘুরে সমবেত কণ্ঠে এই গান পরিবেশনের রীতি। বিয়ে কিংবা উৎসব-পার্বণে এই গান গীত হয় (দুলাল চৌধুরী ২০০৪ : ১৫৬)। প্রচলিত এই ধামাইল গানের গীতিকার বিভিন্ন লোককবি হলেও বর্তমানে গীতগানের সিংহভাগের রচয়িতা রাধারমণ (নন্দলাল শর্মা ২০০২ : ২৩)। রাধারমণের মাধ্যমে ধামাইলের পূর্ণতা এসেছে বলে মনে করেন অনেকেই (দীপংকর মোহান্ত ২০০৪ : ৭৫)।

কবির একটি মাত্র প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। যেটি হাতে আঁকা। কবিকে দেখে সরাসরি অঙ্কিত নয়। একটি পুরনো ফটোগ্রাফ থেকে প্রতিকৃতিটি তৈরি করা হয় । বর্তমানে অঙ্কিত চিত্রটি ব্যতীত অন্য কোনো ফটোগ্রাফ রক্ষিত নেই (নিশিতরঞ্জন দত্ত ২০১২)।

রাধারমণ স্বভাব-কবি। স্বতস্ফূর্ত কবি-প্রতিভার বিকাশ তার পদে পরিলক্ষিত হয়। তত্ত্ব-সাধনার মরমি চিন্তা এবং প্রেমমার্গের যে আন্তরিক ভক্তি কবি মর্মে লালন করেন, তা-ই গীতিময় বাণীরূপে তাঁর গান ধারণ করে আছে। লোকগবেষক ও সংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁকে 'বাউল সাধক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন (মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৩৮৪ : ভূমিকা–১৩)। লোকবিজ্ঞানী ড. আশরাফ সিদ্দিকী রাধারমণকে

'তত্ত্বসাহিত্যের কবি' উল্লেখ করে বলেন : 'আবহমান সুনামগঞ্জ তথা বাংলার লোকায়ত কবিদের শীর্ষ তালিকায় একজন – যিনি আলোকবর্তিকার মতো তিনি হলেন আমাদের রাধারমণ দত্ত, যাকে বলা চলে বৈষ্ণব পদাবলীর মহারাজা' (আশরাফ সিদ্দিকী ২০০৪ : ২৮)। 'সিলেটের সর্বত্র বাউল কবি বলে আখ্যায়িত' হলেও রাধারমণ ছিলেন মূলত 'বৈষ্ণব সহজিয়া'। 'মানুষের অন্তরের স্ফটিকস্বচ্ছপাত্রে' রাধারমণের গান জায়গা করে নিয়েছে (মোহাম্মদ আলী খান ২০০৪ : ৩৫)। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা রাধারমণের পদের গ্রহণযোগ্যতার সার্বজনীনতাকে প্রকাশ করে (দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৯১ : ৩-৪, হুমায়ুন কবীর জাহানূর ২০০৪ : ৫৮)।

১.৫ জীবনাবসান

১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৬ কার্তিক (১৯১৫ খ্রি.) শুক্রবার রাধারমণ দত্তের জীবনাবসান ঘটে (অনিমেশ বিজয় ২০১২, নিশিতরঞ্জন দত্ত ২০১২, তপন বাগচী ২০০৯ : ১৮)। লোককবির মরদেহ সুনামগঞ্জের কেশবপুরে নিজবাড়িতে বৈষ্ণবরীতি অনুযায়ী সমাহিত করা হয় (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ১৯৮৮ : আ-৩, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৯১ : ৩, নন্দলাল শর্মা ২০০২ : ২, নিশিতরঞ্জন দত্ত ২০১২)।

রাধারমণের উত্তরপুরুষগণ বর্তমানে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল এবং সিলেটে বসবাস করছেন। কেউ আবার প্রবাসে স্থায়ী হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
রাধারমণের জীবনদর্শন

২.১ জীবনদর্শন

দর্শনের সঠিক সংজ্ঞার্থ প্রদান একটি দুরূহ-কর্ম হলেও সুপ্রাচীন কাল থেকে এর স্বরূপ-সন্ধানের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ফিলসফি বলতে বোঝায় – প্রজ্ঞানুরাগ বা জ্ঞানপ্রীতি (আমিনুল ইসলাম ২০০২ : ৩)। সহজ ভাষায়, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, 'এলম'-এর ওপর 'মহব্বতে'র নাম ফিলসফি বা দর্শন। বার্ট্রান্ড রাসেল দর্শনকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের একটি মধ্যবর্তী অনধিকৃত প্রদেশ (No Man's Land) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (বার্ট্রান্ড রাসেল ২০০০ : ১)। সক্রেটিস ও প্লেটো থেকে আরম্ভ করে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক-জগতে প্রচলিত ধারণা – জ্ঞানাহরণই দর্শনের প্রধান কাজ (গোবিন্দচন্দ্র দেব ২০০৪ : ২৭)।[১]

চেতনাবিকাশের একটি স্তরে এসে মানুষ জগৎপ্রবাহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে যুগপৎ বিস্ময় এবং কৌতূহলে আপ্লুত হয়। এই বিশ্বব্যবস্থা ও তার গতিপ্রকৃতির উৎসানুসন্ধানে নানা প্রশ্ন-উত্থাপন করে। জগৎ-সংসারের সৃজনে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তার ধারণায় উৎসুক হয় এবং আকুল জিজ্ঞাসায় সে প্রশ্ন করে – আমি কে? আমার উৎপত্তি এবং পরিণতি কী? জীবনযাপনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যই-বা কী? জ্ঞান ও সত্যের স্বরূপ কী (আমিনুল ইসলাম ২০০২ : ১)।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকগণ বিস্ময়বোধকে দর্শনের মৌল-প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করলেও আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্টের মতে – বিস্ময় নয়, সংশয় থেকেই দার্শনিক চিন্তার সূচনা (আমিনুল ইসলাম ২০০২ : ৪)। ভারতীয় দর্শনে দর্শন বলতে ইনটুইশন বা স্বজ্ঞা বা উপলব্ধিমূলক জ্ঞানকে বোঝানো হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এধারণা আরো সম্প্রসারিত হয়ে দর্শনের সীমা দাঁড়ায় – বিচার-বিশ্লেষণমূলক জগৎ-ভাবনা ও জীবন-সমীক্ষা; এবং এর তাৎপর্য হয় – দর্শন মানে সেই-তত্ত্বানুসন্ধান, যার মাধ্যমে উপলব্ধ হয় ব্যক্তির নিজের পরিচয় – জীবনযাপনের নিগূঢ় ভাবার্থ; ভেদ করা যায় পরম-সত্যের সন্ধান এবং পরমাত্মার রূপ-স্বরূপ (আমিনুল ইসলাম ২০০৮ : ১২)।

এসব সংজ্ঞার্থের আলোকে বলা যায়, মানবজীবনের স্বরূপ অবধারণই জীবনদর্শন (মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য ২০০৫ : ৪৭৪)। জীবনের গভীরে আলোকপ্রক্ষেপ করে এর সারাৎসার উপলব্ধির প্রক্রিয়াকে

---

১. খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে গ্রিক মনীষী পিথাগোরাস 'ফিলসফি' কথাটির প্রথম ব্যবহার করেন বলে ধারণা করা হয়। ইংরেজি ফিলসফি শব্দটির উৎপত্তি 'ফিলিন' (ভালবাসা) ও 'সোফিয়া' (প্রজ্ঞা) – এ দুটি মূলশব্দ থেকে (আমিনুল ইসলাম ২০০২ : ৩)। জগৎ ও জীবন, জীবনযাপনের পদ্ধতিপ্রণালি, মানুষের সমাজ এবং সামাজিক চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতির মৌল-বিধানের আলোচনাকে দর্শন বলা হয় (সরদার ফজলুল করিম ১৯৮৬ : ৪৩৪)।

'জীবনদর্শন' নামে অভিহিত করা যায়।

রাধারমণ জীবনার্থ-সন্ধানে কোন মার্গ, বা পথ, বা দর্শন গ্রহণ করেছিলেন তা নির্ণয়ে তাঁর উক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তিনি নিজেকে কখনো বাউল হিসেবে প্রকাশ করেছেন। 'বাউল সঙ্গীত' রচয়িতা (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৯) রাধারমণের কিছু পদের ভণিতায় এ-পরিচয় প্রকাশিত (রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৬, ৬০, ৫০৪)। সমালোচকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধেও তাঁকে বাউল নামেই বিশেষিত করা হয়েছে (চৌধুরী গোলাম আকবর ১৯৮১ : সংগ্রাহকের কথা [পৃ.ন.বি.], আবুল ফতেহ ফাত্তাহ ২০০৪ : ৩৭, শামসুল করিম কয়েস ২০১২ : ২০২)। অপরদিকে কেউ কেউ তাঁকে বৈষ্ণব কবি, আবার কেউ তাঁকে সহজিয়া হিসেবেও অভিহিত করেছেন (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ১৯৮৮ : আ-১৮, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৯১ : ৩, মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন ২০০২ : ১৫, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ২০০৪ : ৩১)। রাধারমণ যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানবজীবন তথা জগৎসংসারকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং যা তাকে পরিচালিত করেছে সত্যানুসন্ধানের কঠিন পথে, তার স্বরূপ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাঁর দর্শন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মূল-পরিচয়ের সন্ধানে আমরা বৈষ্ণব, বৈষ্ণব সহজিয়া এবং বাউলমতের সঙ্গে পরিচিত হবো।

২.২.১ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন

বিষ্ণুর উপাসককে বৈষ্ণব বলা হয়। বৈষ্ণব একটি ধর্ম এবং দর্শনের নাম। আর্যদের তিন প্রধান দেবতার অন্যতম বিষ্ণু। সৎগুণের আধার এই দেবতার ওপর সৃষ্টিজগতের লালনপালনের দায়িত্ব অর্পিত। পৃথিবীর রক্ষাকর্তা হিসেবে বিষ্ণু অনেকবার অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্কৃতিদমন এবং ধর্মস্থাপনের জন্য তাঁকে বারবার জন্ম নিতে হয়েছে। বিষ্ণুর দশ অবতার : মাৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। ঋকবেদ সংহিতা বিষ্ণুর দেবত্বের পরিচয় বিধৃত আছে (সুধীরচন্দ্র সরকার ১৩৯৬ : ৩৫৮-৩৫৯)। মহাভারতের যুগে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পরিগণিত হন এবং বিষ্ণুর পরিবর্তে 'বাসুদেব কৃষ্ণ'-নামে উপাস্য হন। বিষ্ণুর সাথে অবতার কৃষ্ণকে অভেদ কল্পনা করেই গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন (সুবীরা জায়সবাল ১৯৯৩ : ৭৩-১০৭, ওয়াকিল আহমদ ২০০৬ : ২৫৯)।

বিশ্বাস এবং উপাসনার এমন একটি পদ্ধতি ধর্ম যার সঙ্গে সাধারণত একজন পরমপুরুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং যাতে সদাচার বা শ্রেয়োনীতিবিষয়ক একটি সংহিতা সম্পৃক্ত থাকে (মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ২০০৯ : ২৯৩)। প্রতিটি ধর্মের রয়েছে একটি মূলবিশ্বাস – যাকে ভিত্তি করে ধর্ম অস্তিত্বশীল থাকে। আমরা একে বলছি দর্শন। উপাসক সম্প্রদায়ের দর্শন ধর্মভিত্তিক। লোকায়ত ধর্মের উপাসকেরা জগৎসংসারকে তাদের ধর্মীয় চেতনার আলোকে অবলোকন করে থাকেন (ওয়াকিল আহমদ ২০১০ : ৫৫)। ধর্মদর্শনে গভীর বিশ্বাস এবং মরমি সাধনার বিশিষ্টতা প্রত্যেকটি সম্প্রদায়কে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে।

২.২.২ বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য

ধর্মের সাধন-পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয় – কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গ। সৎকর্মের মাধ্যমে পরমকে পাওয়া; জ্ঞানের মাধ্যমে পরমসত্তার স্বরূপ-উপলব্ধির দ্বারা মোক্ষলাভ; এবং ভক্তির মাধ্যমে পরমাত্মার অনুগ্রহে মোক্ষলাভ (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ক)। বৈষ্ণবেরা ভক্তিমার্গের উপাসক।

বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের উৎপত্তি-বিকাশ এবং পরিণতির রয়েছে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। এই মতবাদ সম্বন্ধে রয়েছে নানামতও। বৈষ্ণব দর্শনেরও ঘটেছে ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিবর্তন। পুরাণগুলোতে বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হলেও বিষ্ণুই সমস্ত পুরাণের অধিদেবতা (সুকুমার সেন ১৯৯২ : ৯৪)। বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা আছে। তবে পুরাণগুলোর ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিদ্বানগণ নিঃসংশয় নন। পুরাণগুলোয় অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে বলে অনেকে যৌক্তিক অনুমান ব্যক্ত করেন। কৃষ্ণলীলার বর্ণনাবিষয়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরাণ – ভাগবত পুরাণ। এতে বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি পর্যায়ে কৃষ্ণলীলা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি গোপীগণের সঙ্গে মাধুর্যলীলার বর্ণনাও আছে। এই মাধুর্যলীলার চরম প্রকাশ ঘটেছে রাসলীলায়; যদিও সেখানে রাধার নাম উল্লেখ নেই (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ১৬-১৭)। গোপীগণসহ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় খিল-হরিবংশে। এতে বিষ্ণুপর্বের বিংশ অধ্যায়ে গোপীগণসহ কৃষ্ণের রাসলীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হলেও প্রিয়তমা প্রধানা গোপীর উল্লেখ বা আভাস নেই। তবে বিষ্ণুপুরাণে ভাগবতপুরাণের মতোই রাধার নাম উল্লেখ না থাকলেও একজন প্রিয়তমা গোপীর উল্লেখ পাওয়া যায়[২] (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ১০৯)। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-এ উল্লেখিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রামাণিকতা নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহাতীত নন। মৎস্যপুরাণে রাধার উল্লেখ নামমাত্র। বরাহপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে দু-একটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ থাকলেও তার প্রাচীনতা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

---

২. ভাগবতপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণে রাধার স্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। তবে গৌড়ীয় গোস্বামীগণ ভাগবতের ভেতর রাধাকে আবিষ্কার করেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত, ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসলীলার বর্ণনায় দেখা যায়, রাসমণ্ডল থেকে কৃষ্ণ তাঁর একজন প্রিয়তমা গোপীকে নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছিলেন এবং অন্যান্য গোপীগণের অন্তরালে সেই প্রিয়তমা গোপীর সাথে বিবিধভাবে ক্রীড়া করেছিলেন। কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিরহাতুরা গোপীগণ বৃন্দাবনের এক বনপ্রদেশে কৃষ্ণের 'ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি-যুক্ত' পদচিহ্নের সাথে আর একটি ব্রজবধূর পদচিহ্ন দেখতে পায়। সেই পরম সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণপ্রিয়ার উদ্দেশ্যে বলে –

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ (১০।৩০।২৪)

ভগবান ঈশ্বর হরি নিশ্চয়ই এই রমণী কর্তৃক আরাধিত হয়েছেন, যে জন্যে গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ করে প্রীত হয়ে একে এই নিভৃত স্থানে নিয়ে এসেছেন।

'অনয়ারাধিতো' কথাটির মধ্যে রাধার সন্ধান মিলেছে বলে গোস্বামীগণের অভিমত (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ১০৮)।

রাধার প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণ উপনিষদ ও তন্ত্রাদি থেকে দু-একটি শ্লোক উদ্ধৃত করলেও এর সময় ও অকৃত্রিমতা-নির্ণয় সম্ভব হয়নি। সুতরাং, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি ধর্মগ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলার এমন কোনো নিদর্শন নেই যাকে ভিত্তি করে 'রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম চিরন্তন নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর এমন কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে' (উপেন্দ্রনাথ ১৪০৮ : ১৯)। শশিভূষণ দাশগুপ্তও এই অভিমত পোষণ করেন :

> বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে শ্রীরাধার আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া। মনে হয়, ব্রজের রাখাল-কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতগুলি রাখালিয়া-গান রূপে ছড়াইয়া ছিল। চপল আভীর বধূগণ এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়া ছিল। গান-ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচারলাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবি-কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ১২০)

তবে ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলার বহু নিদর্শন আছে। অন্ধ্র-ভৃত্যবংশীয় রাজা হাল কর্তৃক সংকলিত 'গাথাসপ্তশতী'তে রাই, কানু ও গোপীগণের কথা উল্লেখ আছে। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে সংকলিত 'গাথাসপ্তশতী' সংকলনটির গুরুত্ব অসাধারণ। প্রাকৃত ভাষায় রচিত এর কবিতায় প্রথম রাধাকৃষ্ণ যুগল-নামের উল্লেখ বলে ধারণা করা হয়। 'এই সংকলনেই কৃষ্ণকথার বৃত্তে সেই উজ্জ্বলতম সংযোজন – রাধাপ্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে' (সত্যবতী গিরি ২০০৭ : ৪০)। পরবর্তীতে অনেক কবির রচনায় রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা নানা রীতি এবং পদ্ধতিতে শিল্পরূপ লাভ করেছে। নবম শতকে কাশ্মীরের বিখ্যাত আলংকারিক আনন্দবর্ধন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ধ্বন্যালোক'-এ সংকলিত শ্লোকগুলোর মধ্যে দুটি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলার উল্লেখ আছে। দশম শতকে সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞাতনামা সংকলকের 'কবিন্দ্রবচন-সমুচ্চয়', জয়দেবের পূর্ববর্তী কালের কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতার চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ১১-১২)। সমসাময়িক অনেক কবির রচনায় রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হলেও দ্বাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ ও রাধাকে নায়ক-নায়িকা রূপে চিত্রিত করে কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' নামে এক অনন্য গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্য-পূর্ব যুগে প্রেমসাহিত্যে এটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়।

পঞ্চম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণলীলার ধারাবাহিকতা প্রত্যক্ষ করলে এই প্রতীতী জন্মায় যে, উক্ত সময়ে কাব্যসাধনার মূলে কোনো ধর্মীয় প্রেরণা কাজ করেনি – শিল্পচর্চাই ছিল এর মূলপ্রেরণা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্যরচনাই ছিল এর মৌল অভিপ্রায়। তবে এই সময়ে কাব্যরচনার বিষয় যে কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; লক্ষ্মী-নারায়ণ, হর-গৌরী প্রেমলীলাও অনেক কাব্যের আধেয় হয়। রাধাকৃষ্ণলীলার কবিরা যে বৈষ্ণব ছিলেন, এমনও নয়। প্রেমলীলাকে তারা কাব্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কাব্যানুভূতিই তাঁদের রচনার মুখ্য

উৎস, ধর্মানুভূতি যদি কোথাও পরিলক্ষিত হয়, তা গৌণ (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ২৩, মমতাজুর রহমান তরফদার ২০০৮ : ১২৪)।

পরবর্তীতে জয়দেবের কাব্যের ভাবানুসারী বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয়ক কাব্যচর্চার যে-ধারা পরিলক্ষিত হয়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে তা অলৌকিক মরমি সাধনায় উপনীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীগণ বৈষ্ণবধর্মের যে নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন – যে দার্শনিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন, তা তাৎপর্যবহ। এতে মহাভারতের নায়ক কৃষ্ণ এবং প্রাচীন গোপজাতির লোককথার নায়ক অভিন্ন হয়ে ওঠে এবং গোপী প্রধানা রাধার সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপকে দার্শনিক রূপ লাভ করে। যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে খ্যাত হয়। তবে বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ মুসলমানদের ভারতবিজয়ের পূর্বে প্রেমবাদে যেমন পরিণত হয়নি, তেমনি চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে তা জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপ পরিগ্রহ করেনি। বৈষ্ণবমতানুসারে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি ভিন্ন, আবার অভিন্নও। স্রষ্টা বা ভগবান জগতের মূলে, তা থেকে সৃষ্টি উদ্ভূত। দুই রূপই আলাদা, আবার ভেদের দূরত্বকে অতিক্রম করে স্রষ্টা ও সৃষ্টি তথা কৃষ্ণ এবং রাধা অভেদও হয়ে ওঠে (আহমদ শরীফ ২০০৫ : ৬-২০)। উভয়ে এক হয়েও লীলাচ্ছলে আবার দুই – অভেদের ভিতরে ভেদ। অচিন্ত্য শক্তিবলে এই অভেদে লীলাবিলাসে ভেদ, এটাই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব[৩] (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২১৭)। আহমদ শরীফ বৈষ্ণবতত্ত্বকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন এভাবে :

> আদিতে পরমপুরুষ স্বরূপ বিধাতা এক ছিলেন। তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। তাই নিজ অংশ থেকে নারী স্বরূপাকে সৃষ্টি করে যুগল হলেন।...তাদের সম্পর্কও প্রেমের। কাজেই সৃষ্টি প্রেমজ। তিনি চাইলেন – একোহম বহুস্যাম। কেননা আমি নিজেকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করতে চাই। আর তাই সৃষ্টি স্রষ্টার আনন্দসহচর। যেখানে স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের আনন্দের তথা প্রণয়ের সম্পর্ক সেখানে নিয়মনীতির ব্যবধান থাকতে পারে না। কাজেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের সেখানে ঠাঁই নেই। অনুরাগে প্রেমের উন্মেষ, বিরহবোধে এর উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা। (আহমদ শরীফ ২০০৫ : ২১)

---

৩. গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব বা চৈতন্যতত্ত্ব 'অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ' বা 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে পরিচিত। মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুচর-পরিকরবৃন্দ ভক্তিমার্গকে দার্শনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের এক ব্রহ্মের ধারণায় জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদের অস্বীকার করে যারা ভিন্নমত প্রচার করেছেন তারা দ্বৈতবাদী ভক্ত-দার্শনিক বলে পরিচিত (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-১১ : ২১৩-২১৬, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ভূমিকা-ক, শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২১৭)। রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', নিম্বার্কের 'দ্বৈতাদ্বৈত' বা 'ভেদাভেদবাদ', মধ্বাচার্যের 'দ্বৈতবাদ' বা 'ভেদবাদ', বল্লভাচার্যের 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদে'র পরিণতি বলা যায় 'অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ'। 'কৃষ্ণ স্বয়ম্ভূ; তিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা। নরলীলা উপভোগের জন্যে নিজের আনন্দ শক্তিকে রাধারূপ দান করেন।

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ ॥

এই অর্থে রাধাকৃষ্ণ দেহরূপে দ্বৈত, কিন্তু আত্মারূপে অদ্বৈত। বৈষ্ণব ধর্মমতে দ্বৈতাদ্বৈতের সম্পর্ক অতীব জটিল। এ কারণেই তা অচিন্ত্য'(ওয়াকিল আহমদ ২০০৬ : ২৬০)।

বৈষ্ণবমতে ভগবান রসস্বরূপ – সকলের প্রিয়, বন্ধু, আত্মাস্বরূপ। আবার তিনি রূপময়, গুণের ভাণ্ডার। এই চিরসুন্দর, চিরমধুর, চিরকরুণাময় ভগবানের প্রতি রাধারূপী বিরহী আত্মার ব্যাকুল আকুলতা, অসীম অনুরক্তি, আত্মসমর্পণের চরম ব্যগ্রতা (মনো মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ১৯) নিয়ে বিকশিত হয়েছে বৈষ্ণব দর্শন।

২.২.৩ বৈষ্ণবের দ্বাদশ তত্ত্ব ও রাধারমণের পদ

বৈষ্ণব পদাবলি পাঠে মহাজনগণ এবং প্রাচীন আচার্যগণের অনুসরণে পদাবলির মধ্যে যে-দ্বাদশ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলো : যুগলরূপ, প্রকাশ ও বিলাস, রসাস্বাদন, পরস্পরভজনা, ভগবান ও মানুষ, মানবের সাধ্যবস্তু, মানবের সাধন, পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মিলন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ভূমিকা ৫)। রাধারমণের কবিতাকে বৈষ্ণবের দ্বাদশতত্ত্বের আলোকে পাঠ করলে বৈষ্ণবমতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বা সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব।

যুগলরূপ : রসস্বরূপ কৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরূপিনী রাধার[৪] অভেদরূপই যুগলরূপ। তত্ত্বত এরা এক এবং অভিন্ন। এই অভিন্ন তথা যুগলরূপই বৈষ্ণবের উপাস্য (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ভূমিকা ৫)। কৃষ্ণ পরমাত্মা, রাধা জীবাত্মা। দুজনের সম্পর্ক প্রেমের। প্রেমাস্পদের জন্য আকুলতা প্রেমের স্বভাবধর্ম। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপে কৃতার্থ হবে। জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ। অনেকটা পানির বিন্দু এবং সমুদ্রের মতো। বিন্দু বিন্দু পানি দিয়েই সমুদ্র। কিন্তু বিন্দু হিসেবে পানির অস্তিত্ব সামান্যই। ফলে সমুদ্র তথা পরমাত্মায় বিলীন হতেই সে সদা সচেষ্ট। কেননা, তাতেই তার অস্তিত্ব সুরক্ষিত হয়। মিলনে প্রেমের সার্থকতা – প্রেমের পরিণতি একাত্মতায়। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার এই মিলনকে বলা হয় 'আনাল হক' বা 'সোহম'। সুফিমতে একে বলা হয় 'ফানাফিল্লাহ' ও 'বাকাবিল্লাহ'। বৈষ্ণবের ভাষায় এ হচ্ছে অভেদরূপ বা যুগলরূপ (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : গ-ঘ)। 'প্রেম-পরাকাষ্ঠায় মিলিত যে এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের যুগলরূপ ইহাই ভক্তের আরাধ্যতম বস্তু' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২১৭)।

---

৪. কৃষ্ণ রসসদৃশ, রাধা রতি। রূপ গোস্বামী 'রতি' বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহাভাব স্বরূপিনী রাধিকার শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করেছেন। রতি তিন প্রকার : সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কৃষ্ণের দর্শনেই কেবল উৎপন্ন হয় এবং যাতে সম্ভোগেচ্ছাই প্রধান বলে সাধারণী রতি নিকৃষ্ট। সমঞ্জসা রতি হলো পত্নীভাবের অভিমান; গুণাদি শ্রবণের দ্বারা এই রতি উৎপন্ন হলেও তাতে কখনো কখনো সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে। নিজসুখস্পৃহার সম্ভাবনা থাকে বলে তা উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু সমর্থা রতিতে নিজসুখস্পৃহা থাকে না। এই রতি ব্রজবালাদের মধ্যে কারণ-নিরপেক্ষভাবে স্বভাবত উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই সমর্থা রতিই প্রৌঢ়া হয়ে অর্থাৎ পরিণতি লাভ করে মহাভাবদশা লাভ করে। রতি ক্রমে দৃঢ় হয়ে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পরিণত হয়। এই ভাবের ভিতরে প্রেমের প্রত্যেক স্তরের সকল গুণ বর্তমান। 'এই ভাবের মধ্যে আবার যে ভাব কৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীব্রজদেবীগণের মধ্যেই সম্ভব সেই ভাবকেই বলা হয় মহাভাব'। কেবল রাধাতেই পরিপূর্ণ মহাভাবের প্রকাশ (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২৩৮-২৪৪)।

রাধারমণের পদাবলিতে রাধা এবং কৃষ্ণের মিলনাকাঙ্ক্ষা, এবং এর বিহনে অন্তর্দহনের মর্মযাতনা গীতিময় ভাষ্যে প্রকাশিত। চৈতন্যবিষয়ক একটি পদে যুগলরূপের প্রকাশ :

প্রেমরস আস্বাদনে পিপাসা বাড়িয়া মনে
মনোবাঞ্ছা পূরণ না হইল
ভাবকান্তি সুবিলাস এই তিন অভিলাষ
দুই অঙ্গে একাঙ্গ হইল।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৮)

'দুই অঙ্গে একাঙ্গ' হওয়া তথা অভেদরূপ বা যুগলরূপের আরাধনাই বৈষ্ণবের পরম লক্ষ্য।

প্রকাশ ও বিলাস : কৃষ্ণ এবং রাধা যেমন অভিন্ন, তেমনি তিনি এবং তাঁর সৃষ্টিও অভিন্ন। 'সৃষ্টির চরম এবং পরম উৎকর্ষই শ্রীরাধারূপে সপ্রকাশ। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই এই সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁহার রসময়ত্ব এবং করুণাময়ত্বই এই ইচ্ছার হেতু' (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)।

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্‌গম।
(কৃষ্ণদাস ১৩৯৭ : ১৯)

রাধারমণের গানে বিলাসপ্রত্যাশী রসিক কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। এ-বিলাস প্রেমরস আস্বাদনের। কবির জীবনভাবনায় ভগবানের করুণাময়রূপের প্রভাব ব্যাপক। ভববন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার অভিলাষে কবি করুণাময়ের নিকট নতজানু :

দয়াল হরির দয়া বিনে ভববন্ধন কে ঘুচাবে
হরি জগবন্ধু করুণাসিন্ধু আমায় নি করুণা হবে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৩)

অথবা, দয়াল হরি তুমি বিনে জীবের দুক আর কে বুঝিবে
হরি দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু বিন্দু দানে কি শুকাবে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪২)

কৃপার সিন্ধু হতে করুণা দান করলে ভগবানের ভাণ্ডার যে শূন্য হবে না, তা কবি বিশ্বাস করেন। কেননা, অন্যথায় 'হরিনামেতে কলঙ্ক রবে'। চৈতন্যবিষয়ক পদেও আমরা দেখি অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমময় এবং করুণাময় রূপ। প্রেম দিয়ে জগৎজয় করতে কলি যুগে তার আগমন। করুণা দিয়ে পাপপঙ্কিলে নিমজ্জিতকে উদ্ধার করতে তাঁর যুগলরূপ পরিগ্রহণ :

বিনামূল্যে প্রেমধন অযাচনে বিতরণ
নাহি কর কুলের বিচার।
করুণার অবতার ভবে না হইবে আর
পাপী-তাপী করিতে উদ্ধার।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১২৫)

রসাস্বাদন : লীলারস আস্বাদনের নিমিত্তে ভগবান নিজ অংশ থেকে রাধাকে সৃষ্টি করলেন (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)। বৈষ্ণবতত্ত্বে পাঁচটি রস আছে – শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পঞ্চরসের মধ্যে মধুর রসেরই প্রাধান্য। পরকীয়ায় শৃঙ্গারের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২৫৪)। রাধারমণের গানেও আমরা একই রীতির প্রকাশ দেখি।

পরস্পর-ভজনা : রাধা এবং কৃষ্ণ – সৃষ্টি এবং স্রষ্টার একে অপরের প্রতি আকর্ষণ এবং আকুলতাই পরস্পরভজনা তত্ত্ব (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)। রাধারমণের বৈষ্ণবপদে আমরা লক্ষ করি, কৃষ্ণের প্রেমে রাধা যেমন ব্যাকুলপ্রাণ তেমনি প্রেমময় আকর্ষণে কৃষ্ণও উৎকণ্ঠিত –

ক. আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একারে সুবল সখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী একবার এনে দেখা।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪২৫)

খ. সুবলরে রাধা তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা গলার হার
রাধার জন্য আমি থাকি দিবানিশি অনাহার ।
সুবলরে রাধা আমার প্রেমের গুরু আমি শিষ্য তার
রাধা প্রেমের প্রেমঋণ আমি কি দিয়ে শুধিতাম ধার।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৬৬)

ভগবান ও মানুষ : মানুষ ভগবানের সর্বোত্তম সৃষ্টি – মানুষ ভগবানেরই পরা-প্রকৃতি। মানুষ ভগবানের অংশ (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সম্পর্ক অভিন্ন বটে, আবার ভিন্নও। যেমন পানি ব্যতীত ঢেউ কল্পনা করা যায় না, আবার ঢেউয়েরও রয়েছে নিজস্ব রূপ। যেমন সূর্য এবং

রোদের সম্পর্ক ভেদ এবং অভেদ – দুই রূপেই অস্তিত্বশীল। 'অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত' অবস্থার পরিচয় ফুটে ওঠে কবির ভাষায় :

অনন্ত স্ফটিকে যেন এক সূর্য ভাসে
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।
(কৃষ্ণদাস ১৩৯৭ : ৭)

পানি এবং তার ঢেউ, সূর্য এবং তার আলোর সম্পর্কের কথাই রাধারমণ প্রকাশ করেছেন তাঁর পদে :

জুড়াতে প্রাণের জ্বালা ডাকি তোমায় মহাপ্রাণে
প্রাণে ব্যথা প্রাণ পথে ডাকি শুনো নাকি মহাপ্রাণ ॥
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে বুঝে কিসে আর প্রাণ বিনে
তাই সে আমি প্রাণের সনে মিশাতে চাই আমার প্রাণ ॥
শ্রীরাধারমণের গান শুনো নাকি মহাপ্রাণ
প্রাণ করে আনচান কেমনে জুড়াই প্রাণ।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৯)

মহাপ্রাণ এবং প্রাণ – স্রষ্টা এবং সৃষ্টির ভেদ এবং অভেদকে কবি অনবদ্য করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং মহাপ্রাণের সঙ্গে মিশতে পারলেই কেবল ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সাগরে মেশার মতোই অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে প্রাণ অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। আর তার জন্যে কবিপ্রাণের 'আনচান' করা গোপন থাকে না।

মানবের সাধ্যবস্তু : মদনের আদেশক্রমে পরস্পর মিলিত নরনারীর মধ্যে যে প্রণয়গ্রন্থি রচিত হয়, তাকেই প্রেম বলে (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৭)। মানুষের সাধ্যবস্তু প্রেম। শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)। প্রেমের মাধ্যমেই স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা যায় এবং তাঁর করুণা লাভ করা যায়। রাধারমণের পদে আগাগোড়া প্রেমেরই নিবিড় প্রকাশ।

মানবের সাধন : ভগবান ও মানুষ – দুইয়ের সম্পর্ক প্রেমের। তাই মানবের সাধ্যবস্তু প্রেম। এই প্রেমের মাধ্যমেই পরমকে পাওয়া যায়। তবে কেবল গোপীভাবের প্রেম দ্বারাই পরমাত্মার কৃপা লাভ সম্ভব (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)। কামনাবিহীন প্রেমারাধনার নাম গোপীভাব। গোপীরা রাধাকৃষ্ণ-লীলা সহচরী। রাধাকৃষ্ণের লীলা দেখা, শোনা, জানা ও সহায়তা করাই গোপীদের লক্ষ্য। পরিকর রূপে লীলা-স্মরণ ও লীলা-আস্বাদন গৌড়ীয় ভক্তগণের পরম সাধন ও সাধ্য (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২২৯)। এতেই তাদের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি – 'নিজ কেলি হোতে তাহে কোটি সুখ পায়।' এই প্রেমভক্তিবাদের দার্শনিক নাম

রাগানুগা ভক্তিবাদ[৫]। শ্রীচৈতন্য রাগানুগা ভক্তিবাদের অনুসারী এবং প্রচারক। রাধারমণের গানে এই গোপীভাব তথা নিষ্কামভাব সুস্পষ্ট :

ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ধনী রাই
অন্তিম কালে যুগল চরণ অধম যেন পাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৪৬)

নিঃস্বার্থ প্রেমে তিনি রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনেরই গুণকীর্তন করেছেন, তাদের মিলন-কামনা এবং করুণা প্রার্থনা করেছেন।

পূর্বরাগ-অনুরাগ : প্রেমোদয়ের অপর নাম পূর্বরাগ। পূর্বরাগ ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে অনুরাগে পরিণত হয় (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)। রূপমুগ্ধতা তথা রূপানুরাগের মাধ্যমে পূর্বরাগের সূচনা। পরস্পর শ্রবণ-দর্শন থেকে জাত নায়ক-নায়িকার অপ্রাপ্তিজনিত দশাবিশেষই পূর্বরাগ (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩৩১)। দ্বিতীয় স্তরে অনুরাগ – রূপ ও গুণের যৌথ প্রয়াসে বিমুগ্ধ অবস্থা (আহমদ শরীফ ২০০৫ : ২৫)।

রাধারমণের পদে রূপ এবং গুণমুগ্ধতার চিত্রের বিস্তর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণের রূপ রাধার চোখে অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। আর তাঁর বাঁশির মধুর ধ্বনি সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে নাড়া দিয়ে যায়। রাধার অন্তরে তখন কুলমান ত্যাগের বাসনা :

ক. জলের ঘাটে দেখিয়া আইলাম কী সুন্দর শ্যামরায়
শ্যামরায় ভমরা গো ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধু খায় ।
নিতি নিতি ফুল বাগানে ভমর আসে মধু খায়
আয় গো ললিতা সখী আবার দেখি শ্যামরায় ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৬)

---

৫. বৈষ্ণবমতে সাধনা দুই প্রকার : 'রাগাত্মিকা' ও 'রাগানুগা' সাধনা। রাগাত্মিকা সাধনায় সাধারণ ভক্তের সুযোগ নেই। নিত্য-ব্রজধামে সুবল, নন্দ-যশোদা কিংবা রাধিকাদি কৃষ্ণের যে-সকল নিত্য পরিকর রয়েছেন রাগাত্মিকা সেবায় বা সাধনায় কেবল তাঁদেরই অধিকার রয়েছে। রাগ তাঁদের নিত্য-আত্মধর্ম। আত্মধর্ম রাগে প্রতিষ্ঠিত থেকে যে নিত্যসেবা তা-ই রাগাত্মিকা সাধনা। আবার, একই সঙ্গে এটাও সত্য, রাধিকা হচ্ছে ভক্তশ্রেষ্ঠ। রাধার প্রেম হলো পূর্ণ মধুর রসের রাগাত্মক প্রেম। তা রাধা ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য রাধার দেহকান্তি নিয়ে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণভজনা করেন (অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯৯২ : ২১৮-২৩৪, ওয়াকিল আহমদ ২০০৬ : ২৬০)।

ভক্তের সাধন হবে রাগানুগভাবে অর্থাৎ, অনুরূপ সেবার আচরণ, শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদির দ্বারা রাগে রুচি উদ্বোধিত করে লীলা আস্বাদন করা। রাগানুগার ক্ষেত্রে সাধক কিংবা ভক্তের চিত্তে রাগবিশেষে রুচিই জাত হয়, রাগবিশেষ জাত হয় না। 'এস্থলে তাদৃশ রাগসুধাকরের কিরণাভাসের দ্বারা ভক্তহৃদয়রূপ স্ফটিকমণি যেন সমুল্লসিত হইয়া ওঠে; সেই চিত্তসমুল্লাস রূপ রুচি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে ভজন' তা-ই রাগানুগ সাধন। জীবের পক্ষে এটাই সম্ভব (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২৫৮-২৫৯)।

খ. কালায় প্রাণটি নিল বাঁশিটি বাজাইয়া
আমারে যে থৈয়া গেল উদাসী বানাইয়া ॥
কে বাজাইয়া যাওরে বাঁশি রাজপথ দিয়া
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম কুলমান ছেদিয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬০)

অভিসার : তীব্র প্রণয়বশে বা কামমত্ত হয়ে নায়ক বা নায়িকার পরস্পরসমীপে গমনকে অভিসার বলা হয় (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৩৬১, ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩৩৬)। ভগবান পরম পুরুষ। এই পরমপুরুষ বা পরমাত্মার জন্য জীবাত্মা সর্বদাই ব্যাকুল। রাধা জীবাত্মার প্রতীক। প্রেমাস্পদ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য রাধার জাগতিক বাধা অতিক্রম করে গোপন গমনকে বৈষ্ণবদর্শনে অভিসার বলা হয় (পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২ : ১২৫)। প্রাকৃত লোকদৃষ্টির আড়ালে অলৌকিক ভাবমিলন-কুঞ্জে পরস্পরের মানস বিহারই অভিসার। এতে ভগবান এবং ভক্ত উভয়েরই পরম আগ্রহ (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৭)।

রাধারমণের রাধা পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য অধীর হয়ে আছে । প্রেমাস্পদের বাঁশির সঙ্কেত-ধ্বনি তাকে তাড়িত করছে অভিসারে গমনে। তবু সাজসজ্জার কথাটি ভুলে গেলে চলে না :

শুন শুন বিনোদিনী আমার বচন
ঘন ঘন বাজে বাঁশি গহন কানন।
চল চল নিকুঞ্জেতে করি গো গমন
লহ লহ বনফুল সুগন্ধি চন্দন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১০)

বাসকসজ্জা : মানবের একমাত্র গন্তব্য স্থান শ্রীবৃন্দাবন। অভিসারের পরিসমাপ্তি সেখানে। গোপীভাবের সাধনায় হৃদয় বৃন্দাবনে রূপান্তরিত হয়। মানুষ তখন আপন ভাবানুরূপ কুঞ্জ সাজিয়ে প্রিয়সমাগমের প্রতীক্ষা করে। অতঃপর এক শুভক্ষণে 'মানবের মানস নেত্রের সম্মুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণ' এসে আবির্ভূত হন (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)। হৃদয়ে পরমপুরুষের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করাই হচ্ছে বাসক-সজ্জা (আহমদ শরীফ ২০০৫ : ২৫)। বৈষ্ণবদর্শনে রাধার গৃহ এবং দেহ সজ্জিত করে প্রেমাস্পদ কালার জন্য অপেক্ষা করার প্রতীকের মধ্য দিয়ে বাসক-সজ্জার তত্ত্বটিকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। রাধারমণের পদে প্রেমাস্পদের জন্য রাধা তথা রাধারমণের অন্তহীন অপেক্ষা :

সারা নিশি জাগিলাম বাসর সাজাই।
অভাগা রাধারমণ না আইল কানাই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৫)

মিলন : ভগবান বা পরমাত্মার সান্নিধ্য উপলব্ধি করাই মিলন (আহমদ শরীফ ২০০৫ : ২৫)। এই বাস্তব জগতেই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন ঘটে। সাধক তাঁর হৃদয়-বৃন্দাবনে, প্রাণের কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ এবং মুগ্ধতার পর্যায় অতিক্রম করে প্রেম-অভিসার; এবং মিলনপ্রত্যাশীর উৎকণ্ঠা শেষে মিলন। এই মিলনে পরমান্দ এবং পরমশান্তি। এই মিলন সাধারণের সাধ্যের অতীত। ফলে গোপীভাবের সাধক রাধারমণ রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখে আনন্দে আত্মহারা :

কী অপরূপ লীলা দেখবি যদি আয়
শ্যাম অঙ্গে রাইর অঙ্গ দিয়া রাইধনী ঝুলায়।
শ্যামের মাথায় মোহনচূড়া বাতাসে হিলায়
রাইয়ার মাথায় মোহনবেণী ভুজঙ্গ খেলায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে সময় গইয়া যায়
এমন সুযোগ সখি আর কি পাওয়া যায় ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৩)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ : রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ। 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ'-প্রাপ্তির জন্য গৌরাঙ্গচরণে শরণ নিতে হবে। আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তির ফলে স্বতঃসিদ্ধরূপেই শ্রীগৌরাঙ্গ লাভ হবে (সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫ : ৫)। রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার গৌরাঙ্গ তথা শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে সাধন-ভজন গৌরাঙ্গতত্ত্ব। রাধারমণের গানে গৌরাঙ্গ বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। চৈতন্যকে অবতার জ্ঞান করে রাধারমণ তাঁর প্রতি প্রণতি এবং আরতি জানিয়েছেন। রাধারমণের গানে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের উপস্থিতির প্রাচুর্যে অনুমিত হয়, রাধারমণ কীর্তনের শুভারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা পদ আবশ্যিকভাবে রচনা করতেন এবং তা গীত হতো। একটি দৃষ্টান্ত :

তুমি হে পরম গুরু মনোবাঞ্ছা কল্পতরু
অনাথের নাথ সারাৎসার
শ্রীরাধার ভাবাবেশে ভাবকান্তি অভিলাষে
শ্রীচৈতন্য অবতার।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১২৫)

রাধারমণের গীতিকবিতায় আমরা বৈষ্ণবের দ্বাদশতত্ত্বের যে-পরিচয় লাভ করি তাতে এই অনুমান সমীচীন যে, রাধারমণ বৈষ্ণবতত্ত্বানুসারী লোককবি। তবে এই অনুমানকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণের পূর্বে রাধারমণের গানে আরো যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

২.৩ সহজিয়া ও বাউল

অহিংসা, করুণা ও মৈত্রীর বাণী নিয়ে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধ মানবমুক্তির নতুন মতবাদ প্রচার করেন। জগৎ-জীবন ভাবনায় তাঁর প্রতীতী জন্মে – মানুষের বারবার জন্মগ্রহণ এবং দুঃখভোগের মূলে রয়েছে লৌকিক কর্মফল। তিনি অনুধাবন করেন, এ জগৎ মায়াময় – অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তির ফলে মানুষ এই মায়ার ফাঁদে ধরা দেয় এবং সমূহ দুঃখ ভোগ করে। সৎকর্ম, চিত্তসংযম এবং আত্মসাধনা দ্বারা সমাধিস্থ হলেই জীবের চিরমুক্তি ঘটে বা নির্বাণ লাভ হয়। বৌদ্ধধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য – চেতনার রূপান্তরিত অবস্থা, যে অবস্থায় আবেগ ও অজ্ঞানতা বিলুপ্ত হয়। সংসার ধর্মের দুঃখ থেকে মুক্তি লাভই নির্বাণ – যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে 'শূন্যতা'র এক অনির্বচনীয় অবস্থা – কথায় যা প্রকাশ করা যায় না।

আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মের বিপরীতে নির্বাণ ও নিরীশ্বরবাদী, অহিংস, আত্মনির্লিপ্ত বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনে ধর্ম-দর্শনের জগতে নতুন ধরনের জোয়ার বয়ে যায়। তবে কপিলাবস্তু থেকে এই মতবাদ বাংলায় পৌঁছোতে কয়েকশত বছর লেগে যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখা যায়। পালরাজাদের আমলে রচিত চর্যাগীতিতে প্রতিফলিত ধর্ম-দর্শনের জগৎ বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সাক্ষ্যবহন করে। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম নানামত-ভিন্নমতে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়, যেমন – হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি (ওয়াকিল আহমদ ২০০৬ : ২২৬-২৭)। শেষোক্ত সহজযান পন্থা এবং পরবর্তীতে বৌদ্ধসহজিয়া-গ্রন্থাদিতে 'সহজ' কথাটির প্রথম ব্যবহার হয় বলে অনেকেই মনে করেন। পরবর্তীতে মধ্যযুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাধক কবীর প্রমুখের রচনা, বাউলদের গানে 'সহজ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সহজ'-এর অপরনাম নির্বাণ, মহাসুখ, সুখরাজ, মহামুদ্রা-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ৮৬)। বৌদ্ধধর্মের যান বা মার্গ কিংবা পথে বিভক্ত হওয়ার মূলে রয়েছে সাধন-পদ্ধতি। অন্য শাখার সাথে সহজযানীদের পার্থক্য হলো, এরা দেবদেবী, পূজা, মন্ত্র প্রভৃতি আচারিক ধর্মের বিরোধী (আহমদ শরীফ ২০০৩ : ৩৯)। তবে সবকটি মার্গের লক্ষ্য নির্বাণ বা সহজানন্দ (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ : ১৫)।

সহজযানের মূল প্রসার ক্ষেত্র নেপাল ও তিব্বত। বাংলায় দোহাকোষ এবং চর্যাপদগুলো সহজানুসারী বা সহজিয়াদের রচনা। চর্যাপদ থেকে এমন ধারণা করা যায় যে, সহজিয়াদের দুই ধরনের সাধন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল – একটি মৈথুনাত্মক তান্ত্রিক পদ্ধতি, অপরটি প্রকৃতিবর্জিত বিশুদ্ধ যোগপ্রণালী (আহমদ শরীফ ২০০৩ : ৩৯)। প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মপরিপন্থী যে গভীর চিন্তা সহজযানে প্রবাহিত তার স্বরূপ-সন্ধান সহজ নয়। চরিত্র-বিশুদ্ধিকে বৌদ্ধধর্মের প্রাণ বলা হয়। সহজযান সে-পথ পরিহার করল, চরিত্র-বিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করল এবং বৌদ্ধধর্মকে সহজ করতে গিয়ে ভিন্নপথে পরিচালিত হলো, যাকে সহজযানের অধঃপতন বলা হয় (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২০১৩ : ৯৫)। তবে সহজযানের এই পতিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে প্রকটিত হয় গভীরতর তথ্য এবং তাৎপর্য। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত – সহজিয়া, তন্ত্র প্রভৃতি লোকায়ত

সম্প্রদায় আদিম কৃষিভিত্তিক জাদুবিশ্বাস[৬] থেকে জন্মলাভ করেছে। তন্ত্রসাধনার আদিরূপটির সঙ্গে সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এই তন্ত্রসাধনার ওপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতাদর্শ আরোপিত হয়েছে। এই আদিম তন্ত্রসাধনায় যেমন বৈদান্তিক চিন্তাধারা আরোপিত হয়েছে, তেমনি আবার বৌদ্ধমতও। ঠিক তেমনি সহজসাধনার ওপরও আরোপিত হয়েছে বৌদ্ধ ধ্যান-ধারণা। ফলে আমরা লক্ষ করি, সহজিয়া সাহিত্য বৌদ্ধ ধ্যান-ধারণায় যেন পরিপূর্ণ। তবুও বৌদ্ধ সাধন-চিন্তা সহজ-সাধনার পক্ষে কৃত্রিম, বাহ্যিক এবং আরোপিত। এর অন্তর্ভাগে প্রবাহিত সহজধারার প্রাচীন অকৃত্রিম রূপ (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪১৩ : ৪৬৭)। এ-বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> যোগের গূঢ় প্রক্রিয়াগুলি মূলত হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয় – বিভিন্ন ধর্মমত ও দর্শনের পটভূমিকায় তারা বিচিত্র সাধন-প্রণালীর সৃষ্টি করেছে। মৈথুন-আনন্দকে যৌগিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত করে তুরীয়ানন্দ লাভের আদর্শ গুহ্যসাধনমার্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই গুহ্যযোগ শিব-শক্তি-সাধনার সংস্পর্শে হিন্দু-তান্ত্রিকতা, প্রজ্ঞা-উপায়ের সংস্পর্শে বৌদ্ধতন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়া এবং রাধাকৃষ্ণের (গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রতি ও রস) সংস্পর্শে বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সৃষ্টি করেছে। (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৫৭-৫৮)

সুতরাং, আমরা বলতে পারি, সহজিয়া মতবাদের মূলে রয়েছে তন্ত্রসাধনা ও যোগসাধনার সম্মিলন। তাহলে, 'তন্ত্র' এবং 'যোগ' কেমন ?

সীমিতকে অসীমের আনন্দঘন নিত্যচৈতন্যে প্রতিষ্ঠা করার সাধনাই তন্ত্রসাধনা (মনো মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ১৫)। 'তন্' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'তন্ত্র' শব্দের মূলে রয়েছে বংশবিস্তারের ধারণা : তন্ + অয়ট্ = তনয়; সম্ + তন্ + ঘঞ = সন্তান। তবে তন্ত্র শব্দ কেবল প্রজননের সঙ্গে যুক্ত নয়, খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গেও এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তন্ত্র এক অর্থে তাঁত বোঝায় – যা কৃষিকাজের মতোই মেয়েদের আবিষ্কার। তন্ত্রের পুঁথিপত্রগুলোতে তন্ত্রের যে-সনতারিখ উল্লেখিত, তাতে যুক্তিশীল পণ্ডিতের পুরোপুরি আস্থা নেই। কেননা, আদিম অনগ্রসর মানুষের চিন্তাধারার উৎস নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব – মানুষের জন্মের ইতিহাসের সাথে এর সম্পৃক্ততা। কৃষি এবং প্রজনন নিয়ে আদিম মানুষের চিন্তাধারা ধীরে পরিবর্তমান সমাজে শতাব্দীর পর

---

৬. কৃষিভিত্তিক জাদুবিশ্বাসের মূলকথা হচ্ছে : আদিম মানুষের বিশ্বাস, মানবীয় ফলপ্রসূতা এবং প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। এই তত্ত্বানুসারে, মানবীয় প্রক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই। মানবীয় প্রজননের মাধ্যমে প্রকৃতির উৎপাদনকে আয়ত্তে আনা সম্ভব। মানবীয় ব্যাপারকে সম্যকভাবে জানতে বা বুঝতে পারলে প্রকৃতির রহস্যকেও জানা বা বোঝা যাবে। এপর্যায়ের ধ্যান-ধারণা অনুসারে, মানবীয় প্রজননের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই প্রধান, পুরুষ অপ্রধান। নারীর উৎপাদিকা-শক্তির উপরই প্রাকৃতিক উর্বরতা নির্ভরশীল। পৃথিবীর আদিশস্য নারীদেহ-সম্ভূত বলে কল্পিত। আবার প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তির উপরই নারীর উৎপাদিকা-শক্তি নির্ভরশীল। তাদের বিশ্বাস, প্রথমটির মাধ্যমে দ্বিতীয়টিকে আয়ত্তে আনা সম্ভব (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪১৩ : ৩৭১-৩৭৮, ৪৮১)।

শতাব্দী ধরে প্রায় অবিকৃত থেকে যেতে পারে। তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি মূলত দেহভিত্তিক। যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে – তন্ত্রসাধনার ভিত্তিমূলে এই বিশ্বাস। প্রতিটি সিদ্ধির বিকাশের মতোই তন্ত্রেরও দুটি দিক – একটি বাহ্যপ্রকৃতির দিক, অপরটি ভেতর বা দেহগত প্রকৃতির দিক। যে-কোনো একটির দ্বারা অপরটিকে জানা যায়। তন্ত্রমতে, যেহেতু দেহভাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড একই পদ্ধতিতে এবং একই উপাদানে নির্মিত, এবং দুটোর মধ্যে একই রকম নানাবিধ শক্তি ক্রিয়াশীল, সেহেতু দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাতে পারলে – দেহকে জানতে পারলে ব্রহ্মাণ্ডকে জানা যাবে, ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিকে অনুকূলে পাওয়া যাবে (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪১৩ : ৪৫০-৫২)।

দেহতত্ত্ব বিষয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে : মানুষের দেহ হচ্ছে অনুপম এক যন্ত্র। এমন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর কেউ গড়তে পারে না। এই যন্ত্রের ভেতর যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুপ্ত ও সুপ্ত শক্তি রয়েছে তার জাগরণ ঘটাতে পারলে অন্য কোনো যন্ত্র ব্যতিরেকে নিজের মনোবাসনা পূর্ণ হতে পারে। প্রকৃতির অপার রহস্যময় শক্তির সাথে দেহের গুপ্তশক্তির সম্পর্ক বিদ্যমান। সেই শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কারের যে প্রচেষ্টা তাকেই বলা যায় তন্ত্রসাধনা। দেহই তন্ত্রসাধনার প্রধান ক্ষেত্র (উদ্ধৃত – দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪১৩ : ৪৮২)।

তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত হলেও যোগ ঠিক দর্শন নয় (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২০১১ : ১৫)। মনের বৃত্তিগুলিকে একান্তভাবে নিরুদ্ধ করার নাম যোগ। যোগের দ্বারা চিত্তের সকলপ্রকার বিকার রোধ হয় (রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ২০০৮ : ১৭৪)। সহজিয়াদের রচনা এবং গানে যোগসাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সহজসাধনায় গুহ্য সাধনপদ্ধতির অনুসরণ আবশ্যক। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে – গুহ্যসাধনাগুলির প্রধানতম অঙ্গ হলো যোগপদ্ধতিতে রতিসুখের নিরোধ, যাতে সে-রতিসুখ ঐশি আনন্দে পরিণত হয়; তারই সাহায্যে শরীর ও মনের স্বাস্থ্য-শক্তি বৃদ্ধি পাবে (উদ্ধৃত ও অনূদিত : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪১৩ : ৪৭৬)।

তবে কেবল রতি-নিরোধই যোগসাধনার একমাত্র লক্ষ্য নয়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত : তান্ত্রিকসাধনার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো মৈথুন। বস্তুত, রতি 'প্রয়োগ ও নিরোধ – উভয়বিধ প্রক্রিয়াই তান্ত্রিক যোগসাধনার অঙ্গ' (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪১৩ : ৪৭৭)। এই রতিক্রিয়ার প্রয়োগ এবং নিরোধের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে আদিম কৃষিজীবীর মৈথুনতত্ত্ব। রতিনিরোধের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় বন্ধ করে সে-শক্তির সাহায্যে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণির বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; নতুবা রতিপ্রয়োগ বা কামচরিতার্থতার সাহায্যেই উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণির বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করবে (স্যার জেমস ফ্রেসার, উদ্ধৃত : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪১৩ : ৪৭৮)। কালে মৈথুনতত্ত্বের আদি উদ্দেশ্যের বিস্তার ঘটে এবং আধ্যাত্মিকতার মাধুর্য এবং তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় বৃহৎ ও অসামান্য হয়ে ওঠে। এর বিচিত্র প্রকাশ সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রসহ লোকায়ত ধর্ম-দর্শনগুলোতে লক্ষ করা যায় (আহমদ শরীফ ২০০৩ : ১৬-১৭)।

মৈথুন ও প্রজননকে ভিত্তি করে তৈরি হওয়া আদিম-অনার্য-অনগ্রসর মানুষের চিন্তাভাবনা বা আচরণ পরবর্তীতে তন্ত্রের দেহতত্ত্ব এবং সাংখ্য-যোগের রতি-চিন্তার ধাপ অতিক্রম করে অগ্রসর হয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তা সহজযান নামে পরিচিত হয়ে উঠলেও তন্ত্রসাধনা ও যোগসাধনার আদিম ধারার প্রবহমানতা

অক্ষুণ্ন থাকে। পরবর্তীতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণ রূপকের গভীরে বৈষ্ণব সহজিয়া নামে পুরুষ-প্রকৃতির আদিম, অনার্য ও দেহভিত্তিক সাধনপদ্ধতিই প্রবহমান রয়ে যায়। যদিও সাধনপদ্ধতির নাম পরিবর্তিত হয়েছে – পরকীয়া নারী মৈথুন, বিন্দুধারণ, ঊর্ধ্বসঞ্চালন, রাগানুগা-সাধন প্রভৃতির নামান্তর ঘটেছে; তবে বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতোই বৈষ্ণব সহজিয়ারাও বেদবিরোধী। সহজসাধনার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ – গুরুতত্ত্ব। বৈষ্ণব সহজিয়ারাও গুরুবাদী – সৎগুরুর নিকট দীক্ষিত না হয়ে কেউ সহজ বা মহাভাব-এর অধিকারী হতে পারে না।

তান্ত্রিক বৌদ্ধসাধনকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণব ধর্ম তথা রাধা-কৃষ্ণ রূপকের মাধ্যমে (তথা পুরুষ-প্রকৃতি) সাধন-ভজন আবদ্ধ রেখেছে তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া (আহমদ শরীফ ২০০৩ : ৪১)।

প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণকে প্রতীক করে চৈতন্য-পূর্ব যুগে সাধন-ভজন আরম্ভ হলেও চৈতন্য-পরবর্তী যুগে এর প্রসার ঘটে। এই সাধন-পদ্ধতির একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা আউল চাঁদ। তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে বিকশিত সম্প্রদায় 'বাউল' নামে খ্যাত বলে লোকপ্রচলিত ধারণা (আহমদ শরীফ ২০০৩ : ৪২)।

'বাউল' শব্দটি সংস্কৃত 'বাতুল' অথবা 'ব্যাকুল' থেকে আগত বলে ধারণা করা হয়। আবার, 'বাউল' এবং 'আউল' শব্দের সাথে আরবি 'আউলিয়া' শব্দেরও সাদৃশ্য লক্ষণীয় – যা একশ্রেণির পূর্ণমানুষ সম্বন্ধে প্রযুক্ত। একই সাথে, 'বাউল' শব্দের সঙ্গে 'সর্বসংস্কার-মুক্ত পাগল' অর্থে 'দিওয়ানা' শব্দের ভাবসাদৃশ্যও আবিষ্কার করা হয় (মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৯১ : ১৫৯-১৬০, ওয়াকিল আহমদ ২০০০ : ১৪-১৫, শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৬৮)। আবার, 'বজ্রকুল' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি বলেও অভিমত রয়েছে (এস এম লুৎফর রহমান ১৯৯০ : ১৭-৫২)। ফলে, বলা যায়, ভারতীয় এবং পারস্য ঐতিহ্যের সমন্বিত চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে আছে এই 'বাউল' শব্দটি।

উপমহাদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ব্যাপক। অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের বিকাশে রয়েছে প্রত্যক্ষ মুসলিম-প্রভাব। বিনয় ঘোষের মতে, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য, নিম্বার্কের দর্শনে রয়েছে ইসলামের গভীর প্রভাব। শঙ্করাচার্যের আপোশহীন অদ্বৈতবাদকে তিনি 'নবীন আরবী ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয় রূপ' বলে উল্লেখ করেন (বিনয় ঘোষ ২০০৯ : ৯১-৯২)। তেমনি, মুহম্মদ এনামুল হকের অভিমত, বঙ্গে ইসলাম প্রবেশের পর সুফিদের মাধ্যমে এদেশে যে ভাবজাগরণ দেখা দেয় তার প্রথম ফল গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ। 'প্রেমধর্ম্ম-প্রচার যদি সত্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বৈশিষ্ট্য হয়, তাহা তাঁহারা বঙ্গীয় স্বূফীদের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।' ষোড়শ শতকে ইসলামের পারিপার্শ্বিকতায় বৈষ্ণব ও সুফি-প্রভাবে নিম্নবিত্তের মানুষের মধ্যে যে মর্মমুখী চেতনা বিকশিত হয় তা-ই বাউল-মত (মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৯১ : ১৭১-১৭৫)। শক্তিনাথ ঝা পাঠান ও মোগল শাসকদের আনুকূল্যে দেহবাদী ও বস্তুবাদী সুফি ঐতিহ্য ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল উল্লেখ করে বলেন,'এই প্রতিষ্ঠার পূর্ব ও সমকালে ভারতীয় সমধর্মী ঐতিহ্যের সঙ্গে এ মতবাদের প্রভূত আদান প্রদান ঘটেছিল' (শক্তিনাথ ঝা ২০১০ : ১২২)। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবে যে-সকল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেও আড়ালে স্বধর্ম পালন করে আসছিলেন তারা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত (ওয়াকিল আহমদ ২০০৬ : ২২৭)। এই

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের মাধ্যমে বয়ে আসা বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনে গড়ে ওঠে বাউল-মত। হিন্দু-প্রভাবে বাউল গানে পুরুষ-প্রকৃতির প্রতীকরূপে রাধা-কৃষ্ণ, শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি মুসলিম প্রভাবে মোকাম, মঞ্জিল, লতিফা, সিরাজাম্মুনিরা, আল্লাহ, কাদের, গণি, রসুল, আনাল হক, আদম-হাওয়া, মুহাম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা প্রভৃতি প্রতীকী রূপকের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ-সংস্কৃতির নাথ এবং নিরঞ্জনও বাউলসাধনায় পরিত্যক্ত হয়নি (আহমদ শরীফ ২০০৩ : ৪২)। এই ভিন্নমত-পথের সমন্বয়-সাধন বিষয়ে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর অভিমত :

> মুসলমানদের আসার পরে ভারতীয় চিন্তার মধ্যে এবং ধর্মসাধনার মধ্যে বড় একটা সংস্পর্শ ঘটিল। পাশাপাশি থাকিলেও হিন্দু-মুসলমান দুই দলেরই পণ্ডিতেরা দেখিলেন চেষ্টা করিয়া কিছুতেই দুই ধারাকে মিলাইতে পারিলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকের দলই উভয় সাধনার মান রক্ষা করিলেন। (ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ২০০৯ : ৪৪)

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউলমতের উপাদানকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন : ক. বেদ-বহির্ভূত ধর্ম, খ. গুরুবাদ, গ. স্থূল মানব-দেহের গৌরব – ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ, ঘ. মনের মানুষ, ঙ. রূপ-স্বরূপতত্ত্ব (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ২৯১)।

বাউলধর্ম বেদ-বহির্ভূত ধর্ম এবং এই ধর্মসাধনায় বেদ-বিধির পরিহার অত্যাবশ্যক। বেদ-বিধি বলতে চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্মকে বোঝানো হয়। এই আনুষ্ঠানিক ধর্ম প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না বলেই তা পরিত্যজ্য (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ২৯১)।

জ্ঞান-দর্শন-মনন ছাড়াও ধর্মের একটি ব্যবহারিক দিক বা সাধন-অংশ আছে। এই সাধনার দ্বারা ধর্মের সত্য উপলব্ধি করা যায়। যাঁরা সাধনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্যের স্বরূপ লাভ করেছেন, তাঁরা ধর্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ বা মর্মজ্ঞ। এঁদেরই অপর নাম গুরু। গুরু ব্যতীত ধর্মের মূল-রহস্য উন্মোচিত হয় না। ভারতীয় ধর্মে গুরুর ভূমিকা সুপ্রাচীন। যে-সকল ধর্মে তত্ত্ব-দর্শন অপেক্ষা কর্ম বা ব্যবহারের প্রাধান্য সে-সব ধর্মে গুরুর ভূমিকা অত্যাবশ্যকীয়। এ কারণে, তন্ত্রধর্মে গুরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। হিন্দু-তন্ত্র, বৌদ্ধ-তন্ত্র, সহজিয়া-বৈষ্ণব বা সুফি-নাথ পন্থা গূঢ় সাধন-প্রণালির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এসব ধর্মে গুরুর স্থান সর্বোচ্চে। মূলত, ভারতীয় দর্শন ও ধর্মসাধনায় প্রথমকথা হচ্ছে গুরুবাদ – উপযুক্ত গুরু নির্বাচন (শক্তিনাথ ঝা ২০১০ : ৩০৩-৩০৯)। বাউলধর্মও গূঢ় সাধন-নির্ভর বলে এতে গুরুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুরুর দুইরূপ : মানব-গুরু ও ভগবান-গুরু। মানবগুরুর বা মুর্শিদের প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা ব্যতীত পরমগুরুর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। মানবগুরু পরমগুরু বা ভগবান-গুরুর প্রতিনিধি (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ৩০৩-৩২২, আহমদ শরীফ ২০০৩ : ৪৩, শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৪৮)।

মানবজীবন ও মানবদেহ বাউলদের নিকট পরমসম্পদরূপে বিবেচিত। তাদের সাধনার মূল আশ্রয়ই এই নশ্বর দেহ। আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার পালন এবং তার মাধ্যমে অর্জিত পুণ্যে স্বর্গলাভের প্রচলিত ধর্মে তাদের বিশ্বাস নেই। তাদের বিশ্বাস – মানবদেহেই ভগবান বা আত্মার বাস। এই দেহেই ব্রহ্মাণ্ডের বসবাস – নদী,

সমুদ্র, অরণ্য, পর্বত, আকাশ প্রভৃতির ঠিকানা। এই দেহের মধ্যেই বাস করেন পরমপুরুষ, 'মনের মানুষ' – মানব-মঞ্জিলে আল্লাহ্‌র নিবাস। যে-সব ধর্মে অল্প-বিস্তর যোগসংশ্লিষ্ট সে-গুলোর সাধনা দেহ-ভিত্তিক। হিন্দু-বৌদ্ধ তান্ত্রিক, নাথ-যোগী, সহজিয়া-বৈষ্ণব, সুফি এবং বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার কেন্দ্র দেহ (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ৩২৩-৩৪০)। 'প্রিয়তম এই দেহ-মন্দিরেই রয়েছেন। মিথ্যা মানুষ তীর্থে-তীর্থে মন্দিরে-মসজিদে সেই প্রিয়তমের অনুসন্ধান করে' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৭১)।

বাউলগানে দেহ-মন্দিরের 'হৃদয়পদ্মে' মনের মানুষের মিলনের জন্য লাঞ্ছিত ভক্তের অবিশ্রান্ত গুঞ্জন ধ্বনিত হয়েছে (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৭১)। বাউলমতে, দেহস্থিত আত্মা হচ্ছে 'মনের মানুষ'। যেহেতু দেহকে ভিত্তি করেই আত্মার স্থিতি, তাই এই মানবাকৃতি আত্মারই রূপ বিবেচনা করে তাঁর নাম মানুষ – মনের মানুষ, সহজ মানুষ, অধর মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, আলেখ মানুষ, সোনার মানুষ, সাঁই প্রভৃতি (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ৩৪০, আহমদ শরীফ ২০০৩ : ৪৩)।

আবার, রূপ হচ্ছে কোনো কিছুর বাহ্যিক আকার। এবং এই রূপকে আশ্রয় করে এর অভ্যন্তরে যে আসল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে স্বরূপ বলা হয়। দেহভিত্তিক যে সাধন-প্রণালি এর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে রূপ থেকে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া। প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃতে পরিণত করে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করা। এটি মূলত তন্ত্রসাধনা। লোকায়ত ধর্মগুলো এর পরিচয় বহন করে। শিব-শক্তি, প্রজ্ঞা-উপায় বা পুরুষ-প্রকৃতির মতো রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনই বৈষ্ণব সহজিয়াদের উদ্দিষ্ট। এর ভিত্তি হলো গভীর প্রেম। এই প্রেম-মিলনে যে চরম আনন্দানুভূতি তাই মহাভাবরূপ সহজ – এই অভিপ্রায়ে জগতের পুরুষ 'রূপ'-এ পুরুষ, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ কৃষ্ণ; আবার প্রত্যেক নারী 'রূপ'-এ নারী, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ রাধা। জগতের পুরুষ ও নারীর যে 'রূপ', তা তাদের বাইরের 'রূপ'। এই 'রূপ' বা বিশিষ্ট আকৃতিকে অবলম্বন করে এর অভ্যন্তরে যে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব রয়েছে, তাই স্বরূপ (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২৮৫-২৮৬, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ৩৬০)। নরনারীর রূপের মধ্যে স্বরূপের উপলব্ধিই সাধকের কাম্য।

বাউলরা পরমাত্মা বা মনের মানুষকে শ্রীকৃষ্ণ এবং পুরুষ-প্রকৃতিকে কৃষ্ণ-রাধা রূপে গ্রহণ করে। বাউলমতের ওপর সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যদিও দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ২৯১-৩৬৮)।

২.৪ সহজিয়া, বাউল এবং রাধারমণের কবিতা

সহজিয়া ধর্ম মূলত বেদ-বিরোধী। অর্থাৎ, প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী। এই বিরোধিতার মূলে রয়েছে এর নিজস্ব ও অতি প্রাচীন বিশ্বাস এবং সে অনুযায়ী আচরণ। দেহনির্ভর তান্ত্রিক এবং যোগসাধনাই এর মূল সাধন-ভজন। বৈষ্ণবীয় মতের দুই সত্তা – রাধা ও কৃষ্ণকে নিয়ে যে ধর্মতত্ত্ব তার গভীরে রয়েছে প্রাচীন সেই সহজিয়া সাধন-প্রণালির গূঢ় তত্ত্ব-পদ্ধতি। রাধারমণের গানে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীকের গভীরেও সেই তত্ত্বকথার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উল্লেখ লক্ষণীয়। দেহকে তরীর সাথে তুলনা করে রাধারমণ বলেন :

ক. আমার দেহতরী কি দিয়া গড়িলায় গুরুধন
আমি ভূতের বেগার খাইটে মইলাম পাইলাম না
শ্রীগুরুর চরণ।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭২)

খ. লোহা ছাড়া তক্তামারা কিবা শোভা পাটাতন
এই যে নাওয়ের ষোল্লতালা
খুল্লায়নারে ও মন ভোলা ঘুমে অচেতন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭২)

ভোলা মন ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। সাধনার দ্বারাই সে ঘুম ভাঙাতে হয়। গুরুর সহায়বঞ্চিত রাধারমণের নিকট দেহতরির রহস্য অনুদ্‌ঘাটিতই রয়ে গেল। আবার, দেহকে গৃহের সাথে তুলনা করে রাধারমণ গাইলেন :

ক. ঘরের মাঝে ঘর বেঁধেছে আমার মনোহরা
জাগা হয় না ঘরের মাঝে সে থাকে না ঘর ছাড়া।
বায়ান্ন গলি তিপান্ন বাজার ঘরের মধ্যে পোরা
মূল কোঠায় মহাজন বসে নামটি ধরে সে অধরা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭৩)

খ. বানাইয়া রংমহল ঘর
অংগে অংগে জুড়া
নব কুঠার জ্বলছে বাত্তি
ষোল জন তার পারা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫)

অধরা মহাজনের ঠিকানা এই দেহেই। ছোট দেহে তাকে ধারণ করা যায় না। তবুও মনোহরের বসবাস দেহ-গৃহেই।

দেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের উপস্থিতি বাউলমতেও স্বীকার্য। দেহের মধ্যে মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, নদী-সাগরের বাস কল্পিত হয়েছে। মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে ছয়চক্র, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীর কল্পনা এবং এর প্রবাহকে নদীর সাথে তুলনা করার তান্ত্রিক রীতি অনুসারে রাধারমণ বলেন :

ক. একটি নদীর তিনটি নালা বাইতে পারলাম না
সেই নদীতে ডুব দিলে তন্ত্রমন্ত্র লাগে না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭৯)

খ. সাগরের তিনটি নদী নিরবধি প্রেমরসে
হয় উথালা
যাইয়ে প্রেমসরোবর উঠছে লহর তিন পদ্মে
ত্রিপিনের মেলা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭৮)

গ. একটি নদীর তিনটি নালা – রসিক যারা বুঝবে তারা
অরসিকে বুঝতে পাইলাম না;
বুঝি আমার কর্ম দোষেরে মন আমার সাধন সিদ্ধি হইল না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬২)

'ত্রিধারা'র সাধনভজনে কবির স্থান নেই। দেহতত্ত্ব 'রসিকে'র নিকট বোধগম্য, 'অরসিক' রাধারমণের তা বোধের অতীত। ফলে, ব্যর্থমনোরথে কবির আক্ষেপ ফুটে ওঠে উপরি-উক্ত পদে।

সহজসাধনার দুটি ধারা – একটি কামবর্জিত বা রতিনিরোধ সাধনা, অপরটি বামাচারী বা রতিপ্রয়োগ সাধনা। দুটি ভিন্নধারার সাধনপদ্ধতি সহজসাধনায় প্রবহমান। রাধারমণের গানে এর প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয় :

ধরবে যদি রসের মানুষ নেহারে
সহজ ভাবেরি ঘরে
ভাবের গুরু কল্পতরু মনপ্রাণ যে হরে।
দেহরতি কর শূন্য গুরুরতি কর পুণ্য
কামশূন্য শুদ্ধ নির্বিকারে
মরা হয়ে অধর মরা চিন্তামণি পুরে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৯)

কবির বিশ্বাস, কামনার স্থূলতাকে পরিহার করে শুদ্ধচিত্তে আরাধনা করলে কল্পতরুসম গুরুর সাক্ষাৎলাভ সম্ভব হবে।

আমরা জানি, সহজিয়া-বাউলধর্মসহ লোকায়ত ধর্মগুলোতে গুরুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। প্রকৃতপক্ষে, সদগুরু নির্বাচন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন তথা সাধন-ভজনের প্রথম কথা (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৪৮)। আচারিক এসব ধর্মের গুহ্য সাধন-পদ্ধতি আছে, যা কেবল দীক্ষার মাধ্যমে লাভ সম্ভব। এবং এক্ষেত্রে গুরুই কেবল এই সাধন-ভজনের প্রকৃত সাধক। তাঁর মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যায় রহস্যময় তত্ত্বের নানা রীতি-প্রকৃতি, সাধন-ভজনের পদ্ধতি-প্রণালি। জীবনার্থ অনুসন্ধানে রাধারমণও গুরুমুখী। গুরুর উপদেশ-নিষেধ, গুরুর প্রতি আত্মনিবেদন, গুরুভক্তি এবং গুরুর সিদ্ধ-সহজ রূপ প্রভৃতির প্রকাশ আমরা তাঁর গানে প্রত্যক্ষ করি :

ক. গুরু একবার ফিরিয়া চাও
অধম জানিয়া গুরু সাধন শিখাও।
...
ডুবছে আমার সাধনতরী নিজগুণে ভাসাও।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭)

খ. কামক্রোধ লোভ আদি রিপু ইন্দ্রিয় ভজন বাদী
গুরুবাক্য মহৌষধি রেখ হৃদয়ে সদায়।
মনরে ভব বন্দন হবে মোচন শ্রীগুরুর কৃপায়।
...
রাধারমণে ভণে, রঘুনাথের ভজ রাঙ্গা পায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৬)

লালনের গুরু যেমন সিরাজ সাঁই, তেমনি রাধারমণের গুরু রঘুনাথ। গানের ভণিতায় কয়েকবার তিনি রঘুনাথের কথা উল্লেখ করেছেন। রাধারমণের ভাবনায় মানবগুরুর মধ্যেই পরমগুরুর বাস; এবং এই মানবগুরুর মাধ্যমেই কেবল পরমকে পাওয়া যায়। জগৎ-বাসনার ঊর্ধ্বে ওঠা সাধকমাত্রেরই কাম্য এবং গুরুকে পাওয়ার মাধ্যমে যে মহাভাবরূপ অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, তা-ই সাধকের লক্ষ্য। গুরুসাধনায় পণ্ডিতের মত – পুরুষ-প্রকৃতির প্রতীক রাধাকৃষ্ণের প্রেম-মিলনই গুরুতত্ত্ব (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ৩১২)। এই 'গুরুতত্ত্বে'র জন্যেই সাধন-ভজন :

গুরু বিনে আর ভজি না কারে
গুরুময় এ ত্রিসংসারে!
গুরু-তত্ত্ব লাগি' গোলোক-ত্যাগী
সাধলেন গুরু ব্রজপুরে ॥
(অনুরাগী ১৪০৮ : ৯৩৯)

রাধারমণের গানেও গুরুতত্ত্বের প্রতিধ্বনি :

শ্রীগুরু বিনে এ তিনভুবনে জীবনে মরণে আর কেহ নাই।
গুরু আদিমূল মূলে হইও না ভুল মূল ধরিয়া কেন ডাকো না ভাই
গুরু দিলে খাই, খাবাইলে সে খাই।
বাঁচাইলে সে বাঁচি নাইলে মরি

স'বেশ্বর পরম ঈশ্বর গুরু
হরিহর জগতের গোসাই।
সত্য যুগে হরি ত্রেতাতে রাম ধনুকধারী
দ্বাপরেতে ব্রজে শ্রীনন্দের কানাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৮)

দেহে পরমসত্তার উপস্থিতি বা 'মনের মানুষ'-ভাবনা বাউল-সাধনার অন্যতম অনুষঙ্গ। উপনিষদ, হিন্দু-বৌদ্ধ এবং সুফি দর্শনের প্রভাবে তৈরি এই ধারণার প্রকাশ বাউলসাধকদের গানে ব্যাপকভাবে লক্ষণীয় :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সে মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।
(গগন ১৪০৮ : ১০৪৯)

রাধারমণের গানেও 'মানুষ' খোঁজার সাধন :

যাবে যদি মন সহজ ভাবের দেশে
অধর মানুষ বিরাজ করে সহজ রসে
হিংসা নিন্দা খুটিনাটি কৈতবাদি ময়লামাটি
ছেড়ে হও খাঁটি
ত্যেজে গরল হওরে সরল রিপু ইন্দ্রিয় নেও বশে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৯৭)

'অধর মানুষ' তথা মনের মানুষকে পাওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়কে বশ করে সরলের অনুসারী হয়ে খাঁটি হওয়ার তাগাদা অনুভব করেছেন কবি। সহজিয়া ভাবনার প্রতিফলন এ গানে লক্ষণীয়। আবার, রাধারমণের 'মনের মানুষে'র পরিচয় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যখন তিনি বলেন :

মনের মানুষ পাবি নি গো ললিতে বল না
মানুষ মিলে মন মিলে না
মনের মানুষ পাইলাম না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭৮)

ললিতার প্রতি রাধার উক্তি – 'মনের মানুষ পাইলাম না।' এখানে কৃষ্ণ প্রেমিকসত্তা তথা পরমাত্মার প্রতি রাধা তথা জীবাত্মার মিলনের বাসনাই প্রতিফলিত। রাধারমণের সাধনপ্রক্রিয়ায় রাধা ও কৃষ্ণের প্রতীকী ব্যবহারের ব্যাপক পরিচয় আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, যা সহজেই পাঠক বা শ্রোতার দৃষ্টি-আকর্ষণ করে।

বাউলসাধনা বা লোকায়ত ধর্মগুলোর সাধনার অন্যতম অনুষঙ্গ রূপ-স্বরূপতত্ত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁর গানে। রূপকে আশ্রয় করে স্বরূপের সাধনাই সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলের সাধনা। লালনের গানে যেমন আছে :

এ মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি-ঋষি যোগী-তপস্বী তারে খুঁজে বেড়াচ্ছে ॥
(লালন শাহ ২০০৯ : ১৬৪)

রাধারমণের গানেও রয়েছে 'মানুষে'র তালাশ। যেমন :

এ মানুষে সে মানুষ আছে ভেবে দেখো মন
হৃদের চক্ষু খুইলে করো তারে আকিঞ্চন।
চিনিয়া গুরুর পদ কররে সেবন
তাহা হইলে খুলিবে চক্ষু দেখবে রূপ জগত মোহন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮৩)

'আরোপ-তত্ত্ব' সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৬১)। আমরা জেনেছি, সহজিয়া সাধনায় প্রত্যেক পুরুষ 'রূপ'-এ পুরুষ, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ কৃষ্ণ। আবার প্রত্যেক নারী 'রূপ'-এ নারী কিন্তু 'স্বরূপ'-এ রাধা। এই স্থূল দেহ বা রূপকে অপ্রাকৃত স্বরূপে উন্নীত করার সাধনাই 'আরোপ'-সাধনা (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ৩৬০)। রাধারমণের পদে আমরা আরোপসাধনার উপস্থিতি লক্ষ্য করি। যেমন :

সুবল সখা পাইনারে দেখা, কইও রাধারে।
বহুদিনের পরেরে সুবল রাধা পড়ে মনে
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল হিয়ার মাঝারে ॥
রাধা তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা কর্ণধার
রাধা বিনে এ সংসারে কে আছে আমার ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
অন্তিম কালে শ্রীরাধারে দেখাইও আনিয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫৮)

পদটিতে 'তন্ত্র', 'মন্ত্র' শব্দদুটির ব্যবহার লক্ষণীয়। 'আরোপতত্ত্ব' মূলত ভারতীয় তন্ত্র-সাধনা। হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল, নাথ প্রভৃতি সাধনার ভিত্তি এই রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ৩৫৭)। আমরা উপরি-উক্ত পদে দেখি কৃষ্ণ রাধার বিরহে ব্যাকুল। কৃষ্ণের উপলব্ধি – রাধা তাঁর সাধন-ভজনের সারাৎসার। কিন্তু শেষ দুই চরণে – ভণিতায় আমরা লক্ষ করি রাধারমণ আর স্বসত্তায় নেই। কৃষ্ণ এবং রাধারমণ একাকার হয়ে গেছেন। অপর একটি পদে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে :

...
রাধাকুণ্ডের তীরে গিয়া বাঁশিটি বাজাই
সারাদিন চলে যায় রাইয়ের দেখা নাই ॥
সুবলরে প্রাণ থাকিতে আনিয়া দেখা, নইলে প্রাণ দায় রাখা
দেখলে বাঁচি নইলে মরিরে সুবল বল চাই ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে যাওরে সুবল শীঘ্র চলে
রাই কারণে দিবানিশি জ্বলে পুড়ে হইছি ছাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫৭)

এখানে, রাধার বিরহে 'জ্বলেপুড়ে ছাই' হওয়ার মধ্য দিয়ে রাধারমণ কৃষ্ণসত্তায় আরোপিত; এবং তাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং সহজিয়া বৈষ্ণবের সূক্ষ্ম পার্থক্যের বিষয়টি উন্মোচিত হয়ে যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'রাগানুগা' ভক্তিতে সাধকের নিজেকে পরমাত্মা বা কৃষ্ণের সাথে একাকার বা আরোপ করে দেখার সুযোগ নেই (অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯৯২ : ২২৪)।

২.৫ বৈষ্ণব, সহজিয়া এবং বাউল

রাধারমণের কবিতায় বা গানে প্রকটিত প্রধান প্রবণতা – বৈষ্ণব, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলতত্ত্বের যে পরিচয় আমরা লাভ করি, তাতে কোন একক ধর্মমতকে তিনি জীবনার্থ অনুসন্ধানে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে পদাবলিতে বিধৃত ইতিহাস – জীবনানুসন্ধানের উপকরণের মধ্যে ফুটে ওঠে তাঁর দার্শনিকতার রূপ। কবিতায় বৈষ্ণব হিসেবে রাধারমণের যে আত্মপ্রকাশ, তা যে ভাগবৎ অনুসারী ভক্তিতত্ত্ব অতিক্রম করে গৌড়ীয় প্রেমভক্তিতে উপনীত তার পরিচয়ও অপ্রকটিত নয়। এযাবৎ প্রকাশিত তাঁর সহস্রাধিক পদের সিংহভাগের বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা; এবং এর মধ্যে বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে শ্রীচৈতন্যবিষয়ক পদের প্রাচুর্য।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব উপমহাদেশের ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ধর্ম-সাধনার মাধ্যমে তিনি যে-মনুষ্যত্বের নব জয়গান গাইলেন তাতে সনাতন ধর্ম নতুন জোয়ারে ভেসে যায়। কেবল সনাতন ধর্ম নয়,

অন্যান্য ধর্মমতও এই জোয়ারের বাইরে থাকেনি। চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণবধর্মের যে-নতুন ব্যাখ্যা এবং পরিচয় তাতে শ্রীচৈতন্য এবং বৈষ্ণবধর্ম উভয়ই নতুন রূপ লাভ করে। চৈতন্য মানবিক সত্তা অতিক্রম করে কোথাও-বা অবতারের মর্যাদা লাভ করেন (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ২৮০)। রাধারমণের পদেও আমরা শ্রীচৈতন্যের অবতার মূর্তি প্রত্যক্ষ করি। গৌড়ীয় গোস্বামীগণ কর্তৃক বৈষ্ণবদর্শনের যে-নতুন ব্যাখ্যা এবং রাধাকৃষ্ণের প্রতীকে জীবাত্মা-পরমাত্মার যে-সম্পর্ক, তা-ই প্রস্ফুটিত হয় রাধারমণের পদে। কৃষ্ণ হচ্ছেন সেই আকর্ষণকারী আদিসত্তা যার বাঁশির সুরের মোহনীয় টানে রাধারূপী জীবাত্মা সদা ব্যাকুল। রাধা পরমসত্তার সাথে মিলিত হতে সদা ব্যাকুল। তার বাসনা এ-ভব মায়ার বাঁধন অতিক্রম করে পরমসত্তার সাথে মিলিত হবে। এটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল প্রেরণা বা দর্শন।

এই বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব আপাত লক্ষণীয় বিষয় হলেও রাধারমণের গানে বা কবিতায় দেহবাদী সাধনা এবং গুরুকেন্দ্রিক যে-সাধনভজনের উল্লেখ রয়েছে তা বৈষ্ণবের অনুষঙ্গ নয়। আমরা জানি, তন্ত্র-যোগ সাধনার ধারাবাহিকতায় এর বিকশিত নাম সহজিয়া সাধনা। সহজ-সাধনা এবং বৈষ্ণব-সাধনার সমন্বয়ে পুরুষ-প্রকৃতি, প্রজ্ঞা-উপায়ের সাথে রাধাকৃষ্ণ মতবাদ যুক্ত হয়ে যে-নতুন ধর্মমত তৈরি হয়, তার নাম বৈষ্ণব সহজিয়া। রাধারমণের কবিতায় বৈষ্ণব এবং সহজিয়ার যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই বিবেচনায় আমরা বলতে পারি, রাধারমণ সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী ছিলেন; এবং সহজিয়া বৈষ্ণবের দর্শনই তাঁর জীবন-দর্শন।

অপরদিকে, আমরা জানি, সহজিয়া বৈষ্ণবের সাধনপদ্ধতির সঙ্গে গভীর সাযুজ্য রয়েছে বাউলমতের। দুটোরই রয়েছে দেহবাদী সাধন-রীতি এবং গুরুকেন্দ্রিক ধর্মাচার। 'মনের মানুষ'-ভাবনা এবং সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচারের মধ্যেও বৈষ্ণব সহজিয়া এবং বাউলমতের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। এবং বৈষ্ণব সহজিয়ার উদ্ভব ও পরিণতির সঠিক ইতিহাস নির্ণয় কঠিন হলেও অনুমান করা হয় যে, বাউলমত সহজিয়ার উত্তরসূরি। উভয় সম্প্রদায়ের 'আদর্শ-সাদৃশ্য' তাদের উৎসের অভিন্নতাকে নির্দেশ করে। এবং সাধারণ অর্থে বাউলগণকেও সহজিয়া বলে অনুমান করা হয়। তবে বাউল এবং সহজিয়ার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে দুইয়ের মধ্যে প্রথমে সাদৃশ্যই লক্ষ করেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত। তাঁর অভিমত – বাউলগণও সহজিয়া। দুইয়েরই লক্ষ্য সর্বভূত ও জীবের স্বরূপ 'সহজ' এবং জীবন ও ধর্মাচরণে সত্যোপলব্ধির সরল পথের অনুসরণ। তিনি সহজিয়াদের বাউলের পূর্বসূরি বলে উল্লেখ করেন। 'উভয় সম্প্রদায়ের আদর্শ-সাদৃশ্য তাদের একই বংশলক্ষণ সূচিত' করলেও প্রাচীনতর আদর্শ, সাধন-প্রণালি ও সহজের কল্পনায় বাউলগণ অনেক পরিবর্তন সাধন করেছেন। সহজমতে, নরনারীর প্রেম সহজরূপে আখ্যাত এবং তাকে স্বর্গীয় প্রেমে রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রেম চিরনির্বাসিত আত্মার ক্রন্দনধ্বনি নয় – মানব-মানবীর মরদেহের চিরন্তন মিলনতৃষ্ণা। তবে বাউলগণ সহজ তথা 'মনের মানুষে'র সঙ্গে 'মিলন বলতে দেহমন্দিরে মানবের ব্যক্তিসত্তা ও অন্তরবাসী দেবতার মিলনকেই বুঝিয়েছেন' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৬৯)।

সুতরাং বাউল এবং সহজিয়ার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। আহমদ শরীফ এই পার্থক্যের স্বরূপ উন্মোচন করেন এভাবে :

> কেবল রাধাকৃষ্ণ রূপকের মধ্যে (তথা পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের মধ্যে) যারা সাধন-ভজন আবদ্ধ রেখেছে, তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। আর যারা নির্বিকারে নানা রূপক ও প্রভাব গ্রহণ করেছে, তারাই বাউল। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এ-ই। (আহমদ শরীফ ২০০৩ : ৪১)

২.৬ রাধারমণের জীবনদর্শনের স্বরূপ

রাধারমণের কবিতায় বা পদাবলিতে বাউলধর্মের উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলেও রাধাকৃষ্ণ রূপকের ব্যাপক ব্যবহার এবং দ্বাদশ তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা এবং সাধনতত্ত্বের বিস্তৃত পরিচয় লাভ করি। তাঁর গানে দেহবাদী গূঢ়সাধনার তাত্ত্বিক প্রকাশও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যা তাঁকে সহজিয়া বৈষ্ণব ধারার লোককবি হিসেবে পরিচিত করে। রাধারমণ নিজেকে যদিও কোথাও-বা বাউল নামে প্রকাশ করেছেন, তবে এর মূলে রয়েছে বাউল সম্বন্ধে সামাজিক ধারণার প্রভাব। আবার, 'বৈষ্ণব সহজিয়া ও তার সগোত্র অনেক গুহ্যসাধক-সম্প্রদায় বাউল নামে পরিচিত' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৬৮)। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, আমাদের দেশে যারা এ-সংসারে বসবাস করেও জগৎ-সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, ভগবৎ প্রেমে বা আল্লাহ্‌র ইশ্‌কে মশগুল তাদের বাউল বলে ধারণা করা হয়। রাধারমণকে সিলেটের সর্বত্র বাউল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'প্রকৃত পক্ষে রাধারমণ ছিলেন বৈষ্ণব সহজিয়া' (দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৩৯৮ : ১)। রাধারমণের পারিবারিক ঐতিহ্যও সহজিয়া মতের অনুসারী। তাঁর পিতা রাধামাধব দত্ত সহজিয়া ধর্মমতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৮)। রাধারমণের গুরু রঘুনাথ ভট্টাচার্য শাক্ত ও সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের সাধক ছিলেন। সহজ ধর্মমতের প্রচারেও তিনি সক্রিয় ছিলেন (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭০)। রাধারমণ 'ব্যক্তিগত জীবনাচরণে, সংগীতচর্চায় গুরু রঘুনাথের চিন্তাসূত্রে প্রভাবান্বিত এবং একনিষ্ঠ ছিলেন (স্বপন নাথ ২০১১ : ১৯৮)। ফলে, তিনি ধর্মমতে সনাতন হিন্দু হলেও আধ্যাত্মিকতায় ছিলেন সহজিয়া বৈষ্ণব (চৌধুরী গোলাম আকবর ১৯৮১ : সংগ্রাহকের কথা [পৃ.ন.বি.])।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মই রাধারমণ দত্তের জীবনার্থ অনুসন্ধানের মাধ্যম এবং সহজিয়া বৈষ্ণবের দর্শনই তাঁর জীবনদর্শন।

প্রচলিত ধর্মমতগুলোর বাইরে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা লোকধর্ম-দর্শনগুলো কখনো প্রভাবশালী ধর্ম-দর্শনের প্রভাবে আপাত ভিন্নরূপ লাভ করেছে, কখনো প্রভাবিত হয়েছে; আবার প্রভাবশালী ধর্মমতকেও কখনো-বা প্রভাবিত করে সম্মুখগামী হয়েছে। প্রধানত দরিদ্র-অশিক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবন-যাপনের ইতিহাস, তাদের বিশ্বাস এবং সে অনুযায়ী আচরণকে ধারণ করে আছে নানা লোকধর্ম-দর্শন। তন্ত্র, সাংখ্য-যোগ, সহজিয়া, কর্তাভজা, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল প্রভৃতি নামে লোকমানুষের ধর্ম ও দর্শন আজও বহমান। এই লোকদর্শনকে বিশ্লেষণ করলে প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় – মানবতা, ইহজাগতিকতা ও বৈরাগ্যবাদ (ওয়াকিল আহমদ ২০১০ : ৫৫)। জীবন-সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে মানুষ নতুনভাবে যেমন আবিষ্কার করে

চিন্তা-চেতনার সময়োপযোগী সৌন্দর্য, তেমনি নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায়, মানবিক উত্থান ও বিপর্যয়ে উপলব্ধি করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব – 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান' – কাজী নজরুল ইসলামের মতো মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসেরও একই ঘোষণা – 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' মানবের এই শ্রেষ্ঠত্বকে ধারণ করেই লোকদর্শনগুলো অস্তিত্বশীল। লালনের গানে মানববাদী দর্শনের প্রকাশ সুস্পষ্ট :

অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই।
(লালন শাহ ২০০০ : ২৩১)

রাধারমণের সহজিয়া বৈষ্ণবের রীতির সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যও এই মানবমুক্তিবাদ – মানুষের প্রতি সম্মান, মানবতার জয়গান। যে হিংসা, হানাহানি মানুষের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ, তার মূলে যে রিপুর তাড়না – তার দমনই রাধারমণের নিকট কাঙ্ক্ষিত। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিভেদহীন মানবতার জয়কীর্তনই তাঁর কবিতায় সুপরিস্ফুট :

এমন দয়াল আইল ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইল
না করিল জাতের বিচার।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৮৭)

প্রত্যেক ধর্ম নিজস্ব আচার-পদ্ধতি এবং সৎকর্ম ও পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তির যে-বিশ্বাস লালন করে তাতে লোকধর্মানুসারীদের আস্থাহীনতার মূলে রয়েছে লোকদর্শনের ইহজাগতিকতার প্রভাব। ফলে শরীর হয়েছে সাধনার প্রত্যক্ষ মন্দির। ইহজাগতিক চিন্তায় এই শরীরই হয়েছে আরাধনার প্রধান ক্ষেত্র। গূঢ় যোগসাধনার মূলেও রয়েছে শরীরের সুখকে স্থায়ী করার মানবিক প্রচেষ্টা। প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষ লোকদর্শনে আস্থাশীল হয়েছে। বঞ্চনার ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে দেখা দেয় নৈরাশ্যজনিত বৈরাগ্য। জাগতিক সুবিধা-বঞ্চনা তাকে বৈরাগ্যের পথে পরিচালিত করে। আমরা রাধারমণের ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি। সামাজিক-পারিবারিক জীবনের বঞ্চনা থেকেই হয়ত তিনি বৈরাগ্যকে বরণ করেছিলেন।

সুতরাং, মানবতাবাদে চূড়ান্ত বিশ্বাস, এবং জগৎবাসনার অপূর্ণতায় হতাশা-নৈরাশ্য থেকে বৈরাগ্যের সর্বহারা সাধনায় নিশ্চিন্ত-নিরাপদ আশ্রয় ও মুক্তিলাভই রাধারমণের জীবনদর্শনের মৌলসুর।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলির ধারায় রাধারমণের কবিতা

রাধারমণ বিপুল সংখ্যক রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। এসব পদে রাই-কানুর প্রেমসম্পর্কের নানা পর্যায় গীতিময় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগের গীতিকবিতার সঙ্গে এর রয়েছে গভীর ঐক্য। বৈষ্ণব কবিতা – যা পদাবলি নামে খ্যাত – সুনির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতি অনুসারে রচিত হয়। পদাবলির অন্তরে যে প্রেমের আবেগঘন স্রোত প্রবাহিত তার ভাষিকরূপ প্রদানে হাজার বছরের পরিচর্যায় তৈরি হয়েছে নির্দিষ্ট ধারা। আমরা রাধারমণের কবিতাকে পদাবলি সাহিত্যের ধারায় বিবেচনা করতে চাই।

৩.১ পদাবলি

সংগীত-শ্লোক অর্থে পদাবলি[১] কথাটির প্রথম ব্যবহার করেন জয়দেব গোস্বামী দ্বাদশ শতকের শেষভাগে রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে (নীলরতন সেন ২০০০ : ১)। লক্ষণসেনের (১১৭৯-১২০৬) সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র মাধ্যমেই বৈষ্ণব পদাবলির সূচনা। তখন পদাবলির অর্থ ছিল দুটি : পদালংকার এবং পদময় গীত। শেষোক্ত অর্থটিই ছিল জয়দেবের অভিপ্রেত (সুকুমার সেন ১৯৯৩ : ৩৩৬)। বৈষ্ণব পদাবলির বিকাশ এবং ধারাবাহিকতায়ও জয়দেবের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বৈষ্ণবধর্মের যে নতুন ভাবজাগরণ দেখা দেয়, তাতে রাধাকৃষ্ণকে প্রধান চরিত্র করে প্রেমসংগীত রচনার ব্যাপক প্রবণতা তৈরি হয় এবং যে রীতি ও পদ্ধতিতে এই ধর্মের সাধন-ভজন চলে তাতে 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব অনস্বীকার্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরা 'গীতগোবিন্দে'র ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলংকারসহ মূল বিষয়বস্তু যেমন অনুসরণ করেছেন, তেমনি 'পদাবলি' নামটিও গ্রহণ করেছেন বলে অনুমান করা যায়। চৈতন্যদেব

---

১. কবিতার পঙ্‌ক্তি বা চরণকে পদ বলা হয় (মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য ২০০৫ : ৭১৫)। সে হিসেবে বৈষ্ণব-গীতিকবিতাও পদ নামে অভিহিত। তবে পদের এই অর্থ অষ্টাদশ শতকের পূর্বে প্রচলিত ছিল না (সুকুমার সেন ১৯৯৩ : ৩৩৬)। আচার্য ভরতের 'নাট্যসূত্রে' (খ্রি.পূ. দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রি. দ্বিতীয় শতক) পদ কথাটি বাক্য এবং সংগীত – দুই অর্থেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়; এবং এটিই পদের প্রথম ব্যবহার বলে ধারণা করা হয় (নীলরতন সেন ২০০০ : ১)। কালিদাস তাঁর অমর কাব্য 'মেঘদূতে' সংগীত অর্থে পদ শব্দের ব্যবহার করেছেন (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-১১ : ৩৩০)। আবার বাক্য অর্থেও পদের উল্লেখ রয়েছে। আচার্য ভরতের অনেক পরবর্তী নরহরি চক্রবর্তী তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে' সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং তাতে সংগীত ও বাক্য অর্থে পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এর নামকরণে পদ শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। গানের পঙ্‌ক্তি বা ছত্র – এই অর্থে পদের ব্যবহারের হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়েছে বলে অনুমান করা হয় (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ২-৩, দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ১৭০)।

পদ-এর বহুবচন পদাবলি (পদ+আবলি)। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে আলংকারিক আচার্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে 'পদসমূহ' অর্থে পদাবলির প্রথম ব্যবহার করেন।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন। অবশ্য ধারণা করা হয়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক সংগীত পদাবলি নামে পরিচিত হয়ে ওঠে (মনীন্দ্রমোহন বসু ১৩৪১ : ভূমিকা- ১, দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ১৭০, নীলরতন সেন ২০০০ : ১)। পদাবলিই বাংলার প্রাচীন গীতিকবিতা (ক্ষেত্র গুপ্ত ১৪০৩ : ৩৩)। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা – তথা রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা নিয়ে যে কবিতা বা গীতিকবিতা রচিত তা-ই বৈষ্ণব পদ বা পদাবলি নামে খ্যাত।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকথাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য রচনার প্রয়াস বহু প্রাচীন। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে অন্ধ্র-ভৃত্যবংশীয় রাজা হাল কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ 'গাথাসপ্তশতী'তে রাধাকৃষ্ণ যুগল-নামের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বলে ধারণা করা হয়। প্রায় বারশত বৎসর পূর্বে রচিত সুপ্রসিদ্ধ আলংকারিক আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক', জয়দেবের পূর্ববর্তী কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'দশাবতার-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হয়েছে। জয়দেবের সমসাময়িক বা কিছুকাল পরে রচিত শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত', নামহীন সংকলকের 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। এছাড়া জয়দেবের সমসাময়িক হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসন', রামচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণ', কবি-কর্ণপুরের 'অলাঙ্কার কৌস্তুভ', পিঙ্গলাচার্যের 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলাকথার উল্লেখ পাওয়া যায় (নীলরতন সেন ২০০০ : ৬-৭, সত্যবতী গিরি ২০০৭ : ৪০-৬৪)। পরবর্তীতে, ষোল থেকে আঠার শতক পর্যন্ত বহু কবি অজস্র বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন – যা মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। পদাবলির উল্লেখযোগ্য কবি হলেন – বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবিরঞ্জন, রায়শেখর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ভারতচন্দ্র প্রমুখ। আধুনিকপূর্ব বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব – 'বাঙালি প্রতিভার নিজস্ব প্রকাশ-পথ' পদাবলি (গোপাল হালদার ২০০৭ : ৮১) রচনার ধারা এই আধুনিক কালের সীমায়ও নিঃশেষিত নয়।

৩.২ কীর্তন এবং রাধারমণের পদ

বৈষ্ণব পদাবলি মূলত সাধন-সংগীত। সাধন-ভজনের নিমিত্তেই এর উৎপত্তি এবং বিকাশ। প্রেমভক্তির ভাবানুভূতির ভিত্তির ওপর বৈষ্ণবধর্মের স্থিতি। তাতে প্রগাঢ় ভাবানুভূতিজাত যে গীত, তা 'কীর্তন' নামে আখ্যাত।

প্রেমভক্তির সঙ্গে নৃত্যগীতের সম্বন্ধ চিরকালীন। অতি প্রাচীনকাল থেকে স্রষ্টা বা ভগবানের নাম, গুণ, লীলাকথা উচ্চস্বরে গাওয়ার রীতি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। তবে বাংলাদেশে কীর্তন বলতে যেকোনো স্তুতিমূলক গানকে বোঝায় না – একটি বিশেষ অর্থেই এর প্রচলন। সুর-তাল-লয়ে কয়েকজনে মিলিত হয়ে নাম-গুণ-লীলা বর্ণনার যে গীতরীতি, তাকেই কীর্তন বলা হয়। মহারাষ্ট্রের সাধু তুকারামের 'অভঙ্গে'র নাম কীর্তন হলেও তার সঙ্গে বাংলা কীর্তনের সম্বন্ধ কম। ষোড়শ শতকে মীরা বাঈ যে 'গিরিধারী' বা কৃষ্ণের

উদ্দেশ্যে যে ভক্তিমূলক গান রচনা করেন, তা 'ভজন' নামে পরিচিত। তবে বাংলাভাষাভাষীর নিকট বৈষ্ণবপদাবলি গানই কীর্তন নামে পরিচিত (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৩২)। 'কীর্তন' শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে বর্ণন, নামোচ্চারণ। এর লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে, সুরযোগে গীত, গীতাকারে নাম, রূপ-গুণ এবং লীলার বর্ণনা (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩১০)। ভক্ত বৈষ্ণবের মনে রসানুভূতি সৃষ্টির জন্যেই রচিত পদের সাংগীতিক উপস্থাপনা ঘটে কীর্তনে (আহমদ কবির ২০০৮ : ৫০৭)। রূপগোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে কীর্তনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন :

নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।

ভগবানের 'নাম রূপ ও গুণাদির উচ্চরূপে উচ্চারণ করাকে কীর্তন বলে' (বিমানবিহারী মজুমদার ১৯৬১ : ১৫৩)। সাধারণত রাধাকৃষ্ণের লীলা ও গৌরাঙ্গের জীবনগাথা অবলম্বনে কীর্তন রচিত হয় (করুণাময় ২০০৪ : ১০৯)।

কীর্তন দুই প্রকার : (ক) নামকীর্তন ও (খ) লীলাকীর্তন।

(ক) নামকীর্তন : উপাস্য দেবতা বা পরম-পুরুষের নামে যে কীর্তন, তাকে নামকীর্তন বলা হয়। শ্রীচৈতন্য বাংলা ভাষায় কীর্তনগানকে নামকীর্তনের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত করেছেন। তিনি কৃষ্ণনাম শুধু উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণই করেননি, কৃষ্ণের বিভিন্ন নামকে সাজিয়ে তাতে সুরারোপও করেছেন। তিনি যে নামকীর্তনে অংশগ্রহণ করতেন তা হলো :

হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট নামকীর্তন 'সংকীর্তন' নামে আখ্যাত। উচ্চকণ্ঠে নামকীর্তন করাকে নাম সংকীর্তন বলা হয় (করুণাময় গোস্বামী ২০০৪ : ৩১৬)। খোল-মন্দিরা সহযোগে এবং সহায়কদের মিলিত কণ্ঠে এই সংকীর্তন গীত হয়। আধুনিক বৈষ্ণবীয় ধারায় নামকীর্তনে নিম্নোক্ত পদটি গীত হয়ে থাকে :

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এছাড়া আরও বেশকিছু পদের মাধ্যমে নামকীর্তন গাওয়া হয়। যেমন : 'রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন রামনারায়ণ হরে', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ', 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম' প্রভৃতি (সুবোধ চৌধুরী ২০০৯ : ৯৭-১০৫, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২

: ৬৫)। এই নামকীর্তন সাধারণত এককভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম নেই। এর একজন মূলগায়ক থাকবে এবং সঙ্গে থাকবে দোহার। পারিবারিকভাবে যেমন কীর্তন হয়, তেমনি সম্মিলিত যজ্ঞ হিসেবেও অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টপ্রহর কীর্তনের রীতি প্রচলিত আছে, তেমনি অবিচ্ছিন্নভাবে আটদিন পর্যন্ত নামকীর্তন হয়ে থাকে। কেননা 'কলিতে শ্রীভগবান্নামকীর্তন একমাত্র ধর্ম'। নাম এবং নামী অভিন্ন। সুতরাং, নামের সঙ্গে নামীর রূপ-গুণ-লীলাও এসে যায়। ফলে নিষ্ঠার সঙ্গে নামকীর্তন করলেই সর্বসিদ্ধি লাভ করা যাবে – শাস্ত্রের তাই নির্দেশ (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৩৩-৩৪)।

(খ) লীলাকীর্তন : রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অবলম্বনে যে কীর্তন গীত হয়, তাকে লীলাকীর্তন বলে (করুণাময় গোস্বামী ২০০৪ : ১০৯)। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা নিয়েও এই লীলাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই লীলাকীর্তনেরও গীত হওয়ার রীতি পূর্ববৎ – মূলগায়ক এবং দোহার সহযোগে বহুজনের অংশগ্রহণে সম্মিলিতভাবে। বিভিন্ন প্রকার 'রসে' এই লীলাকীর্তন গীত হয় বিধায় তা 'রসকীর্তন' নামেও পরিচিত। আবার, পালার আকারে গাওয়া হয় বলে একে 'পালাকীর্তন' নামেও অভিহিত করা হয়। শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের লীলাকীর্তন শুনতে ভালোবাসতেন এবং তাঁর উৎসাহে পরবর্তীতে অনেকেই বৈষ্ণবপদ রচনা করেন এবং তা রসকীর্তন হিসেবে গাওয়া হয়। ফলে লীলাকীর্তনের প্রারম্ভে গায়কগণ শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্তন করে গান গেয়ে থাকেন। এর নাম হয় 'গৌরচন্দ্রিকা'। গৌরচন্দ্রিকা লীলাকীর্তনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে (পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২ : ৬২-৬৭)। 'গৌরচন্দ্রিকা প্রকৃতপক্ষে রাধাকৃষ্ণলীলার মুখবন্ধস্বরূপ' (আহমদ কবির ২০০৮ : ৫০৭)।

চৈতন্যের মতানুসারী আচার্য এবং গায়কগণ অষ্টপ্রহর বা অষ্টকালীয় নিত্যলীলাকে রসানুসারে চৌষট্টি পর্যায়ে ভাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে আরম্ভ করে মথুরাগমন পর্যন্ত বিভিন্ন লীলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – জন্মলীলা, নন্দোৎসব, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, রাধাকুণ্ডে মিলন, জলক্রীড়া, পাশাক্রীড়া, দানলীলা, সুবলমিলন, উত্তরগোষ্ঠ, নৃত্যরাস, বসন্তরাস, মহারাস, বাসন্তীরাস, রাসলীলা, হোলিলীলা, ঝুলনলীলা, কুঞ্জভঙ্গ, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ বা প্রেমবৈচিত্ত্য, কলহান্তরিতা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, বংশীশিক্ষা, মান, মাথুর বা বিরহ বা প্রবাস, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৫৩-৫৪, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ১৯৯৮ : ১৯)

লীলাকীর্তনের সময় বিধিবদ্ধ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত' গ্রন্থে নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ ও নক্ত – এই অষ্টকালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট করেছেন লীলাকীর্তন (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৫৫)।

৩.২.১ নামকীর্তন ও রাধারমণের পদ

নামকীর্তন নিয়ে বৈষ্ণব কবিদের পদরচনার রীতি প্রাচীন। আন্তরিক নিষ্ঠায় নামকীর্তন এবং নাম-শ্রবণে ভগবানের প্রীতি লাভ করা যায় এবং নামকীর্তনেই নামীর কৃপালাভ সম্ভব। অকপটে এই নামকীর্তন করার রীতি। নিরপরাধে এই কীর্তন করতে হয়। তবে অজ্ঞাতে অপরাধ হয়ে গেলে নামের নিকটেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। গোবিন্দদাসের পদে আমরা নামকীর্তনের আত্মনিবেদন লক্ষ করি :

ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সতসঞে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে ॥
শীত আতপ বাত বরিখণ
এদিন যামিনি জাগি রে।
বিফলে সেবিলুঁ কৃপণ দুরজন
চপল সুখ লব লাগি রে ॥
এধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদলজল জীবন টলমল
ভজহুঁ পরিপদ নীত রে ॥
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসি রে।
পূজন সখিজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষি রে ॥
(গোবিন্দদাস ২০১০ : ৫৮১)

রাধারমণের আরাধনার আরম্ভ নামকে ভজনা করেই। নামামৃত পান করেই কবিচিত্ত পরিশুদ্ধ হতে চায়। ফলে 'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে'র ভজনা কবির নিত্যসঙ্গী :

ভাসিলরে নইদের বাসী আনন্দ সাগরে।
উদয় হইল গৌরচাঁন সুরধুনীর তীরে ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরে হরে ॥
হরি নামের মধুর ধ্বনি ধন্য নদীয়াপুরে
সংকীর্তনের যজ্ঞারম্ভ শ্রীবাস মন্দিরে ॥

আবালবৃদ্ধ যুবতীনারী ভাসে প্রেমনীরে
কেউতো বাকি রইল নারে রাধারমণ কয় কাতরে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৬)

নামকীর্তনে নদীয়াবাসী আনন্দে মগ্ন। হরি নামের মধুর ধ্বনিতে আবালবৃদ্ধ সকলেই ভেসে যাচ্ছে। 'সংকীর্তনে'র সম্প্রসারণে গৌরাঙ্গের ভূমিকা এখানে উল্লেখিত।

রাধারমণ নামকীর্তন বা সংকীর্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবহিত। তবু অনভ্যাসের কারণে কিংবা জগতের মোহমায়া-ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ মন 'নামে' আকৃষ্ট নয়। অথচ, তিনি জানেন পাপে নিমজ্জিত দীনহীনের হরি বিনে অন্য কেহ নেই। ভবনদী পাড়ি দিতে একমাত্র ভরসা এই মধুর 'নাম'। তাই কবির আক্ষেপ :

ক. এমন মধুর নামে রতি না জন্মিল রে
নির্বলের বল বন্ধু কেবল হরি।
নাম যজ্ঞ মহামন্ত্র উপাসনা কর হে
যদি নাম নিরলে নিতে পার
পাপতাপ দূরে যাবে মধুর হরির নামেরে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩)

খ. ভবে মানব জন্ম আর হবে না হরি নামামৃত পান করলে না
নামামৃত পান করলে রে মন ভবে জন্ম মরণ হবে না ॥
নামই পরম ধর্ম, নামই পরম তপ নাম যাগযজ্ঞ সাধনা
নামের তত্ত্ব জাইনে মত্ত হইলে রে মন গৌর নিতাই দুভাই দেখ না ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৫৪)

নিজের 'স্বভাব দোষে'র প্রতি কবির ধিক্কার। জাগতিকতার স্বভাব দোষ বা ছয় রিপুর তাড়নায় পাপ-পঙ্কিলে ডুবে থাকা সত্তাই যেন তাঁকে 'ভবরোগের মহৌষধি' হরিনামের অমৃত-সুধা পান করা থেকে বিরত রাখে। তবুও, গভীর বিশ্বাসে হরিনামেই কবির আস্থা। দয়ার সাগর পরমসত্তার দয়া বিনে এই ভবসমুদ্র পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। করুণাময়ের কৃপালাভে কবির তাই একমুখী আরাধনা :

দয়াল হরি তুমি বিনে জীবের দুক আর কে বুঝিবে।
হরি দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু বিন্দুদানে কি শুকাবে ॥
আমার যাওয়া যাদের সঙ্গে পথে দিল ভঙ্গ সবে।
জীর্ণতরী তুফানভারী ঘুরে ফিরি ভবার্ণবে ॥
না জানি সাঁতার নাই কর্ণধার অগাধ জলে মরি ডুবে
জীব সংশয় বিপদ সময় রাতুল চরণ দিতে হবে ॥
করলে বঞ্চন শ্রীরাধারমণ দয়াল হরিনামেতে কলঙ্ক রবে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪২)

নামই পরম তত্ত্ব এবং পরম তপস্যা – এই বিশ্বাসেই কবি শেষ সজ্জায় শায়িত হতে চান। নামই তাঁকে ভববন্ধন দূর করে দেবে। 'পরকালে' এই নাম পাবার আশায় কবির আকুতি :

আমার মরণকালে কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণনাম ললিতে গো
কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণনাম।
...হায়কৃষ্ণ হায়কৃষ্ণ বলে প্রাণ যায় মোর দেহ ছেড়ে
আমার মরণকালে দেখাইও শ্যাম।
যমুনার কিনারে নিয়ে গঙ্গাজলে মৃত্তিকা দিয়ে
আমার অঙ্গে লিখিও কৃষ্ণ নাম।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১)

৩.২.২ লীলাকীর্তন ও রাধারমণের পদ

লীলাকীর্তনের পালাগুলো মূলত দুইভাগে বিভাজিত : বিষয় বা ঘটনানুসারী এবং রসানুসারী।

বিষয়ানুসারী পালাগুলো হলো : দানলীলা, নৌকালীলা, কুঞ্জভঙ্গ, বনভোজন, গোবর্ধন-ধারণ, ফাগুলীলা, অক্রুর-সংবাদ, নন্দবিদায়, পুতনাবধ। এছাড়া গৌরাঙ্গলীলা নিয়েও রয়েছে কীর্তন : জগাই-মাধাই উদ্ধার, নিমাই-সন্ন্যাস প্রভৃতি।

রসানুসারী বিভাজন : পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, আক্ষেপানুরাগ, রসোদ্‌গার প্রভৃতি। (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩১৫)

তবে লীলাকীর্তন রচনায় রূপগোস্বামী প্রমুখ গোস্বামীকৃত গ্রন্থাবলি-স্বীকৃত লীলাপর্যায় অনুসারে কবিগণ পদরচনা করেছেন – এমন নয়। ক্ষুদিরাম দাসের অভিমত :

> মহাজনেরা যখন যেমন ভাবের অধিকারী হয়েছিলেন তেমনি ভাবের পদই লিখে গেছেন। পদসংকলয়িতারা ও কীর্তনগায়কেরাই বরং রসশাস্ত্রের ভাণ্ডারী ছিলেন। কবিদের যাবতীয় রচনা এঁরাই সুসজ্জিত ক'রে রসোচিত পর্যায়-বিভাগে ফেলেছিলেন। তবু স্বাভাবিকত্বের পথ অনুসরণ করেও কদাচিৎ শাস্ত্রের অনুবর্তন করার প্রয়োজন যে রচয়িতারা উপলব্ধি করেন নি এমনও নয়। (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩১৫)

আমরা অনুমান করি, রাধারমণের ক্ষেত্রে এমন হয়েছিল যে, যখন যে ভাব তাঁর মনে উদয় হয়েছে, সে ভাবানুসারেই তিনি লীলাকীর্তন রচনা করেছেন; এবং কীর্তনে তা গীত হয়েছে। কবির পদে রসানুসারী পদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও গৌরাঙ্গলীলার পদও তিনি কিছু রচনা করেছেন।

রসানুসারী পদের দৃষ্টান্ত অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। ফলে দুএকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন :

পূর্বরাগের পদ : ঐনি কালিয়ার বাঁশির ধ্বনি গো সজনী।
কি জানি কি সন্ধানে হরিয়া লয় পরাণী ॥
বাঁশি নয় গো সুধানিধি তারে গড়িল বিধি
শ্যামের বাঁশির মাঝে আছে কি মোহিনী গো ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৪)

রূপানুরাগের পদ : চলো চলো রাই গৌরচান্দের রূপ হেরিতে
গৌররূপ হেরে পারি না গো এ দেহে প্রাণ রাখিতে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১২)

গৌরাঙ্গলীলা তথা 'জগাই-মাধাই', 'নিমাই-সন্ন্যাস' প্রসঙ্গে রাধারমণ রচিত পদের দুটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. ঐ নাম লও জীবের মুখেরে রাধাগোবিন্দ নাম বল।
রাধাগোবিন্দ নাম জয়রাধা শ্রীরাধার নাম লওরে ॥
জগাই মাধাই তারা দুভাই মহাপাপী ছিল
কৃষ্ণনামে মর্ম জাইনে বৈষ্ণব হইল রে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭০)

খ. বাছা নিমাই চান্দরে, হায়রে আমার প্রাণের বাছা নিমাই চান্দ রে।
তোমরানি দেইখাছ আমার নিমাইচানরে নগরবাসীরে ॥
কাল কথাটি কাল হইল, কাল নিদ্রায় প্রবেশিল রে।
কাল নিদ্রা চোখে দিয়া আমার নিমাইচান সন্ন্যাসে গেলা ॥
ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, কে রাখিব প্রবোধ দিয়া রে।
শচীরাণী মা জননী কেমন করে রব গৃহে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে রাইখ নিমাই চরণ তলে।
অন্তিম কালে জিহ্বায় যেন, নিমাই নিমাই বইলে ডাকে রে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১০৬)

এখানে জগাই-মাধাই দুই ভাই যারা নগর সঙ্কীর্তনের প্রবল বিরোধী ছিল, তাদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রসঙ্গ (কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৯৭৮ : ৭৩) এবং চৈতন্য বা নিমাইয়ের সন্ন্যাসযাত্রা প্রসঙ্গে মাতা শচীরানি এবং স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা প্রকাশ পেয়েছে।

নামকীর্তন এবং লীলাকীর্তন – উভয়ই সাধকের ধ্যানমন্ত্র। এই মন্ত্রগুণেই পরমকে পাওয়ার বাসনা অন্তরে লালন করেন সাধক। রাধারমণ এই মন্ত্রের মায়ায়ই জড়িয়ে আছেন। তাঁর লক্ষ্য প্রেমাস্পদের প্রীতির সুধা।

৩.৩ পদাবলির নায়ক-নায়িকা

পদাবলির নায়ক ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণবল্লভা মাত্রই নায়িকা। তবে কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে মহাভাবরূপিনী রাধাই হচ্ছেন প্রধান এবং রাধাই বৈষ্ণব পদাবলির নায়িকা।

রসশাস্ত্র মতে নায়ক প্রধানত চারপ্রকার : (ক) ধীর-ললিত, (খ) ধীর-শান্ত, (গ) ধীরোদাত্ত এবং (ঘ) ধীরোদ্ধত । প্রত্যেক নায়কই ভিন্ন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বা গুণসম্পন্ন হলেও সকল গুণসম্পন্ন নায়ক কেবল কৃষ্ণ। তিনি নায়ককূল শিরোমণি; যদিও কৃষ্ণকে প্রধানত ধীর-ললিত নায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত নায়ক। নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য তিনি সদা ব্যগ্র। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৯৩, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ১৯৯৮ : ২০২, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ২০১২ : ৯৬)

(ক) ধীর-ললিত : ধীর-ললিত নায়ক বিদগ্ধ, নবযুবা, পরিহাস-বিশারদ ও নিশ্চিন্ত প্রকৃতির। ইনি প্রেয়সী-বশীভূত (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ৪)। শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ ধীর-ললিত নায়ক (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৯৩, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২ : ৯৬)। 'নবযুবা', 'প্রেয়সী-বশীভূত' কৃষ্ণ পদাবলির গোপনারীদের প্রেমাস্পদ।

রাধারমণের পদে বৈষ্ণব পদাবলির কৃষ্ণই নায়ক রূপে চিত্রিত। তিনি নবযৌবনান্বিত, প্রিয়ভাষী, প্রেমবশ্য, রমণীজনমনোহরী, বংশীবাদনে তুলনারহিত। তাঁর বাঁশির সুরে কুলবধূর ঘরে থাকা দায় – প্রিয়বচনে শ্রবণেন্দ্রীয় মুগ্ধ হয়। তাঁর রূপলাবণ্য রমণীকুলের মন হরণ করে। যেমন :

শ্যামের বাঁশি মন উদাসী কি মধুর বাজিল কানে
প্রাণসই বাজল বাঁশি গহিন কাননে ॥
নূতন বাঁশের বাঁশি নতুন বয়সের কালশশী
নূতন নূতন বাজাও বাঁশি বিষম সন্ধানে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৯৫)

নবীন বয়সী 'কালশশী' এ নাগর-নায়ক প্রেয়সীর মন যেমন হরণ করে, কুল-কলঙ্কী করে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে, তেমনি গৃহত্যাগী গোপনারীর বিহনেও কৃষ্ণের বেঁচে থাকা দায়। প্রাণনাথ কালাকে পাওয়ার প্রচেষ্টায় রাধা শ্রান্তিহীন – অক্লান্ত। তবে এই রাধিকার জন্য কৃষ্ণেরও অপেক্ষার শেষ নেই। কেননা, 'প্রেমবশ্য' নায়ক প্রেমের বন্ধনে নিজেকে না জড়িয়ে পারেন না। একটি দৃষ্টান্ত :

সুবল বল বল চাই, কেমন আছে কমলিনী রাই
রাই কারণে বৃন্দাবনেরে সুবল আমি সদায় কান্দিয়া বেড়াই ॥

গিয়াছিলাম মন সাধিতে, সাধলাম রাইয়ার চরণার্বিন্দে
নয়ন তুলে চাইল না গো রাই।
আমার ছিল আশা দিল দাগারে সুবল
আমার আর পিরীতের কার্য নাই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫৭)

শ্রীকৃষ্ণের 'পরিহাস বিশারদ' পরিচয় আমরা রাধারমণের কবিতায় প্রাপ্ত হই। গোপবধূদের সঙ্গে ঠাট্টা-পরিহাস তার প্রেমিক তথা নায়কসত্তার অন্যতম কাজ। তবে ইনি কেবল রাধার প্রেমের বশীভূত নন – চন্দ্রাবলীর সাথে তার গোপন সম্পর্ক রাধারমণের পদে প্রকাশিত।

(খ) ধীর-শান্ত : শান্ত, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক, ধার্মিক ও বিনয়ী গুণযুক্ত নায়ককে ধীর-শান্ত নায়ক বলে (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ৪)। যেমন : মহাভারতের যুধিষ্ঠির।

(গ) ধীরোদাত্ত : গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু, সুদৃঢ়ব্রত, শ্লাঘারহিত, গূঢ়গর্ব, এবং বলশালী নায়ককে ধীরোদাত্ত নায়ক বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ধীরোদাত্ত নায়কের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২)

(ঘ) ধীরোদ্ধত : অন্যশুভদ্বেষী, মায়াবী, অহংকৃত, কোপন, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘাপরায়ণ অথচ ধীর নায়ককে ধীরোদ্ধত নায়ক বলা হয় (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ৫)। যেমন : ভীমসেন।

তবে রাধারমণের বৈষ্ণবপদে রাধা এবং কৃষ্ণের লীলাকথাই মুখ্যত অভিব্যক্ত। মহাভারতের বলশালী, দয়ালু, সুদৃঢ়ব্রত, গম্ভীর প্রভৃতি গুণের আধার শ্রীকৃষ্ণ অনুপস্থিত। মধুর রসের আনন্দাভিলাষী প্রেয়সীমুগ্ধ নায়ক কৃষ্ণ প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলির মতোই তাঁর প্রেমিকসত্তার মায়া বিস্তার করে আছেন রাধারমণের কবিতায়।

উপরি-উক্ত চারপ্রকার নায়ক আবার দুইভাগে বিভক্ত : পতি ও উপপতি। গুণানুসারে এদের আবার চারটি ভাগ : (ক) অনুকূল, (খ) দক্ষিণ, (গ) শঠ ও (ঘ) ধৃষ্ট। (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ৪-৮)

(ক) অনুকূল নায়ক : এক রমণীতে আসক্ত নায়ক – যার অন্য কোনো নারীআসক্তি বা ললনাস্পৃহা নেই, তাকে অনুকূল নায়ক বলে। কৃষ্ণ অনুকূল নায়কের উদাহরণ। 'পত্নী এবং অন্যান্য নায়িকাসঙ্গ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র রাধারাণীর প্রেমকেই সার করেছিলেন' (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ৮)। রাধারমণের পদে অনুকূল নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে আমরা লক্ষ করি। রাধা কৃষ্ণের প্রাণস্বরূপ। বিধুমুখী রাধার জন্য একমুখী অপেক্ষার নিষ্ঠায় উত্তীর্ণ নায়ক :

রাধানি আছইন কুশলে কওরে সুবল সারাসার
রাধা বিনে কে আছে আমার।
সুবলরে রাধা তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা গলার হার
রাধার জন্য আমি থাকি দিবানিশি অনাহার।
সুবলরে রাধা আমার প্রেমের গুরু আমি শিষ্য তার
রাধা প্রেমের প্রেমঋণ আমি কি দিয়ে শুধিতাম ধার।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৬)

(খ) দক্ষিণ নায়ক : যে নায়ক পূর্বে এক রমণীতে আসক্ত হয়ে কদাচিৎ অন্য নারীর প্রতি অনুরাগী হয়, কিন্তু পূর্ব প্রণয়িনীর গৌরব, ভয় ও দাক্ষিণ্যাদি পরিত্যাগ করে না, তাকে দক্ষিণ নায়ক বলা হয় (রূপগোস্বামী [তা.বি.]: ১০)।

রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুকূলতা সুপ্রসিদ্ধ। তবে রাধারমণের পদে পদাবলির রীতি অনুযায়ী প্রতি নায়িকা চন্দ্রাবলীর প্রতি কালার আসক্তির কথা গোপন থাকে না। যদিও রাধার নিকট প্রত্যাবর্তনই যেন কৃষ্ণের নিয়তি। ফলে শেষ আশ্রয় 'প্রেমের গুরু' শ্রীরাধিকা।

(গ) শঠ নায়ক : প্রিয়ার সম্মুখে প্রিয়ভাষী, অথচ পরোক্ষে অপ্রিয় আচরণকারী – গুরুতর অপরাধে অপরাধী নায়ককে শঠ নায়ক বলা হয় (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ১১)।

(ঘ) অন্য তরুণী সম্ভোগের লক্ষণ অঙ্গে অভিব্যক্ত হলেও যে নায়ক নির্ভয়ে এগিয়ে আসে প্রিয়ার কাছে এবং মিথ্যা বচনে অতিশয় দক্ষ, তাকে ধৃষ্ট নায়ক বলে (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ১২)।

পদাবলির নায়ক মূলত অনুকূল নায়ক হলেও দক্ষিণ, শঠ এবং ধৃষ্টের লক্ষণও তার মধ্যে বর্তমান। রাধারমণের পদে আমরা দেখি – রাধার জন্য কৃষ্ণের ব্যাকুলতা, রাধা তার প্রাণের দোসর। রাধা বিহনে গোচারণে অন্তহীন প্রতীক্ষায় কাতর। অথচ সেই রাধাকে ফাঁকি দিয়েই প্রতি নায়িকার সঙ্গে তার গোপন প্রণয়। রাধার করুণ অভিমান :

নিশি শেষে কেনে এসে দেওরে কালা যন্ত্রণা
তুমি যে শ্যাম চন্দ্রার বন্ধু তাকি আমি জানি না।
মুখে বল রাধার বন্ধু অন্তর তোমার ভাল না
জানতাম যদি রাইরঙ্গিনী তোমায় প্রাণ সঁপতাম না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২৬)

ধৃষ্ট নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ভোগের চিহ্ন গায়ে নিয়ে ধরা পড়ে রাধার নিকট। সারা রাত্রির বিলাসচিহ্ন শরীরে নিয়েই রাধিকার সম্মুখে হাজির। রাধার বিদ্রূপাত্মক উক্তি :

কহ কহ প্রাণনাথ নিশির সংবাদ
কার কুঞ্জেতে বসিয়া বন্ধু কার পুরাইলায় সাধ।
সিন্দুরের বিন্দু দেখি লাগিতে কপালে
মুখকিনি হাসু হাসু চউখ ঝিমঝিম করে।
কটিবাস পীতবাস রাখিয়াছ কোথায়
নবীন বেশ পরিধান করিলে কোথায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৪)

যে-সব 'গুরুতর' অপরাধের লক্ষণ কৃষ্ণের অঙ্গে মাখা তাতে শঠতাগুণের উপস্থিতিও নায়ক কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষ করি। মিথ্যাবচনে দক্ষ নায়ক প্রেমমুগ্ধ রাধাকে ভোলানোর চেষ্টা করে। যেমন :

মান ভাঙো রাই কমলিনী চাও গো নয়ন তুলিয়া
কিঞ্চিত দোষের দোষী আমি চন্দ্রার কুঞ্জে গিয়া ॥
এক দিবসে রঙ্গে ঢঙ্গে গেছলাম চন্দ্রার কুঞ্জে
সেই কথাটি হাসি হাসি কইলাম তোমার কাছে ॥
আরেক দিবস গিয়া খাইলাম চিড়া পানের বিড়া
আর যদি যাই চন্দ্রার কুঞ্জে দেওগো মাথার কিরা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২৭)

রাধারমণের পদে কৃষ্ণের নায়কোচিত সকল গুণই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। ফলে, আমরা বলতে পারি, কৃষ্ণ চরিত্রটি হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

৩.৩.১ নায়িকা

শ্রীকৃষ্ণের মতোই রূপগুণের আধার তার প্রেয়সীরা। রূপগুণে যে রমণীরা কৃষ্ণের সমতুল্য, যারা অপরিসীম প্রেম ও মাধুর্যগুণে সকল দেশে সকল কালে দেব-মানবের অগ্রবর্তিনী, তারাই কৃষ্ণবল্লভা। কৃষ্ণবল্লভা তথা পদাবলির নায়িকা তিন শ্রেণির : (ক) স্বকীয়া নায়িকা, (খ) সাধারণী বা সামান্যা এবং (গ) পরকীয়া নায়িকা। (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ৪৮, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৯৬-১০০, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২ : ৯৭-৯৯)

(ক) স্বকীয়া নায়িকা : শাস্ত্রানুসারে পত্নীরূপে গৃহীতা পতি আজ্ঞানুবর্তিনী এবং পতিব্রত পালনে সুস্থিতা রমণীগণকে স্বকীয়া নায়িকা বলা হয়। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া মহিষী ষোল হাজার একশত আটজন। এরমধ্যে আটজন প্রধান : রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী। প্রধান মহিষীদের মধ্যে রুক্মিণী এবং সত্যভামার মর্যাদা অন্যদের চেয়ে বেশি। আবার, ব্রজধামে যে-সকল কুমারী

গোপকন্যা গান্ধর্ব-মতে শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করেছিলেন, তারা স্বকীয়া নায়িকাভুক্ত। কিন্তু সামাজিক রীতি-অনুসারে প্রকাশ্যে বিয়ে হয়নি বিধায় তারাও পরকীয়ার ন্যায় আচরণ করতেন।

(খ) সাধারণী বা সামান্যা নায়িকা : সামান্যা নায়িকা বহুনায়কনিষ্ঠ হয়। নির্গুণ নায়কের প্রতি যেমন তার অনাদর নেই, তেমনি গুণবান নায়কের প্রতি অনুরাগও নেই।

(গ) পরকীয়া নায়িকা : পরকীয়া সামাজিক বিধিবিরুদ্ধ সম্পর্কের নাম। এতে শাস্ত্র এবং সমাজের স্বীকৃতি নেই। যে রমণীগণ বিবাহবিধি অনুসারে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নন, অত্যাসক্তি বশত বিধি-বহির্ভূতভাবে পরপুরুষে আত্মসমর্পিত, তাদেরকে পরকীয়া নায়িকা বলে। সমাজে পরকীয়া নায়িকা নিন্দিত। আলংকারিকগণও পরকীয়া নায়িকার নিন্দা করেছেন। তবে এ নিন্দা প্রাকৃত পরকীয়ার জন্য, অপ্রাকৃত প্রেমময়ীগণ তাঁদের লক্ষ্য নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পরকীয়ারই প্রশংসা করেছেন :

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥

বৈষ্ণবসাধনায় এই পরকীয়াসত্তা একান্ত জরুরি। পরপুরুষে আত্মসমর্পিত কুলনারীর মতোই বৈষ্ণবসাধক সংসারধর্মে নিয়োজিত থেকেও সর্বদা পরমসত্তার ভাবনায় নিমজ্জিত থাকে। তাতেই লাভ হয় পরমার্থ। রাধা, চন্দ্রাবলী এবং ব্রজগোপীগণ পরকীয়া নায়িকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রেমাকর্ষণ নিন্দনীয়, তবে কৃষ্ণ যেহেতু লৌকিক পুরুষ নন – অপ্রাকৃত জগতে তাঁর অবস্থান এবং লীলা, ফলে তাঁর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে শাস্ত্রের এবং সমাজের অনুশাসন অপ্রয়োজনীয় বা অকার্যকর।

পরকীয়া দুই প্রকার : কন্যকা ও পরোঢ়া।

কন্যকা : যাদের পাণিগ্রহণ হয়নি – লজ্জাশীল, সখীগণের সঙ্গে নর্মক্রীড়ায় উৎসাহী এবং যারা পিতৃগৃহে বাস করে, তাদেরকে কন্যকা বলা হয়। এদের মধ্যে কতিপয় ব্রজকুমারী শ্রীকৃষ্ণের পত্নীত্বলাভে কাত্যায়নী অর্চনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদের কামনা পূর্ণ করেন (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ৪৮)।

পরোঢ়া : যে-সকল গোপপত্নী বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণের প্রতি দুর্বার আকর্ষণে সম্ভোগ-লালসা পোষণ করতেন, তারাই পরোঢ়া। এরা শোভা, সদগুণ, বৈভব, প্রেমমাধুর্য এবং সৌন্দর্যাতিশয্যে দেবী লক্ষ্মী অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী বলে স্বীকৃত (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ৪৮, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৯৬-১০০, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২ : ৯৭-৯৯)।

রাধারমণের পদে কন্যকাদের কথা নেই। পরকীয়ার পরোঢ়াদের কথাই ব্যাপকভাবে বর্ণিত। প্রধান নায়িকা রাধাকে ঘিরেই মূলত বিস্তার লাভ করেছে প্রেমলীলার কাহিনি। প্রতিনায়িকা হিসেবে গোবর্ধনমল্লের স্ত্রী চন্দ্রাবলীর প্রসঙ্গ এসেছে কিছু পদে – শাশ্বত প্রেমের পথে বাধার উপকরণ হিসেবে। রাধা এবং তার সখীরা বা অন্য গোপনারীদের প্রসঙ্গ এসেছে – যাদের মধ্যে রূপে-গুণে রাধিকাই শ্রেষ্ঠ। পরপুরুষ কৃষ্ণের প্রতি কুলবধূ রাধিকার আকর্ষণের কথাই ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত পদে :

ক. ঐনি কালিয়ার বাঁশির ধ্বনি গো সজনী।
কি জানি কি সন্ধানে হরিয়া লয় পরাণী ॥
বাঁশি নয় গো সুধানিধি তারে কেমনে গড়িল বিধি
শ্যামের বাঁশির মাঝে আছে কি মোহিনী গো ॥
বাঁশিতে ভরিয়া মধু ঘরের বাহির কৈরে গো কুলবধূ
মনপ্রাণ লইয়া করে টানাটানি ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৪)

খ. কঠিন অবলার বন্ধু কঠিন তার হিয়া
কুলটা বানাইলো মোরে তার প্রেমে মজাইয়া।
মা ছাড়লাম বাপ ছাড়লাম ছাড়লাম সুয়ামী
ঘরের বাইর করি ফেলি গেলে কই যাই আমি।
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে ভিতরে জ্বলে হিয়া
এমন বান্ধব নাই আনল দেয় নিবাইয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৩)

আয়ান ঘোষের পত্নী রাধিকা বাঁশির সুরের মায়াজালে বন্দি হয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, কালাচাঁদের রূপের মোহে কুলবিনাশী হয়ে কলঙ্কের হার গলায় পরে। সমাজ-সংসারের অপবাদ মাথায় নিয়ে নানা ছলে-কৌশলে দুর্বার প্রেমতৃষ্ণা নিবারণে মিলিত হয় কৃষ্ণের সঙ্গে। শাশুড়ি-ননদির বাঁকা চোখ, সতর্কদৃষ্টি – কোনো বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কেননা, পরকীয়া সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। আর নিষিদ্ধতার প্রতি মানবিকসত্তার দুর্বার আকর্ষণ চিরকালীন। ফলে জয় হয় পরকীয়ার। সখীদের আনন্দ-আয়োজন এবং প্রকৃতির আনুকূল্যে পরনারী মিলিত হয় পরপুরুষ তথা পরমপুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে। প্রাকৃত প্রেম অপ্রাকৃতে উন্নীত হয় – নিষিদ্ধ পরকীয়া তত্ত্বসিদ্ধ হয়ে সাধন-পন্থার স্বীকৃতি লাভ করে।

৩.৪ সখী ও দূতী

পদাবলি-সাহিত্যে দূতী-সখীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাকথায় নায়ক-নায়িকার সঙ্গে যেন অঙ্গীভূত হয়ে আছে সখী-দূতী। পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ করে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত – সর্বত্র এদের গুরুত্ববহ উপস্থিতি। সখী-দূতীর সহায়ক ভূমিকায় মধুর রসের কাহিনি শিল্পঋদ্ধ পরিণতি লাভ করে। সখী ব্যতীত রাধা

দীন, নিষ্প্রভ এবং 'সখীসহায়তা ব্যতীত লীলায় আশ্চর্য চমৎকারের উদ্ভব সম্ভব নয়' (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ১৩৩)।

সখী : যারা ছল পরিত্যাগ করে পরস্পরকে ভালবেসেছে– বিশ্বাস করেছে, এবং যাদের বয়স ও পোশাক-পরিচ্ছদ একরকম, তারাই পরস্পর সখী। রাধার রয়েছে অনেক সখী। এদেরকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা হয় : সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমশ্রেষ্ঠ সখী। এই বিভাজনের সখীদের কতিপয় নাম উল্লেখ করা যায় :

সখী : কুসুমিকা, ধনিষ্ঠা প্রমুখ।

নিত্যসখী : কস্তুরিকা, মণিরঞ্জিকা প্রভৃতি।

প্রাণসখী : শশিমুখী, বাসন্তী প্রমুখ।

প্রিয়সখী : কুরাঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রমুখ।

পরমশ্রেষ্ঠ সখী : ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী – সর্বগুণসম্পন্ন এই আট জন। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ১১০, ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ১৩৪, ২৫২-২৫৪)

সখীর উপর্যুক্ত বিভাজনগুলোর আবার নানা ভাগ-উপবিভাগ রয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি এদের প্রীতি রয়েছে। তবে তাঁর সাথে প্রেমলীলায় তাদের আগ্রহ নেই। যদিও রাধাকৃষ্ণের প্রেম-মিলনে এদের অন্ত্যহীন উৎসাহ; এবং এতেই তাদের সীমাহীন সুখ – প্রেমের ফুল ফোটাতেই যেন তাদের আন্তরিক বিপুল নিবেদন। আর তাতে সখীদের পালন করতে হয় নানা দায়িত্ব : নায়ক-নায়িকার পরস্পরের নিকট প্রেম-গুণাদি কীর্তন; তাদের অভিসারে প্রেরণ; কৃষ্ণের নিকট সখীকে সমর্পণ; পরিহাস করা; আশ্বাস প্রদান; নায়ক-নায়িকার বেশবিন্যাস; পরস্পরের দোষগোপন; নায়ককে তিরস্কার; নায়িকাকে তিরস্কার; যথাসময়ে মিলন-সম্পাদন ইত্যাদি। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ১১০, নীলরতন সেন ২০০০ : ৬৫-৬৭)

রাধারমণের পদে সখী-সম্বোধনের পদ রয়েছে অনেক। বেশির ভাগ পদে 'সখী', 'সকি', 'সই', 'প্রাণসই' 'সজনী', 'প্রাণসজনী' প্রভৃতি সম্বোধন করে পদরচনা করা হয়েছে। কিছুসংখ্যক পদে সখীদের নামের উল্লেখ রয়েছে। এগুলোতে আবার ললিতা এবং বিশাখার কথাই প্রধানত ব্যক্ত। কোথাও-বা 'সুচিত্রা' এবং 'চম্পাকলি', 'মাধবীলতা'র কথা ব্যক্ত হয়েছে। মূলত এরা প্রায় সকলেই 'পরমশ্রেষ্ঠ' সখী।

রাধারমণের পদে সখীদের উল্লেখের দৃষ্টান্ত :

ক. ললিতে, জলে গিয়াছিলাম একেলা
ডাকছে নাগর শ্যাম-কালা ॥
আর পদের উপর পদ থইয়া
বাজায় কদম-তলা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৯৪)

খ. কদমতলে কে বাঁশি বাজায় গো ঐ শোনা যায়
এগো শ্যামের বাঁশির ধ্বনি শুনিয়ে গৃহে থাকা হইল দায়।
শুনগো ললিতে সই তোমারে নিরলে কই গো
এগো চল যাই গো জলের ছলে যমুনায় ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬৩)

গ. ও বিশখা গো
আমার মত জনম দুক্ষী নাহিগো সংসারে
রসিকচান্দে প্রেমডোরে বান্ধিয়াছে মোরে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৫৭)

ঘ. প্রাণসখীরে ঐ শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে?
বংশী বাজায় কেরে ধনি বংশী বাজায় কে।
মাথার বেণী বদল দেব তারে আনিয়া দে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩০০)

ঙ. শোন গো পরান সই তোমারে সরমে কই
বাঁশি মোরে করিল উদাসী।
কি ধ্বনি পসিল কানে, সে অবধি মোর মনে
উচাটন দিবস রজনী ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩৫)

চ. প্রাণসজনী আইজ কি শুনি মধুর ধ্বনি কানন বনে।
রাধা বৈলে বাজল বাঁশি শ্যামের বাঁশি কি মোহিনী জানে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৯)

সখী-সম্বোধনের পদগুলোতে মূলত রাধার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। উপর্যুক্ত পদগুলোতে রাধা তাঁর অনুরাগ, উচাটন, গোপন-মিলনের আকুলতাই সখীদের নিকট প্রকাশ করেছে। রাধারমণের পদের প্রায় সর্বত্রই সখীদের উল্লেখ রয়েছে – নাম-সম্বোধনে কিংবা নাম-ব্যতীত। রাধার অনুরাগ-মান, মিলনের আকাঙ্ক্ষা, বিরহের মর্মযাতনা সখীদের নিকট বর্ণনার মাধ্যমেই প্রধানত প্রকাশিত। যদিও সখীদের ভূমিকা অনেকটা নিষ্ক্রিয়। রাধার মনোযাতনা দূরীকরণে তাদের ভূমিকা অল্প। মূলত রাধা তার মনের কথা সখীদের নিকট প্রকাশ করে – নিজের অন্তর্বাসনাকে প্রকাশ করে সুখ-দুঃখকে ভাগ করে নিতে চাইছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.১ দূতী

নায়ক-নায়িকার মিলন-সাধন দূতীর কাজ। দূতী দুই প্রকার : স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী। 'কটাক্ষ' এবং 'বংশীধ্বনি' হচ্ছে স্বয়ং দূতী (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ১৮)। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাসভঙ্গ করে না, তাকে আপ্তদূতী বলে । আপ্তদূতী তিন প্রকার : অমিতার্থা, নিঃসৃষ্টার্থা ও পত্রহারী।

অমিতার্থা দূতী নায়ক-নায়িকার একজনের ইঙ্গিত অবগত হয়ে মিলনসাধন করে। নিঃসৃষ্টার্থা দূতী নায়ক-নায়িকার একজন কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে মিলনসাধন করায়। পত্রহারী দূতী নায়ক-নায়িকার বার্তাবহন করে। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ১১১, নীলরতন সেন ২০০০ : ৬৭-৬৮)

রাধারমণের পদে দূতীর উল্লেখ রয়েছে। মূলত রাধিকা কর্তৃক নিযুক্ত দূতী রাধাকৃষ্ণের মিলনে সচেষ্ট। তবে দূতীয়ালী পদ বেশি নেই। কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যায় :

ক. চন্দ্রার কুঞ্জে বৃন্দাদূতী শ্যামচাঁদ তাল্লাসে যায়
বইলা দেগো চন্দ্রাবলী রাধার বন্ধু পাই কোথায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৭)

খ. চিঠি দিয়া শ্রীরাধিকায় পাঠাইছইন মোরে
শোন শ্যাম গুণধাম নিতেরে তোমারে।
প্রেমডুরি দি বান্ধিয়া নিতে এতে নিষেধ নাই
শ্রীরাধিকার দোহাই যদি মানরে কানাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৭)

গ. দূতী কইও গো বন্ধুরে।
এগো কাইল নিশিতে একা কুঞ্জে রইয়াছি বাসরে ॥
একা কুঞ্জে রইগো সখি দুসর নাই মোর সাথে
এগো কি দোষেতে শ্যামনাগরে ছাড়িয়া গেলা মোরে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৮)

ঘ. বৃন্দে তুই সে প্রাণের ধন
আমায় নি করাবে বন্ধু কৃষ্ণ দরশন।
এপারে বন্ধুয়ার বাড়ি মধ্যে ক্ষীরোদ নদী
উড়িয়া যাইবার সাধ করে পাখা না দেয় বিধি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৮)

রাধারমণের দূতীর পদে মূলত বৃন্দার কথাই ব্যক্ত। বৃন্দা রাধিকার সখী এবং দূতী। রাধার মিলনাকাঙ্ক্ষা এবং বিরহের অন্তর্দহন প্রত্যক্ষ করে বৃন্দা শ্যামের সন্ধানে যায়। কখনো রাধিকার চিঠি বহন করে। মূলত কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনসাধনের মাধ্যমে প্রিয়সখীর মনোযাতনা দূর করাই তার কাজ।

৩.৫ বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও রাধারমণের পদ

বৈষ্ণব সাহিত্যের দর্শন এবং রসতত্ত্ব মূলত ষট্‌গোস্বামী তথা রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর দ্বারা গঠিত। রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং জীবগোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ' গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এবং রসতত্ত্বের মূল আলোচনা গ্রন্থ। বৈষ্ণব আচার্যগণ সংস্কৃত আলংকারিককৃত নয়টি ভাব এবং রসের[২] মধ্যে রতি ভাব এবং শৃঙ্গার রসকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছেন। এতে রতি হচ্ছে 'কৃষ্ণরতি' এবং রস 'কৃষ্ণ-শৃঙ্গার'। রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা বিভাব হিসেবে বিবেচিত এবং রাধাকৃষ্ণের অনুরাগ বোঝাতে যে বাচিক বা আঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশিত, তা অনুভাব; এবং মূলরসের পরিপুষ্টি সাধনে যে-সকল অঙ্গীরস অঙ্গীভাবের আশ্রয়ে প্রকাশ পায়, সে-গুলো সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলে বর্ণিত (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫০)।

---

২. শব্দার্থজাত ভাব-তন্ময় চিত্তে আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশকে রস বলে (সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১৯৯৮ : ৬৪)। রসকে কাব্যের আত্মা বলা হয় (অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৪১১ : ৩২, হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২০১০ : ৯৪)। 'রস' ধাতুর অর্থ হচ্ছে আস্বাদন। যা আস্বাদিত হয়, তা-ই রস। এই রস হৃদয়বানের মানসিক নির্মল আনন্দাবস্থা বিশেষ। আর এই আনন্দানুভূতি কেবল সহৃদয় অনুভূতিশীল চিত্তের পক্ষেই আস্বাদনযোগ্য (শ্রীশচন্দ্র দাশ ২০০৩ : ৪৪)।

সংস্কৃত রসশাস্ত্র অনুসারে 'স্থায়ীভাবের পরিণতিই রস' (অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৪১১ : ৩৭)। 'ভাব' হচ্ছে 'ইমোশন' – সর্বাবয়ব মানসিক অবস্থা। 'ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুলরূপে প্রতীয়মান হয় সেইটি স্থায়ীভাব'(অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৪১১ : ৩৬)। ভাব রসে পরিণত হয়ে আস্বাদিত হয়। ভাবকে সংস্কৃত আলংকারিক আচার্য ভরত প্রধানত আট প্রকারে উল্লেখ করলেও পরবর্তী আলংকারিকগণ নয় প্রকার বলে স্বীকার করেছেন :

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেথমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোহপি চ ॥
(অভিনবগুপ্ত, ৩/২৪, উদ্ধৃত : অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৪১১ : ৩৬)

বৈষ্ণব সাহিত্যের রস 'ভক্তিরস'। শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়ীভাব 'কৃষ্ণরতি' বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে আস্বাদ্য অবস্থায় আনীত হলে তা ভক্তিরসে পরিণত হয় (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৬১)। প্রিয় বস্তুর প্রতি চিত্তের অনুরাগ হচ্ছে রতি। বৈষ্ণব রসতত্ত্বে পরমারাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু। ফলে, তাঁর প্রতি যে অনুরাগ, তা কৃষ্ণরতি এবং

তজ্জনিত যে আস্বাদ্য মানসিক অবস্থা তাই মধুর ভক্তিরস বা উজ্জ্বল রস বা শৃঙ্গার রস। মূলত, মধুর রস আস্বাদনের মাধ্যমেই বৈষ্ণবের সাধনক্রিয়া পরিচালিত হয়। চণ্ডীদাসের একটি পদে রসতত্ত্বের এই প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ানতারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে
কি কহে দু হাত তুলি ॥
একদিঠি করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥
(চণ্ডীদাস ২০১০ : ৪৯)

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম ভাব। এই নয়টি ভাব কাব্যের বিভাব, অনুভাবের সংস্পর্শে রসে পরিণত হয় –

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোহদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ ॥
(উদ্ধৃত : অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৪১১ : ৩৬)

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত রস।

উল্লেখযোগ্য যে, বিভাব হচ্ছে স্থায়ীভাবের কারণ; যাকে আলম্বন এবং উদ্দীপন – এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। যার দ্বারা সুখ-দুঃখের অবস্থা অনুমিত হয়, তাকে বলা হয় অনুভাব। এছাড়া, যে-ভাব স্থায়ী নয় – যা কখনো আবির্ভূত হয়, কখনো অন্তর্হিত হয়, তাকে সঞ্চারী ভাব বা ব্যভিচারী ভাব বলা হয় (শ্রীশচন্দ্র দাশ ২০০৩ : ৪৫)।

এখানে রাধা আলম্বন বিভাব। আহারে বিরতি, রাঙাবাস পরিধান, বেণি এলিয়ে কালো চুল দেখা, মেঘের সাথে প্রলাপকথন, একদৃষ্টে ময়ূর-ময়ূরীর দিকে তাকানো – এগুলো অনুভাব। চিন্তা, আবেগ, উন্মাদভাব,

হাসি, নির্বেদ – এ হচ্ছে সঞ্চারী ভাব। স্থায়ীভাব হলো কৃষ্ণরতি, এবং এর থেকে রস হচ্ছে 'বিপ্রলম্ভ'-শৃঙ্গার (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫১)।

আমরা রাধারমণের পদে শৃঙ্গার রসের উপস্থিতি লক্ষ করি :

ক. রে ভমর, কইয়ো গিয়া–
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া ॥
ভমর রে, কইয়ো কইয়ো, হায় রে ভমর,
প্রাণ বন্ধের লাগ পাইলে–
আমি রাধা মইরে যাব কৃষ্ণহারা হইয়া ॥
ভমর রে, সারা নিশি পোসাইলাম
ফুলের শয্যা লইয়া–
সেই শয্যা হইল বাসি, দেও জলে ভাসাইয়া ॥
ভমর রে, না খায় অন্ন, না খায় জল,
নাহি বান্ধে কেশ;
তোমার পিরিতের লাগি রাধার পাগলিনীর বেশ।
ভমর রে, ভাইবে রাধারমণ বলে
কান্দিয়া কান্দিয়া
নিবি ছিল মনেরি আগুইন – আগুইন কে দিল জ্বালাইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৮)

এখানে রাধা আলম্বন বিভাব। অন্নগ্রহণ না-করা, জলগ্রহণ না-করা, কেশ পরিপাটি না-করা, পাগলিনির বেশ ইত্যাদি হচ্ছে অনুভাব। চপলতা (পাগলিনির আচরণ), বিষাদ (শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে), মরণ (রাধার মরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা), গ্লানি (ফুলের সজ্জা বাসি হয়ে যাওয়া) ইত্যাদি সঞ্চারী ভাব। স্থায়ীভাব হচ্ছে কৃষ্ণরতি; এবং রস হলো শৃঙ্গার বা 'বিপ্রলম্ভ' শৃঙ্গার।

খ. দিবস রজনী গো আমি কেমনে গৃহে থাকি
শ্যামল বরণ অলক নয়ন পলকেতে দেখি।
শুইলে স্বপনে দেখি ও তার নাম লইতে থাকি
এগো চমকিয়া চমকিয়া উঠে ঐ পরান পাখি।
তৈলের ভাণ্ড হস্তে লইয়ে এগো বেভোর হইয়ে থাকি
এগো দুধের মাঝে লবণ দিয়ে পাগল হইয়ে মাখি।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো সজনী
এগো কৃষ্ণশ্যাম বিচ্ছেদের জ্বালার আর কতদিন বাকী ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯০)

উপর্যুক্ত পদেও রাধা আলম্বন বিভাব। দুধের মাঝে লবণ দেয়া, তেল মনে করে গায়ে মাখা ইত্যাদি অনুভাব। বিষাদ (গৃহে থাকতে না-পারা), স্বপ্ন (শুইলে কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখা), চিন্তা ('বেভোর' হয়ে থাকা) ইত্যাদি হচ্ছে সঞ্চারী ভাব। স্থায়ীভাব – কৃষ্ণরতি। রস – 'বিপ্রলম্ভ' শৃঙ্গার।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার : পরস্পর অনুরক্ত যুবক-যুবতীর প্রগাঢ় রতি উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হয়েছে, অভীষ্টসিদ্ধি করতে পারছে না – এমন অবস্থার নাম বিপ্রলম্ভ (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৫৭)। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস – এই প্রধান চারভাগে বিভক্ত (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ২৮৭)।

সম্ভোগ শৃঙ্গার : নায়ক-নায়িকার পরস্পর মিলনে যে উল্লাস, কিংবা উল্লাসের যে ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ তার নাম সম্ভোগ। সম্ভোগও চার ভাগে বিভক্ত – সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সংকীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ (রূপগোস্বামী [তা.বি.] : ৩৩৬, নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৫)।

বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের মোট আট ভাগের প্রত্যেকটির আবার রয়েছে আটটি করে উপবিভাগ। ফলে, রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন চৌষট্টি রসের গান বলে খ্যাত।

৩.৫.১ পূর্বরাগ

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের প্রধান চার ভাগের অন্যতম পূর্বরাগ। পূর্বরাগ নায়ক-নায়িকার প্রেমের প্রথমাবস্থা বিশেষ। 'প্রেম সঞ্চারিত হওয়ার ফলে হৃদগত ভাব'কে পূর্বরাগ বলে (মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য ২০০৫ : ৭৬৫)। পরস্পর শ্রবণ ও দর্শন থেকে জাত নায়ক-নায়িকার অপ্রাপ্তিজনিত দশাবিশেষই পূর্বরাগ নামে আখ্যাত (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩৩১)। নীলরতন সেন 'উজ্জ্বলনীলমণি'র পূর্বরাগের সংজ্ঞা অনুবাদ করেছেন এভাবে : 'মিলনের পূর্বে দর্শনাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ রতি যখন বিভাবাদি সংযোগে আস্বাদনীয় হয়, তাকে পূর্বরাগ বলে' (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৫)।

পূর্বরাগে রূপ দেখে বা গুণ শুনে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি রতির উন্মেষ ঘটে, যা চিত্তে প্রবল দোলা দিয়ে যায়। নতুন উদ্ভূত সত্তার বিস্ময়কর আবির্ভাবে ব্যাকুলপ্রাণ প্রেমিকযুগল। বিমুগ্ধসত্তার এই অবস্থা নিয়ে পদ রচনার রীতি প্রাচীন। বৈষ্ণব পদাবলির উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল কবি পূর্বরাগের পদ রচনা করেছেন। বিদ্যাপতির একটি পদে রূপদর্শনজাত মুগ্ধতার পরিচয় লক্ষ করা যায় :

যহাঁ যহাঁ পদযুগ ধরই
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই।
যহাঁ যহাঁ ঝলকত অঙ্গ
তঁহি তঁহি বিজুরী তরঙ্গ।

(বিদ্যাপতি ১৯৯৮ : ২৪)

বিদ্যাপতি রূপমুগ্ধ কবি। কবিতায় তিনি যে-রূপের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা পাঠকের অন্তরে রূপের রহস্যময় মুগ্ধতা ছড়িয়ে দেয়। তাঁর পূর্বরাগের পদে পরিশীলনের মার্জিত রুচি সুপরিস্ফুট। চণ্ডীদাসের

পূর্বরাগের পদ গভীর আবেগে অনুভূতিপ্রবণ। শ্রবণইন্দ্রিয়ের বাহ্যিকতাকে অতিক্রম করে যেন অন্তরের অতলস্পর্শ করে। শ্যামের নাম শুনে তাকে পাওয়ার ব্যাকুলতায় রাধার চিত্ত অস্থির :

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
(চণ্ডীদাস ১৯৯৮ : ৩৬)

পদাবলি সাহিত্যের রীতি অনুসরণ করেই রাধারমণ পূর্বরাগের পদ রচনা করেছেন। যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দর্শনিকতা এতে প্রভাব বিস্তার করেছে। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য – 'কৃষ্ণাপেক্ষা রাধার পূর্বরাগের দিকেই মহাজনগণের অধিকতর মনোযোগ' (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩৩২)। রাধারমণের পদেও এই রীতি লক্ষ করা যায়। যেমন :

ক. নবীন নীরদ শ্যাম লাগল নয়নে গো
নিরুপম রূপমাধুরী পীত বসনে।
মনোহর নটবর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে
শিরে শিখিপাখা শোভে বংশীবদনে।
নয়নে লাগল রূপ হানল পরাণে
পাসরা না যায় রূপ শয়নে স্বপনে।
নয়নে নয়নে দেখা হইল যেদিনে
সে অবধি প্রেমাঙ্কুর শ্রীরাধারমণে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৫)

খ. কিরূপ দেখছনি সজনী সই জলে
এগো নন্দের সুন্দর চিকণ কালা থাকে তরুমূলে।
সজনী হাতে বাঁশি মাথে চূড়া ময়ূরপুচ্ছ হিলে
যেন মালতীর মালা শ্যাম অঙ্গে দোলে।
সজনী কুক্ষেণে জল ভরিতে গেলাম যমুনার কিনারে
এগো হাসিহাসি কয় গো কথা মন ভুলাইবার ছলে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৭)

গ. কি শুনি মধুর ধ্বনি গো সখী কি শুনি মধুর ধ্বনি ॥
কোন না নাগরে ধরিয়া অধরে এমন অমৃত নাম ॥

শুনি বেণুগান যোগী ছাড়ে ধ্যান মৌন ছাড়ে ঋষিমুনি
বাঁশি বেড়াজাল যুবতীর কাল বাঁশিয়ে হরল প্রাণি ॥
একেত অবলা তাহে কুলবালা ভালমন্দ নাহি জানি
গৃহেতে আমার কালসর্পাকার শাশুড়ি ও ননদিনী ॥
এ জাতি যৌবন সঁপিনু জীবন পরাণ বন্ধুয়া মানি...
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৮)

ঘ. কিরূপ হেরিনু পরান সই
সাধ করে তারে হৃদয়ে থুই ॥
রূপের চটকে উন্মাদিনী হই
গৃহেতে পাগলী কেমনে রই ॥
সেরূপ সজনী পাব গো কই
রূপের কারণে কলঙ্কী হই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮২)

ঙ. প্রাণ সখিরে ঐ শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে।
বংশী বাজায় কে রে সখি বংশী বাজায় কে ॥
এগো নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি তারে আনিয়া দে।
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি ঘর কোঠাকোঠা
এগো নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি কলঙ্কিনী রাধা ॥
কোন ঝাড়ের বাঁশি ঝড়ের লাগাল পাই
জড়েপেড়ে উগারিয়া সায়রে ভাসাই ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন ধনী রাই
জলে গেলে হইব দেখা ঠাকুর কানাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৬)

রাধারমণ লোককবি। বিদ্যাপতির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা তাঁর কাব্যে হয়ত-বা অনুপস্থিত। কিন্তু শিল্পে 'শক্তিশালী এবং প্রেরণা-সম্ভূত আবেগের প্রাণদায়িনী শক্তি'র অনিবার্য উপস্থিতির (লঙিনুস ১৯৯৭ : ২৪) যে প্রত্যয় প্রত্যাশিত, তা রাধারমণের কবিতাকে গীতিকবিতার মর্যাদা দান করে। শব্দের মাধ্যমে সুরকে ধারণ করার যে শৈল্পিক প্রচেষ্টা মহৎ কবিদের গীতিকবিতায় লক্ষ করা যায়, রাধারমণের পদাবলিতেও আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। নবীন মেঘের মতো শ্যামের রূপে মুগ্ধ রাধার দুই নয়ন। আর এই মুগ্ধতা দুই চোখের সীমাতেই কেবল আবদ্ধ নেই – প্রাণের গভীরে আঘাত করে সেই রূপ। রাধারমণের রাধাও বাঁশির সুরে উন্মনা – কে

বাজায় বাঁশি জানা নেই তার, তবুও প্রাণ ছুটে যেতে চায় সেই জাদুকর বাঁশিওয়ালার নিকট। যদিও শাশুড়ি-ননদির ভয়-বাধা অতিক্রম করে তাঁর নিকট পৌঁছানো দুরূহ।

দর্শন এবং শ্রবণের মাধ্যমে জাত এই প্রথম প্রেমানুভূতির চিত্রণে লোককবির যে আন্তরিক আবেগ এবং নিবিড় দরদ লক্ষ করা যায়, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর পদাবলি সাহিত্যে বিরল।

৩.৫.২ মান

মান বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অন্তর্ভুক্ত। প্রণয়ের সঙ্গে মান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। যেখানে প্রণয় আছে, মানের উপস্থিতি সেখানে অনিবার্য। পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্রে অবস্থিত নায়ক-নায়িকার দর্শন-আলিঙ্গনাদির নিরোধক ভাবই মান (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৬)। কোনো কারণ ছাড়াই মান হতে পারে। তবে প্রণয় এবং ঈর্ষার কারণে মানের সৃষ্টি। রূপগোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে মানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'একস্থানে থাকিলেও এবং অনুরক্ত হইলেও নায়ক-নায়িকার স্ব-স্ব অভিপ্রেত আলিঙ্গন, দর্শন, চুম্বন, প্রিয়ভাষণ প্রভৃতির প্রতিবন্ধক ভাবকে মান বলে' (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৪১৬)। প্রেমের স্বভাব জটিল। যথার্থ প্রেমে বক্রতা স্বাভাবিক – মানে প্রেমের উৎকর্ষ সাধিত হয়। যেখানে মান, সেখানে মান-ভঞ্জনের চেষ্টাও বর্তমান।

প্রাচীনকাল থেকে নায়ক-নায়িকার মান নিয়ে পদ রচিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের গ্রন্থ 'গাথাসপ্তশতী'তে নায়িকার মানের বর্ণনা করছে নায়ক :

ণ বি তহ অণালবন্তী হিঅঅং দুম্মেই মাণিণী অহিঅং।
জহ দূর-বিঅম্ভিঅ-রোস-মজ্ঝত্থ-ভণিএহিং ॥
(উদ্ধৃত : দেবিদাস ১৩৮৯ : ৪১৭)

অনুবাদ : মানিনী আলাপ না করে আমার হৃদয়কে যত বেশি কষ্ট না দিয়েছে অনেকদূর পর্যন্ত প্রকটিত গুরুকোপবিশিষ্ট উদাসীনবচনদ্বারা তদপেক্ষা বেশি কষ্ট দিয়েছে (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৪১৭)।

পরবর্তীতে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসসহ পদাবলির প্রায় সকল কবি মান নিয়ে পদ রচনা করেছেন। তাঁদের মানের পদাবলিতে রাধা-কৃষ্ণ প্রধান চরিত্র। চণ্ডীদাসের একটি পদে রাধার গভীর মানের চমৎকার পরিস্ফুটন লক্ষ করা যায়। অভিমানের আতিশয্যে রাধার যে আন্তরিক বাসনা অভিব্যক্ত, তা কালোত্তীর্ণ – শিল্পের চূড়াস্পর্শী :

সই, কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
এমতি করিল কে
আমার অন্তর যেমতি করিছে

Dhaka University Institutional Repository

তেমতি হউক সে।

(চণ্ডীদাস ১৯৯৮ : ১২০)

জ্ঞানদাসের পদে রাধিকার প্রতি শ্যামের মান-ভঞ্জনের অনুনয় অন্তর-স্পর্শ করে। যেমন :

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
ইয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতুলি ॥
পীত-পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥
রাই কত পরখসি মোরে আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥

(জ্ঞানদাস ১৯৯৮ : ১৩৪)

গোবিন্দদাসের একটি পদে রাইয়ের মান ভাঙাতে মাধব মিনতির সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। সুন্দরী রাইয়ের মান ভাঙাতে প্রাণ ত্যাগ করার কথাও বলে। তবু বাধ্য-অনুগত মাধবের প্রতি রাধিকা যেন সুপ্রসন্ন হয় :

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহি বিমুখ ভেল রাই ॥
... তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ ॥

(গোবিন্দদাস ১৯৯৮ : ১৩৫)

রাধারমণের পদে প্রেমিক মাধব প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্য ও তত্ত্বের রীতিকে ধারণ করে বিকশিত হয়েছে। রাধার মান ভাঙাতে সচেষ্ট কৃষ্ণ – ব্যাকুল চিত্তে রাধার অভিমানের কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। তবুও মান ভাঙাতে না পারার দুঃখ আচ্ছন্ন করে আছে অন্তর।

মানের দুই ভাগ : (ক) সহেতু মান ও (খ) নির্হেতু মান। রাধারমণের পদে দুই রীতিই লক্ষ করা যায় –

ক. ওরে আজ কেনরে প্রাণের সুবল রাই এলো না যমুনাতে
আমি রাই অপেক্ষায় বসে আছি হাতে নিয়ে মোহন বাঁশি, রাই এলো না ॥
সুবলরে বল বল সুবল সখা কত দিনে হবে দেখা, রাধার কথা বলরে গোপনে
আমি রাই আসিলে জিজ্ঞাসিবো না আসিলে সময় মত ॥

(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২)

খ. নিশি শেষে কেন এসে দেওরে কালা যন্ত্রণা

তুমি যে শ্যাম চন্দ্রার বন্ধু তা কি আমি জানি না।
মুখে বল রাধার বন্ধু অন্তর তোমার ভাল না
জানতাম যদি রাই রঙ্গিনী তোমায় প্রাণ সঁপতাম না॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২৬)

গ. মান ভাঙো রাই কমলিনী চাও গো নয়ন তুলিয়া
কিঞ্চিত দোষের দোষী আমি চন্দ্রার কুঞ্জে গিয়া ॥
...আরেক দিবস গিয়া খাইলাম চিড়া পানের বিড়া
আর যদি যাই চন্দ্রার কুঞ্জে দেও গো মাথার কিরা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২৭)

ঘ. মান ভাঙ্গ রাই কমলিনী একবার নয়ন তোল দেখি
জন্মের মতো তোমায় আমি একবার হেরিয়া যাই
শ্রীরাধার চরণ ধরি মান সাধিলা গুণমণি
রাইগো শ্যামচান পরাণের বন্ধু ছাড়লে বাঁচন নাই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২৭)

ঙ. তোরে কে শিখাইলো গো নিদারুণ মান
বারে বারে শ্যামকে ধনি কইলে অপমান ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২৫)

রাধারমণের কৃষ্ণ কখনো যেমন রাধিকার মানের কারণ খুঁজে পায় না, তেমনি কখনো-বা রাধিকার প্রতি অবহেলার মাশুল দিচ্ছে শত অনুনয়ে। পদযুগলে করস্পর্শ যেন মানভাঙানোর প্রথম ধাপ। আর এর সমাপ্তি প্রাণত্যাগের হুমকির মাধ্যমে – যদি রাধিকার মান ভাঙে। আবার গোপবধূর মানের কারণও যৌক্তিক – চন্দ্রার কুঞ্জে রাত কাটানোর অভিযোগ সত্যি হয়ে ধরা দেয় কৃষ্ণের স্বীকারোক্তিতে। যদিও ঘোরতর অভিযোগকে নানান কথার কৌশলে হালকা করতে সচেষ্ট কৃষ্ণ।

৩.৫.২.১ মানের নায়িকা

বৈষ্ণবকাব্যে অষ্টনায়িকার কথা স্বীকৃত (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৪৬)। এর মধ্যে ছয়টি নায়িকাবর্ণনা মানের পর্যায়ভুক্ত। বাকি দুটির মধ্যে একটি প্রবাস নায়িকা, অপরটি সম্ভোগের নায়িকা (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৭)। মানের পর্যায়ভুক্ত নায়িকারা হলেন : ১. অভিসারিকা, ২. বাসকসজ্জিকা, ৩. উৎকণ্ঠিতা, ৪. বিপ্রলব্ধা,

৫. খণ্ডিতা, ৬. কলহান্তরিতা – আমরা মানের এই ছয় নায়িকার পরিচয় এবং রাধারমণের পদে তাদের উপস্থিতির স্বরূপ লক্ষ করব।

১. অভিসারিকা

পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে, লোকচক্ষুর আড়ালে নায়ক-নায়িকার মিলনকে অভিসার বলে (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৭)। যিনি অভিসার করেন, কিংবা নায়ককে অভিসার করান, তিনিই অভিসারিকা (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৪৬)। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অভিসার ছিল। কালিদাসের কাব্যে যেমন অভিসার আছে, তেমনি পরবর্তীকালে জয়দেব ও তার পূর্বে রচিত সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিতার সংগ্রহগ্রন্থগুলোতে অভিসারের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, বৈষ্ণব কবিগণ প্রাচীন প্রাকৃত নরনারীর অভিসার-কল্পনা থেকে রাধাকৃষ্ণের অভিসারের রীতি গ্রহণ করেছেন (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৩৬১)। পদকর্তাগণ অভিসারের সৌন্দর্য-বর্ণনায় সংস্কৃত কবিদের অনুসারী হয়েছেন, কোথাও-বা তাদের অতিক্রম করে গেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলির দুটি দিক – আধ্যাত্মিক এবং কাব্যিক। অভিসারের পদগুলো আধ্যাত্মিক দিক থেকেই কেবল আকর্ষণীয় নয় – কাব্যিক সৌন্দর্যেও তা পাঠকের নিকট সমান আদরণীয় হয়েছে (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩৩৭)।

অভিসার আট ধরনের : জ্যোৎস্নাভিসারিকা, তমসাভিসারিকা, বর্ষাভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, তীর্থযাত্রাভিসারিকা, উন্মত্তাভিসারিকা, অসমঞ্জসাভিসারিকা (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৪৬, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ১৯৯৮ : ২০৮, শান্তিরঞ্জন ভৌমিক ২০০২ : ১৭৮)।

পদাবলির প্রধান কবিদের সকলেই অভিসারের পদ রচনা করেছেন। বিদ্যাপতির 'নব অনুরাগিনী' রাধা সকল বাধা অতিক্রম করে অভিসারে চলেছে –

নব অনুরাগিনি রাধা।
কছু নহি মানএ বাধা ॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান ॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানএ ভার ॥[৩]
(বিদ্যাপতি ১৩৫৯ : ৪০৩)

চণ্ডীদাসের রাধা বর্ষার রাতে প্রেমাস্পদের আহ্বানে বিস্ময় এবং আমোদে উদ্বেলিত। গুরুজনের বাধা

৩. অনুবাদ : নব অনুরাগিনী রাধা, কোনো বাধাই মানে না। একাকীই প্রস্থান করল, পথ-বিপথ মানলো না। মণিময় হার ত্যাগ করল, কেননা সে উচ্চকুচকেও ভার মনে করে।

এবং ভয় অতিক্রম করে অভিসারমুখী :

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥
(চণ্ডীদাস ১৯৯৮ : ১০৫)

অভিসারের পদরচনায় পদকর্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হয়। ভাবসংকেত সৃষ্টি এবং বিশুদ্ধ কবিত্বের উপস্থাপনা – উভয় দিক দিয়েই তাঁর রচনা অনাস্বাদিত মাধুর্যের সন্ধান দেয় (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩৩৮)। যেমন :

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা ॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বাঁধিয়া কবরী।
কুণ্ডলে বকুলের মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥
নাসায় বেশর শোভে মুকুতা হিলোলে।
নবীনা কোকিলা জিনি আধ আধ বোলে ॥
(গোবিন্দদাস ১৯৯৮ : ৯২)

রাধারমণের অভিসারের পদে রাধাকে সখীদের আহ্বান – গহন কানন থেকে ভেসে আসছে বাঁশির সংকেত ধ্বনি। এ অপ্রতিরোধ্য আমন্ত্রণে বিলম্বের অবকাশ নেই :

শুন শুন বিনোদিনী আমার বচন
ঘন ঘন বাজে বাঁশি গহন কানন।
চল চল নিকুঞ্জেতে করি গো গমন
লহ লহ বনফুল সুগন্ধি-চন্দন।
হেঁটে যেতে পথে করে কুসুম চয়ন
নানা গন্ধে সাজাইব কুসুম শয়ন।
সাজ সাজ সব সখি আন আভরণ
সাজলো শ্রীমতী রাধা মোহিত মদন।

ওগো রাধে বিধুমুখী পৈরো গো বসন
শুভস্য শীঘ্রং কহে শ্রীরাধারমণ ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১০)

'বনফুল-সুগন্ধি-চন্দনে' রাধাকে সাজানোর আয়োজন এবং নিকুঞ্জে গমনের যে চিত্র তাতে অভিসারিকা রাধার আনন্দ-বিহ্বল অবস্থা প্রকাশিত।

পদাবলিতে বর্ষাভিসার বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রাধারমণের পদেও আমরা বর্ষণমুখর অন্ধকার রাতে অভিসারিকা রাধার সাক্ষাৎলাভ করি। অভিসার শেষে প্রেমাস্পদের ফিরে যাওয়া নিয়ে উৎকণ্ঠিত রাধা :

অভাগিনীর বন্ধুরে আন্ধারী দিকেতে তুমি যাইও নারে ॥
তুমি আন্ধারে গেলে পরে আমি থাকি ঘরে বারে
মুষলধারে পড়ে জল ধারারে
যাইতে গোয়ালপাড়া পথে পথে আছে কাটা রে
চরণে ফুটিলে পাইবায় ব্যথারে।...
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৯)

কাব্যিক সৌন্দর্যের অন্তরালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের যে তত্ত্ব রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার অভিসারে লুকায়িত, তার পরিস্ফুটন রাধারমণের পদে লক্ষ করা যায়। নীলরতন সেনের অভিমত :

> লোকদৃষ্টির আড়ালে অলৌকিক ভাবমিলন-কুঞ্জে পরস্পরের মানসবিহার। এই অভিসারে ভগবান (কৃষ্ণ) এবং ভক্ত (রাধা) উভয়েরই পরম আগ্রহ। প্রথমে ভক্তকে ভগবানই ঘরের বার করেন – প্রাকৃত জীবনগণ্ডির বাইরে ভগবৎ প্রেম-মিলনের পথে টেনে আনেন। যদি প্রাকৃত জীবন-সংস্কারের মোহ কাটিয়ে ভক্ত সময়মতো ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য না বেরোতে পারে – ভগবান নিজেই এসে আহ্বান বা সংকেত করেন। (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৭)

লোককবির পদে প্রাণের হরির সাথে রাধার আধ্যাত্মিক অভিসার আরাধনার একনিষ্ঠতাকে ফুটিয়ে তোলে। তবে গোয়ালপাড়ার বৃষ্টিস্নাত পথে প্রেমিকের চলে যাওয়া দেখে প্রেমিকার হৃদয়ে যে মমতা ঝরনাধারার মতো উৎসারিত, তা আধ্যাত্মিকতার নিষ্প্রভতাকে অতিক্রম করে মাটি আর বৃষ্টির প্রাকৃত ঘ্রাণে শিল্পের ভাবসৌন্দর্য লাভ করে।

২. বাসকসজ্জিকা

প্রিয়তমের সাথে মিলন-প্রত্যাশায় দেহ ও গৃহ সাজিয়ে নায়িকার প্রতীক্ষাকে বাসকসজ্জা বলে (মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ১৯৯৮ : ২১০, নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৭)। প্রেমাস্পদ হয়ত তার অবসর মতো আসবেন – এই

আশায় প্রেয়সী বাসগৃহ কিংবা কুঞ্জ সজ্জিত করে, বসনভূষণে নিজেকে সুশোভিত করে এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘর-বাহির করে। কিন্তু প্রত্যাশিত প্রাণের মানুষ আসে না। প্রতীক্ষার প্রহর বয়ে যায় – রাত্রি প্রভাত হয়। ক্ষোভে-হতাশায় সমস্ত সজ্জা ছুড়ে ফেলে দেয়। প্রিয়তমের সাথে মিলনের আশা বৃথা যায়। প্রেমের এই অবস্থা বা দশায় স্থাপিত নায়িকাকে 'বাসকসজ্জিকা' বলে (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৪৬০)।

বাসকসজ্জিকার আটরূপ : মোহিনী, জাগ্রতিকা, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, সুপ্তিকা, চকিতা, সুরসা, উদ্দেশা (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৪৭)।

কবি বিদ্যাপতি রচিত 'বাসকসজ্জা'র একটি পদ :

কুসুমে রচিত সেজা দীপ রহল তেজা
পরিমল অগর চন্দনে।
জবে জবে তুঅ মেরা নিফল বহলি বেরা
তবে তবে পীড়লি মদনে ॥
মাধব তোরি রাহী বাসক সজা।
চরণ সবদ চৌদিস আপএ কানে
পিয়া লোভে পরিণতি লজা ॥[৪]
(বিদ্যাপতি ১৩৫৯ : ২৩৫)

চণ্ডীদাসের 'বাসকসজ্জিকা' রাধা গহীন বনে সকল বাধা অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত জনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে – অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হবার নয় :

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ
গাথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বূল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা।
...শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলিব বঁধুর সনে।
(চণ্ডীদাস ২০১০ : ৫৫)

৪. অনুবাদ : পুষ্পে সজ্জিত শয্যা, দীপ প্রদীপ্ত রইল, অগুরু চন্দনের গন্ধ, যখন যখন তোমার মিলনের সময় যেমন ব্যর্থ হতে লাগলো, তখন তাকে মদন নিপীড়িতা করল। মাধব, তোমার রাধা বেশভুষা করে আছে। পদশব্দ জেনে চতুর্দিকে কান দেয়। তার প্রিয় মিলনের লোভ কেবল লজ্জারই কারণ হলো। (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার ১৩৫৯ : ২৩৫-২৩৬)

রাধারমণের রাধাও মিলন-প্রত্যাশায় দেহ ও গৃহ সজ্জিত করে প্রেমাস্পদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। 'বাসকসজ্জা'র রচনায় ফুলের উপস্থিতি অনিবার্য। আমরা দেখি – হরেক রকম ফুলে সজ্জিত হবে রাধার মিলন-বাসর :

ক. আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া
এগো মন রঙ্গে সাজাও কুঞ্জ সব সখি মিলিয়া ॥
জবাকুসুম সন্ধ্যামালি আনরে তুলিয়া
এগো রঙ্গে সাজাও কুঞ্জ সব সখি মিলিয়া ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
কেন গো রাই কান্দ বসিয়া পাগলিনী হইয়া
নিশিভোরে আসবে শ্যাম বাঁশরী বাজাইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ১৩৮৪ : ৪৩৪)

খ. যাও রে ভ্রমর পুষ্পবনে পুষ্প আন গিয়া
আজ রাতে আসবে কুঞ্জে বন্ধু শ্যাম কালিয়া ॥
অপরাজিতা টগরমালী, গোলাইব ফুল তুলিয়া
ওগো সাজাইতাম বাসকসজ্জা সব সখী লইয়া ॥
গাঁথিতাম ফুলের মালা প্রাণবন্ধুর লাগিয়া
সন্ধ্যামালী ফুলের মালা বাসি হইয়া গেলা
কোন পথে গেলা ভ্রমর পথ ছাড়াইয়া ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
আসিবা তোমার বন্ধু বাঁশরী বাজাইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২২)

কুঞ্জ সাজাতে ফুলের পাশাপাশি আতর-গোলাপ-চুয়াচন্দন এবং লং-এলাচ-জায়ফলেরও আয়োজন রয়েছে। শ্যাম কালিয়া আসবে তাই দেহ ও গৃহ সজ্জার এই আয়োজন। কুঞ্জসজ্জায় পুষ্পবনে ভ্রমরকে ফুলসংগ্রহে প্রেরণ রাধারমণের কাব্যিক দৃষ্টিকে সুপরিস্ফুট করে। তবে যার জন্য এ বাসকসকজ্জা তার আগমন-অপেক্ষায় রাধার প্রহর গণনার যেন শেষ নেই :

ক. আমার জীবনের সাধ নাই গো সখি জীবনের সাধ নাই
দেহের মাঝে যে যন্ত্রণা কারে বা দেখাই ॥
... একা ঘরে বইসে আমি রজনী পোষাই
আজ আসব কাল আসব বইলে রজনী পোষাই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৩)

খ. আইল না শ্যাম প্রাণবন্ধু কালিয়া
বৃথা গেল জীবন আমার নিকুঞ্জ সাজাইয়া ॥
আসবে বলে বংশীধারী আশান্বিত হইয়া
রাখিলাম চুয়াচন্দন কটরায় ভরিয়া ॥
...সইগো তোমরা উপায় বল, সুখের নিশি গত হইল
রাধার বন্ধু রৈল পাশরিয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১১)

গ. না আসিল মনচোরা নিশি হইল ভোর
পুরুষ ভ্রমর জাতি নিদয়া নিষ্ঠুর ॥
...বাসি হইল ফুলের মালা তাম্বুল কর্পূর
আসা পথে চাইয়া থাকি দুইটি আঁখি ঘোর ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৬)

ঘ. ওরে দেখলে চন্দন উঠে কান্দন
কার অঙ্গে ছিটাই রে।
আর কেওয়া পুষ্প, ফুল মালতী
আমি বিনা সুতায় মালা গাঁথি।
ওয়রে দেখলে মালা উঠে জ্বালা
কার গলে পরাই রে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৬)

ঙ. বন্ধু আইলায় না আইলায় না আইলায় না রে
দারুণ কোকিলায় রবে বুক ভাসিয়া যায় রে।
এক প্রহর রাত্র বন্ধু আউলাইল মাথার কেশ
বন্ধু আসিবে বলি ধরি নানান বেশ ॥
দুই প্রহর রাত্র বন্ধু বাটা সাজাইল পান
বন্ধু আসিবে বলে পাইলাম অপমান।
তিন প্রহর রাত্র বন্ধু গাছে ফুটল ফুল
নিশ্চয় জানিও বন্ধু গন্ধে ব্যাকুল ॥
চাইর প্রহর রাত্র বন্ধু সাজাই ফুলের শয্যা
বন্ধু আসিবে বলে পাইলাম বড় লজ্জা।
পঞ্চ প্রহর রাত্র বন্ধু শীতল বাতাস বয়
নিশ্চয় জানিও বন্ধু তুমি আমার নয় ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।
অভাগিনী চাইয়া রইছি পন্থ নিরখিয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২০)

প্রতি-প্রহরের অপেক্ষার যাতনাকে অন্তরে ধারণ করে রাধা উন্মুখ হয়ে আছে – তার প্রিয়তম আসবে। পদাবলির মহান পদকর্তাদের সূক্ষ্ম নাগরিক সৌন্দর্যচেতনার শৈল্পিক প্রলেপ হয়ত রাধারমণের বাসকসজ্জার পদে নেই, তবে রাধারমণের রাধার প্রতীক্ষায় একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা এবং অপ্রাপ্তির মর্মযাতনার যে হাহাকার কবিতার শরীরে গীতের মোহনীয় সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে, তা কেবল শ্রবণেন্দ্রীয়কে তুষ্ট করে না, সুর এবং ধ্বনির অনিবার্য মায়া বিস্তারে অন্তরকেও বিমোহিত করে।

৩. উৎকণ্ঠিতা

প্রেমাস্পদের না আসার ফলে যে প্রেমিকা বিরহদুঃখ ভোগ করে থাকে, সে প্রেমিকা বা নায়িকাই 'উৎকণ্ঠিতা'। আসার সংকল্প করেও যার দয়িত দৈবহেতু আসতে পারেনি, দয়িতের অনাগমনে দুঃখার্তা সেই স্ত্রীকে 'বিরহোৎকণ্ঠিতা' বা উৎকণ্ঠিতা বলে (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৪৫০, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ১৯৯৮ : ২১০)। কান্তের আগমন-আশ্বাসে বিশ্বাস করে তার জন্যে অপেক্ষারত কান্তার মানসিক অবস্থা হচ্ছে উৎকণ্ঠা। কান্তের আগমনে বিলম্ব দেখে উৎকণ্ঠাযুক্ত নায়িকাই উৎকণ্ঠিতা।

উৎকণ্ঠিতার আটরূপ : দুর্মতি, বিকলা, স্তব্ধা, উচ্চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, মুখরা, নির্বন্ধা (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৪৭, শান্তিরঞ্জন ভৌমিক ২০০২ : ১৭৯)।

এই 'উৎকণ্ঠিতা' অবস্থা নানা কারণে ঘটতে পারে। নায়কের প্রবাস গমনে, পরাধীনার মিলনে বাধা তৈরি হলে, বাসকসজ্জায় কোনো কারণহেতু নায়কের বিলম্ব হলে নায়িকার অন্তরে উৎকণ্ঠা ভাব জাগতে পারে।

বড়ু চণ্ডীদাসের একটি পদে রাধার উৎকণ্ঠা :

আষাঢ় মাসে নয় মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাঁও তথা।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ১৪০৭ : ১৮৫)

বিদ্যাপতির উৎকণ্ঠিত রাধার দুঃখ :

হরি বিসরল বাহর গেহ।
বসুহ মিলল সুন্দর দেহ ॥
সানে কোনে আবে বুঝএ বোল।
মদনে পাওল আপন তোল ॥
কি সখি কহব কহেতে ধাখ।
খখন্দে জও বা কতএ রাখ ॥[৫]

(বিদ্যাপতি ২০১০ : ৯৮)

রাধারমণের পদেও প্রেমাস্পদ শ্যাম অন্য কোথাও মনোনিবেশ করেছে – ভুলে আছে রাধার কথা। সজ্জিত কুঞ্জে একা বসে উৎকণ্ঠার প্রহর পার করছে রাধা, চোখে নিদ্রা নেই। ফুলের মালা গেঁথে হাতে নিয়ে অপেক্ষা – শ্যাম কালা কখন আসে :

ক. আর তো সময় নাই গো সখী আর তো সময় নাই
সে দিন বন্ধু ছাড়া চক্ষে নিদ্রা নাই ॥
সখী গো – মনের যত দুঃখ সুখ কইগো তোমার ঠাই
বন্ধু লাগাল পাইলে কইও ঈশ্বরের দোহাই।
সখী গো একা কুঞ্জে বইয়া থাকি রজনী পোয়াই
আইজ আসব কাইল আসব বলে মনরে বুঝাই।

(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৪৬)

খ. কত দিনে ওরে শ্যাম আর কত দিনে
কত দিনে হইব দেখা বংশী বাঁকা ঐ বনে ॥
বাঁশি দেও সঙ্গে নেও যাও নিজ স্থানে
দূরে গেলে ঐ দাসীরে রাখবে কি তোর মনে।
শুইলে স্বপনে দেখি রাত্রি নিশাকালে
নিদাগেতে দাগ লাগাইলে কোন কথার কারণে।

(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬২)

গ. প্রাণ থাকিতে দেখি বন্ধু আসে কিনা আসে
আসাপথে চাইয়া থাকি মনের অভিলাষে ॥
সখি গো দংশিয়া কালনাগে সেকি প্রাণে বাঁচে

---

৫. অনুবাদ : হরি বাসর-গৃহ ভুলে গেছে। পৃথিবীতে কোথাও সুন্দর দেহ (সুন্দর নারী) মিলেছে। সংকেতের কথা এখন কী করে বুঝবে। মদন আপনার তুল্য একজনকে পেয়েছে। কী বলবো সখী, বলতে দুঃখ হয় (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০১০ : ৯৮)।

সখি বিষে অঙ্গ জরজর বাঁচিব কেমনে।
থাকিগো সাজাইয়া ফুলের শয্যা বন্ধু আসবে বইলে
সোনা বন্ধু ভুইলা রইছেন চন্দ্রার কুঞ্জেতে।
আসত যদি প্রাণবন্ধু গো বসিতাম নিরলে
কহিতাম জন্মের দুঃখ ধরিয়া চরণে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৮)

ঘ. শান্তি না পাই মনে গো নিদ্রা নাই নয়নে
সদায় কান্দে মনগো বন্ধুয়ার লাগিয়া
সখিগো একা কুঞ্জে বসে আমি পথ পানে চাইয়া
নড়িলে গাছের পাতা উঠি চমকিয়া।
শুইলে স্বপনে দেখি প্রাণবন্ধু আসিয়া
শিয়রে বসিয়া ডাকে কেশে হাত দিয়া।
জাগিয়া না দেখি তারে চারিদিকে চাইয়া
নয়নের জলে আমার বক্ষ যায় ভাসিয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩৪)

রাধা অপেক্ষায় আছে প্রাণনাথের। প্রহর-দিন যায়, ফুলের শয্যায় রাধা প্রিয়ের আগমনের প্রহর গোনে। মনে সংশয় জাগে – বুঝি বা অন্য কোনো রমণীর ফাঁদে পড়ে ভুলে আছে তাকে। তবুও মনে বিশ্বাস – একদিন আসবে প্রেমাস্পদ। গভীর উৎকণ্ঠায় তাই জিজ্ঞাসা : 'কত দিনে ওরে শ্যাম আর কত দিনে/ কত দিনে হইবে দেখা বংশী বাঁকা ঐ বনে'।

৪. বিপ্রলব্ধা

'বিপ্রলব্ধা' নায়িকার প্রেমের একটি অবস্থা। সংকেত বা ইঙ্গিত দিয়েও প্রেমাস্পদ যদি না আসে, তবে অবমানিত সেই নায়িকা হচ্ছে বিপ্রলব্ধা (মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ১৯৯৮ : ২১১)। 'সংকেত করিয়া যদি দৈবাৎ প্রাণবল্লভ না আসেন, পণ্ডিতগণ ব্যথিতান্তরা সেই নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলেন' (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৪৬৯)। এই সংজ্ঞায় প্রদত্ত অবস্থার প্রতিফলন আমরা বিভিন্ন কবির পদে দেখতে পাই। যদিও বৈষ্ণব পদাবলি রচিত হবার বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে 'বিপ্রলব্ধা' বিভিন্ন কবির কবিতায় পরিদৃষ্ট হয়।

বিপ্রলব্ধার আটরূপ : বিকলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রখরা, দূত্যাদরা, ভীতা (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৪৭)।

জয়দেবের একটি পদে রাধার বিপ্রলব্ধ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় :

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন।
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥
সকি যা রমিতা বনমালিনা ॥
বিকসিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন ॥[৬]
(জয়দেব ২০১০ : ১৭)

বিদ্যাপতির পদেও আমরা দেখি কৃষ্ণের অপ্রত্যাশিত অনুপস্থিতিতে রাধার মনের অপমানিত অবস্থা :

রিপু পঁচসর জনি অবসর
হথে সরাসন সাজে।
হেরি সূন পথ ঘটী মনোরথ
কে জান কি হোইতি আজে ॥
নিফল ভেলি জুবতী।
হরি হরি হরি রাতি তেজ হরি
পলটলি নহি দূতী ॥
সাজি অভিসারা পড়ি আঁধিয়ারা
উগি জনু জা বোরা।
আরতি বেরা জওঞা হো মেরা
লাখ গুন সঅ থোরা ॥[৭]
(বিদ্যাপতি ২০১০ : ৯৮)

উপরি-উক্ত কবিদ্বয়ের রাধার শরীরী কামনার যে রূপসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, রাধারমণের বিপ্রলব্ধা রাধার

৬. অনুবাদ : হে সখী! পবন-সঞ্চালিত নীলোৎপলের ন্যায় চঞ্চল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ যার সাথে রমণ করছেন, সে আর পল্লবশয্যায় তাপিত হয় না। বিকশিত পদ্মের মত সুন্দর মুখে তিনি যাকে চুম্বন করছেন, মদনের বান তাকে বিদ্ধ করতে পারে না (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০১০ : ১৭)।

৭. অনুবাদ : শত্রু মদন অবসর জেনে হাতে শরাসন নিয়ে সাজলো। পথ শূন্য দেখা যাচ্ছে। (কানাই আসলো না) মনোরথ পূর্ণ হলো না। আজ কি হবে কে জানে? যুবতীর আশা সফল হলো না। হরি হরি হরি রাত্রিতে হরিকে ত্যাগ করে দূতী ফিরলো না। অন্ধকার পড়তেই অভিসারে সেজেছি। এখন ভোর না হয়ে যায়। আরতি বেলায় যখন মিলন ঘটে, অল্প সুখও লক্ষ গুণ মনে হয় (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০১০ : ৯৮)।

রূপ-বর্ণনা বা কৃষ্ণের অন্যান্য সখীর সৌন্দর্য-বর্ণনায় কামার্ততার চিত্র আছে; তবে শরীরকে অতিক্রম করে মনের গাঢ়-গভীর দুঃখ এবং অপমানবোধই যেন তাঁর পদে প্রকাশিত হয়েছে :

ক. এ প্রাণ সখী ললিতে কি জন্যে আসিলাম কুঞ্জেতে ॥
কেন বা মুই কুঞ্জে আইলাম বৃথা আমি বসে রইলাম
শ্যাম বন্ধের আশাতে ॥
রজনী প্রভাত হইল কুঞ্জে বন্ধু না আসিল
নেওগো ধরো ফুলের মালা ভাসাই দেওনি জলেতে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৪৮)

খ. সজনী ও সজনী আইল না শ্যাম গুণমণি
বুঝি পেয়ে তারে রেখেছে কোন রমণী ॥
আসবে বলে রসরাজ নিকুঞ্জ করেছি সাজ
বড় লাজ পাইলাম গো রমণী ॥
শয্যায় হইল নিশিভোর ভ্রমরায় করে আকুল
কর্ণে শুনি কুকিলার কুহ ধ্বনি ॥
শুন তোরা সখিগণ জ্বালাও গো হুতাশন
অনলে ত্যেজিব পরাণী ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫৯)

গ. বল না বল না সখি কি করি উপায় গো
নিশি গত প্রাণনাথ রহিল কোথায় গো ॥
জ্বলতেছে শরীর আমার মদন জ্বালায় গো
কার কুঞ্জে রইয়াছে নিলয় না পাই গো ॥
সাজাইয়াছি ফুলবিছানা আসিবার আশায়
সেই আশা নৈরাশা হইল ভাবে বুঝা যায় গো ॥
গাঁথিয়া বনফুলের মালা আসিবার আশায়
সেই আশা ভুজঙ্গ হইয়া দংশিল আমায় ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২০)

ঘ. প্রাণবন্ধু কালিয়া আইল না শ্যাম কি দোষ পাইয়া
ও বড় লজ্জা পাইলাম কুঞ্জেতে আসিয়া ॥
প্রাণবন্ধু আসবে করি দোয়ারে না দিলাম দড়ি
ওগো আইল না শ্যাম নিশি যায় পোহাইয়া ॥

বুঝি কোন রমণীয়ে পাইয়া রাখিয়াছে শ্যাম ভুলাইয়া
এগো রহিয়াছে শ্যাম আমারে ভুলিয়া ॥
গাঁথিয়া বনফুলের মালা, মালায় হইল দ্বিগুণ জ্বালা
ও মালা দিতাম গিয়া জলেতে ভাসাইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৯)

ঙ. কহগো ললিতে সই কেন না আসিল গো
প্রাণনাথ নিকুঞ্জ কাননে।
দারুণ মুরলী স্বরে পাগলিনী হইয়া গো
আসিলেম নিশীথে গহনে ॥
বন্ধু আসিবার আশে নিকুঞ্জ সাজাইলাম গো
মিলি সব সহচরীগণে।
বৃথা হল কুঞ্জ সাজ না আসিল প্রাণনাথ
মনো দুঃখ রইল মনে মনে ॥
বাঁশিতে সংবাদ করি অবলা ছলিলা গো
বৃথা হল নিশি জাগরণে।
বাসি হল পুষ্পহার কুসুম মল্লিকা গো
প্রাণ যায় প্রাণনাথ বিনে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬৪)

এখানে 'জ্বলতেছে শরীর আমার মদন জ্বালায়' – এ পদে কবি প্রাচীন সাহিত্যের রীতির অনুসারী। তবে উনিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হয়ত রাধারমণের পদে কামনার প্রসঙ্গ অতটা প্রকট নয়। যদিও 'বিপ্রলব্ধ' অবস্থা সৃষ্টির জন্যে নায়িকার যে দেহ-মনোজাগতিক কারণ তা গোপন থাকে না। যার জন্য গ্রথিত হলো মিলন-মালা, সে-ই আসেনি। যে আসবে বলে দরজার আগল খোলা রাখা হলো, কুঞ্জ সজ্জিত হলো ফুলের রঙে-সুবাসে, সে এলো না। তার আসার আশায় থাকাই হলো দুঃখের কারণ। ফলে লজ্জায়-অপমানে, প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণায় মিলনের সমস্ত আয়োজন ছিন্ন করে রাধার বেদনায় বিদীর্ণ অবস্থাই ফুটে ওঠে কবির পদে।

৫. খণ্ডিতা

নায়কের জন্য বৃথা প্রতীক্ষায় নায়িকা নিদ্রাহীন রাত্রি কাটালো। নায়ক আসলো না। পরদিন প্রভাতে নায়ক প্রতি নায়িকার সম্ভোগচিহ্ন ধারণ করে কুঞ্জে এসে দেখা দিল। তখন ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে নায়িকার যে বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা তা-ই 'খণ্ডিতা' (নরেশচন্দ্র জানা ১৯৮৬ : ১৪২, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ১৯৯৮ :

২১২, নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৭)। 'অন্য নায়িকার সম্ভোগ-চিহ্ন-যুক্ত নায়ককে দেখিয়া কুপিতাকে' খণ্ডিতা বলা হয় (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৪৭)।

খণ্ডিতার আটরূপ : নিন্দা, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগলভা, মধ্যা, মুগ্ধা, কম্পিতা, সন্তপ্তা (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৪৭)।

বিদ্যাপতির পদে 'খণ্ডিতা' অবস্থার চিত্র :

নয়ন কাজর তুঅ অধর চোরাওল
নয়নে চোরাওল রাগে।
বদন বসন অব লুকাওব কতিখন
তিলাএক কৈতব লাগে ॥
মাধব কি আবে বোলঅব সতাহে।
জাহি রমণী সঙ্গে রয়নি গমওলহ
ততহি পলটি পুনু জাহে ॥[৮]
(বিদ্যাপতি ২০১০ : ৯৯)

গোবিন্দদাসের 'খণ্ডিতা' রাধা :

আকুল চিকুর চুড়োপরি চন্দ্রক
ভালহিঁ সিন্দুর দহনা।
চন্দন চান্দ মাহা মৃগমদ লাগল
তাহে বেকত তিন নয়না ॥
মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটলুঁ
দূরহি দূরে রহু সেবা ॥[৯]
(গোবিন্দদাস ২০১০ : ৬৩৭)

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ থেকে রাত কাটিয়ে আসা মাধবের প্রতি রাধার শ্লেষযুক্ত ভর্ৎসনা উপর্যুক্ত পদে প্রকাশিত।

---

৮. অনুবাদ : (সেই রমণীর) নয়নের কাজল তোমার অধর চুরি করল, অধরের রাগ নয়ন চুরি করে নিল। বদন ও বসন কতক্ষণ লুকাবে। কপটতা (ধরা পড়তে) তিলমাত্র সময় লাগে। মাধব এখন কি সত্যকথা বলবে? যে রমণীর সঙ্গে রাত কাটালে পুনরায় তার কাছে ফিরে যাও (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০১০ : ৯৯)।

৯. অনুবাদ : আলুথালু কেশ, চূড়ার উপর চাঁদ (ময়ূর পুচ্ছ), ললাটে সিন্দুরের আগুন। ললাটে চন্দন চান্দের মাঝখানে মৃগমদ লেগেছে, তাতেই ত্রিনয়ন প্রকাশিত হয়েছে। মাধব, এখন তো তুমি দেবাদিদেব হয়েছ। মাত্র সারারাত্রি জাগরণের পুণ্যে প্রভাতে তোমার সাক্ষাৎ পেলাম (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০১০ : ৬৩৮)।

রাধারমণের পদে 'খণ্ডিতা' রাধা পদাবলি সাহিত্যের রসতত্ত্বের নিয়মানুগ। প্রতি-নায়িকার কুঞ্জে রাত কাটিয়ে প্রভাতে ফিরে আসে নাগর কানাই। এদিকে সারারাত প্রতীক্ষায় কাটে রাধার। প্রভাতে সম্ভোগ-চিহ্নসহ উপস্থিত কৃষ্ণকে দেখে রাধা দিশেহারা :

ক. কহ কহ প্রাণনাথ নিশির সংবাদ
কার কুঞ্জেতে বসিয়া বন্ধু কার পুরাইলায় সাধ।
সিন্দুরের বিন্দু দেখি লাগিতে কপালে
মুখকিনি হাসু হাসু চউখ ঝিম্‌ঝিম্ করে।
কটিবাস পীতবাস রাখিয়াছ কোথায়
নবীন বেশ পরিধান করিলে কোথায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৪)

খ. কার কুঞ্জে নিশি ভোর রে রসরাজ রাধার মনচোর
সারা নিশি জাগরণে আঁখি হইল ঘোর।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে যেমন নিশা ঘোর
কোন কামিনী দিল তোমার কপালের সিন্দুর।
নিশি ভোরে আসিয়াছ নিদয়া নিষ্ঠুর
পথ হারা হইয়া নাকি আইলায় এত দূর।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৪)

বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের মাধবের মতোই রাধারমণের পদে কৃষ্ণের প্রাতে প্রত্যাবর্তন; এবং একইভাবে সিন্দুর, পরিধানসহ প্রতিনায়িকার কুঞ্জে রাত্রিযাপনের চিহ্নসমেত নায়ককে দেখে অপমান এবং ঈর্ষার মর্মযাতনায় 'খণ্ডিতা' রাধা।

৬. কলহান্তরিতা

যে নায়িকা সখীদের সামনে পাদপতিত প্রিয়তমকে ত্যাগ করে পশ্চাৎ অনুতাপ করে, তাকে কলহান্তরিতা বলে (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৪৪১)। কলহান্তরিতায় নায়িকা প্রবল অভিমানের বশে নায়ককে অপমান করে প্রত্যাখ্যান করে এবং শেষে অনুতাপদগ্ধ হয়।

কলহান্তরিতার আটরূপ : আগ্রহা, ক্ষুব্ধা, ধীরা, অধীরা, কুপিতা, সমা, মৃদুলা, বিধুরা (হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায় ১৯৯৮ : ৪৭)।

গোবিন্দদাসের কলহান্তরিতা রাধার অন্তরের গভীর আর্ত উপলব্ধি :

আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ ॥
সজনি তোহে কহি মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সোই তাপিনি জগ মাহ ॥[১০]
(গোবিন্দদাস ২০১০ : ৬৪০)

চন্দ্রশেখরের একটি পদে রাধার অনুতাপ :

পায়ে পড়ল হরি পায়ে পড়ল হরি
পায়ে পড়ল হরি তোর।
সবে মিলি ঐছন বোলসি পুন পুন
কোই না বুঝিলি দুখ মোর ॥
পায়ে পড়ল বলি কিয়ে হাম তৈখনে
অম্বরে উঠব যাই ॥
(চন্দ্রশেখর ২০১০ : ১০৩৯)

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোতে কৃষ্ণকে অপমান করে বিতাড়িত করার ফলে জাগ্রত অনুশোচনায় দগ্ধ রাধার বিপর্যস্ত অবস্থা বর্ণিত।

রাধারমণের পদে অনুতাপদগ্ধ রাধার উপস্থিতি আমরা লক্ষ করা যায় :

ওহে কৃষ্ণ গুণমণি মোর প্রতি দয়া ধর জানি অভাগিনী।
অভাগিনী জানি বন্ধু ফিরাও নয়নী
দেখাও স্বরূপ তোমার ভুবনমোহিনী
তুমিত গুণের ঠাকুর আমি অভাগিনী–
দয়া ধর দয়ার নাথ জানিয়া তাপিনী
তাপিনী জানিয়া বন্ধু কররে সিঞ্চনী
সিঞ্চাগুণে শীতল অউক তাপিত পরাণী।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৩৫)

---

১০. অনুবাদ : প্রেমে অন্ধ হয়ে কানু যে বহুবল্লভ প্রথমে তা দেখতে পাইনি। আদরে সাধ করে তার সাথে বিবাদ করলাম; এখন অহর্নিশ প্রাণ জ্বলে। সজনি, তোমাকে মর্মের যাতনা বলছি। কানুর দোষে যে রোষে, এ জগতে সে-ই তাপিনী (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০১০ : ৬৪০)

রাধারমণের পদে কলহান্তরিতা রাধার উপস্থিতি অল্প। কেননা, পরমসত্তা তথা 'মহাপ্রাণ'কে অপমান করে বিতাড়িত করার চিন্তা 'প্রাণ'রূপী রাধার পক্ষে কঠিন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাবই হয়ত কলহান্তরিতার স্বল্পতার কারণ।

৩.৫.৩ প্রেম-বৈচিত্ত্য

নিবিড় বাঁধনে প্রিয়তম নিকটে উপস্থিত থাকলেও প্রেমের প্রগাঢ়তার জন্য প্রেমিকার মনে প্রেমাস্পদকে হারিয়ে ফেলার সন্দেহ উদ্রেক করে। সদা আক্ষেপ – হায় আমি বিরহিত হলাম (ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯ : ৩৪১, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৯৯৪ : ২১৭)। প্রেমিকযুগলের 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' – এই অনুভূতির নাম 'প্রেম-বৈচিত্ত্য'। 'প্রেমের উৎকর্ষবশত প্রিয়ের সন্নিধানে তাহার সহিত বিচ্ছেদভয়ে যে বেদনার উপলব্ধি', তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-১১ : ৩৫৪)।

তবে, মূলত আক্ষেপানুরাগই প্রেমবৈচিত্ত্য হিসেবে বিবেচিত। আক্ষেপের নানা ধরন – শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, বাঁশির প্রতি আক্ষেপ – সখী, দূতী, গুরুজন, কন্দর্প, বিধাতা, যৌবনের প্রতি আক্ষেপ; এমনকি নিজের প্রতি আক্ষেপ। এই আক্ষেপানুরাগে বিরহী আত্মার এক করুণ আকুতি বিদ্যমান। সকল আক্ষেপের আড়ালে প্রিয়তম শ্যামের প্রতি রাধার গভীর অনুরাগ প্রকাশ পায় এবং তাতে কাব্যমাধুর্য ফুটে ওঠে (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৮)।

চণ্ডীদাসের 'আক্ষেপ' :

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
(চণ্ডীদাস ১৯৯৮ : ৭৬)

জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদ প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। যেমন :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
(জ্ঞানদাস ১৯৯৮ : ৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

লোককবি রাধারমণের পদে 'প্রেম-বৈচিত্ত্যে'র বৈচিত্র্য প্রধানত রাধার উক্তিতে প্রকাশিত। যেমন :

ক. আমি তোমার তুমি আমার ভিন্ন নাই যে জানি।
ওরে, আমায় ছাড়িয়া ভদ্রার কুঞ্জে পোহাইল রজনী ॥
আর তুমি হওরে কল্পতরু আমি হইরে লতা
ওরে দুইচরণ বেড়িয়া রাখমু ছাইড়া যাইবা কোথা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৩)

খ. প্রাণবন্ধু কালিয়া আজ তোমারে দিব না ছাড়িয়া।
ওরে বন্ধু রাখমু তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া ॥
আমার আছে শতেক দাবি রাখব তোমায় গিরিধারী
সমন দিয়া দিব ধরাইয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৪)

গ. আঁখি হইল ঘোর গো সখি নিশি হইল ভোর।
আদরের বন্ধু রইল কত দূর ॥
আগে যদি জানতাম বন্ধু নিদয়া নিষ্ঠুর
তেকেনে বাড়াইলাম প্রেম আমি এতো দূর ॥
সরছানা মাখনরে বন্ধু লুচিপুরী গুড়
বন্ধুর লাগি ঘরে থইয়া আমি হইলাম চুর ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৯৮)

ঘ. সখি উপায় বল না পিরিতি বাড়াইয়া এবে ঘটিল যন্ত্রণা।
সাধে সাধে পিরিত করি এখন তারে পাই না
লোকের নিন্দন তীর বরিষণ সহ্য করা যায় না।
পাড়ার লোকে কয় অসতী কুল ছাড়া মুই ললনা
কুঞ্জবনে ঘুরিয়া ফিরি তারত দেখা পাই না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৬)

ঙ. মা ছাড়লাম বাপ ছাড়লাম ছাড়লাম সুয়ামী–
ঘরের বাইর করি ফেলি গেলে কই যাই আমি।
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে ভিতরে জ্বলে হিয়া
এমন বান্ধব নাই আনল দেয় নিবাইয়া।

চউখ হইলো আন্ধিয়ারা – মাথায় দিলো পাক
ঘর বাইর দুই খুয়াইয়া খাইছি ঘুর পা ।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৩)

রাধা মিলনের মধ্যেই বিরহের সন্দেহে আক্রান্ত। প্রেমাস্পদকে নিজের করে পাওয়ার এবং অপরের কাছে নিজেকে সমর্পণের আনন্দে বিমোহিত। তবু মিলনেও কোথায় যেন মিলনপরবর্তী বিরহের আগাম ইঙ্গিত। প্রেমবৈচিত্ত্যের এই অনুভূতিরই অংশবিশেষ আক্ষেপানুরাগ। তাতে চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসের পদের যে শিল্পমাধুর্য তা হয়ত রাধারমণের পদে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তবে আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করে যার জন্য জগতের সমস্ত কলঙ্ক মাথা পেতে গ্রহণ করলে, সেই প্রেমিকের অবহেলায় প্রেয়সী রাধিকার যে আক্ষেপ –'তেকেনে বাড়াইলাম প্রেম আমি এতো দূর' – ভাবের ঘরে বিভাবের দূতনা প্রদান করে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবলাকর্ষণের যে অসম্ভব তৃষ্ণা – অনুরাগের প্রাবল্য, তা আক্ষেপের আড়ালে ঢাকা থাকে না – ফুলের সুবাসের মতো রসের সৌন্দর্য ছড়ায়।

৩.৫.৪ প্রবাস

পূর্বসম্মিলিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে দেশ-গ্রাম-নদী-বনাদির তথা স্থানান্তরের ব্যবধানকে প্রবাস বলে (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৭৮, নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৮)। প্রবাস এবং বিরহকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমার্থক ভাবা হয়। এটি 'মাথুর লীলা' নামেও পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা গমনের ফলে এই বিরহের সৃষ্টি হয়েছে বলেই এমন নামকরণ।

প্রবাস মূলত বুদ্ধিপূর্বক এবং অবুদ্ধিপূর্বক – এই দুই প্রকার হলেও তিন প্রকারের প্রবাস লক্ষ করা যায় : ভাবী প্রবাস, ভবন প্রবাস ও ভূত প্রবাস (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৭৯, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-১১ : ৩৫৫)। ভাবী প্রবাস বা বিরহ হয় নায়ক-নায়িকার বিদেশ গমনের বার্তা প্রচারের মাধ্যমে। নায়ক-নায়িকার বিদেশ ও দূরে গমন চলছে – এমন সময় হয় ভবন প্রবাস। ভূত বিরহ বা প্রবাসে নায়ক-নায়িকা বহুদিন হয় বিদেশে গিয়েছে; আসবে বলেও আসছে না, তখন যে বিরহ তা-ই ভূত বিরহ বা প্রবাস।

বৈষ্ণব পদাবলির বিরহের পদগুলোতে ভূত বিরহের পদই মর্মস্পর্শী; এবং এতে নায়িকা তথা রাধার বিরহদশাই বর্ণিত – কৃষ্ণের বিরহের পদ অল্প। রাধার বিরহের মর্মযাতনায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে সমগ্র বৈষ্ণবপদ। পূর্বরাগ-অনুরাগ, মান-মিলনের পর্ব পেরিয়ে বিরহই যেন পদাবলির প্রধান সুর। কৃষ্ণের জন্য রাধার প্রতীক্ষার আর্তিই যেন পদাবলি সাহিত্যের প্রধান চিত্র।

রাধার প্রবাস বা বিরহের যাতনাকে আমরা লক্ষ করি বিদ্যাপতির পদে :

সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ কত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যায়ত ছাতিয়া ॥[১১]
(বিদ্যাপতি ১৩৫৯ : ৪৪৮)

ভরা বাদলের রাতে দশদিক ঝেঁপে যখন বৃষ্টির আনন্দ ঝরে পড়ে, তখন জেগে ওঠে প্রকৃতি। রাধার কান্ত পরবাসে, তাকে ছাড়া এই আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। ময়ূর, দাদুরি আর ডাহুকির কলরবে মনের গহীন থেকে জেগে ওঠে দিগন্তবিস্তারী বিরহ। বেদনায় প্রাণ মূর্ছিত রাধার।

গোবিন্দদাসের রাধাও বিরহের মর্মযাতনায় অস্থির :

এই ত মাধবী-তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ান।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥
সখি হে, বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে ॥
(গোবিন্দদাস ১৯৯৮ : ১৬০)

রাধারমণের প্রবাসের পদে প্রাচীন বিরহেরই প্রতিধ্বনি :

ক. রে ভ্রমর, কইয়ো গিয়া–
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া ॥
ভ্রমর রে, কইয়ো কইয়ো, হায়রে ভ্রমর

---

১১. অনুবাদ : সখী আমার দুঃখের শেষ নেই। এই ভরা বাদল, ভাদ্র মাস, আমার গৃহ শূন্য। মেঘ চারিদিক ঝেঁপে গর্জন করছে এবং সারা ভুবনে বর্ষণ করছে। কান্ত প্রবাসী, কাম দারুণ, সঘনে তীক্ষ্ণ শর হানছে। কত শত বজ্র পড়ছে, আনন্দিত ময়ূর মত্ত হয়ে নৃত্ত করছে। মত্ত দাদুরি ও ডাহুক ডাকছে, (আমার) বুক ফেটে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ বন্ধের লাগ পাইলে–
আমি রাধা মইরে যাব কৃষ্ণহারা হইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৮)

খ. রাধার উকিল হইও কুইল, রাধার উকিল হইও।
এগো শ্যাম বিচ্ছেদে জ্বইলাছে অনল শ্যামেরে পাইলে কইও ॥
যেথায় গেছেন শ্যামরায় তথায় চইলে যাইও।
অভাগিনী রাই কিশোরীর সংবাদ জানাইও ॥
বৃন্দাবনে গিয়া কুইল মুক্ত প্রণাম করিও
ওরে তমাল ডালে বইসে কুইল রাধার গুণ গাইও।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৭)

গ. রাধানি আছইন কুশলে কওরে সুবল সারাসার
রাধা বিনে কে আছে আমার।
সুবলরে রাধা তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা গলার হার
রাধার জন্য আমি থাকি দিবানিশি অনাহার।
সুবলরে রাধা আমার প্রেমের গুরু আমি শিষ্য তার
রাধা প্রেমের প্রেমঋণ আমি কি দিয়ে শুধিতাম ধার।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৬)

ঘ. মনের মানুষ এ দেশেতে নাই প্রাণসখি বলগো মোরে–
কারে দেখি প্রাণ জুড়াই ॥
কার কাছে কই মন বেদনা এমন সুহৃদ কেউ নাই
জলে যাইতে হড়ির মানা ঘরে বসি কাল কাটাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২২)

ঙ. মিছা কেন ডাক রে কোকিল মিছা কেন ডাক
এগো ভাঙ্গিয়াছে রাধার বিছানা তোমরা সুখে থাক ॥
আমডালে থাকরে কোকিল নিমডালে বাসা
এগো শূন্যে উড়, শূন্যে পড় তোমার কি তামাশা ॥
অঙ্গ কালা বস্ত্র কালা শিরে জটাজটা
এগো তে কেনে করিলাম পীরিত রাধা জিতে মরা ॥
(রাধারমণ দত্ত ১৩৮৪ : ৪২৬)

চ. শান্তি না পাই মনে গো নিদ্রা (নাই) নয়নে
সদায় কান্দে মনগো বন্ধুয়ার লাগিয়া।
সখিগো একা কুঞ্জে বসে আমি পথ পানে চাইয়া
নড়িলে গাছের পাতা উঠি চমকিয়া।
শুইলে স্বপনে দেখি প্রাণবন্ধু আসিয়া
শিয়রে বসিয়া ডাকে কেশে হাত দিয়া।
জাগিয়া না দেখি তারে চারিদিকে চাইয়া
নয়নের জলে আমার বক্ষ যায় ভাসিয়া।
আশায় আশায় জনম গেল পন্থপানে চাইয়া
রাধারমণ কয় প্রাণ না ত্যেজ গরল খাইয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩৪)

ছ. সুবল সখা পাইনারে দেখা, কইও রাধারে।
বহু দিনের পরেরে সুবল রাধা পড়ে মনে
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল হিয়ার মাঝারে ॥
রাধা তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা কর্ণধার
রাধা বিনে এ সংসারে কে আছে আমার ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৭৯)

'পদাবলি সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য' (দীনেশচন্দ্র সেন ২০০২ : ২০৯)। এ নয়নের জল রাধার। রাধারমণের প্রবাস বা বিরহের পদে রাধার আকুতি, বিচ্ছেদের মর্মস্পর্শী আর্তির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। পদাবলির রীতি অনুযায়ী প্রবাসের প্রায় সমগ্রকে ধারণ করে আছে রাধা। প্রাণের নাথ তাকে ছেড়ে চলে গেছে বহুদূর – কবে আসবে জানা নেই; আদৌ আসবে কিনা সে প্রশ্নও মনের কোনে উঁকি দেয়। আকাশ সমান দুঃখ নিয়ে রাধার জীবন-ধারণ – এ দুঃখের অনল দহন করে সবকিছু। তবু মনে আশা, প্রাণনাথ আসবে একদিন – প্রাণ জুড়াবে তার দরশনে। এতজ্বালা সর্বাঙ্গে ধারণ করে তাই প্রেমাস্পদের আগমনের প্রতীক্ষায় দিনগোনে রাধা – যদি প্রিয়তম আসে। কোকিলকে অনুরোধ করে, ভ্রমরের প্রতি বিনীত প্রাণের আকুতি – রাধার বিরহের দশ দশা যেন মাধবকে জানায়। চোখের জলে অপেক্ষা করা ছাড়া রাধা আর কী করতে পারে?

এদিকে মথুরা প্রবাসী মাধবের মনেও একদিন জাগে অতীত দিনের মধুর স্মৃতি। এত প্রেম, এত ত্যাগ, এত নিবেদন রাধা বিনে আর কার মধ্যে আছে? তাই যাকে একদিন প্রেমের দীক্ষা দিয়েছে মাধব, তাকেই আজ গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তার প্রতি অবহেলায় আজ প্রাণ কাঁদে।

৩.৫.৫ সম্ভোগ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নরনারীর মিলনের কাহিনি রূপায়ণের বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রেমকাহিনি রচনায় বিরহের চেয়ে মিলনের চিত্র অঙ্কনেই কবিরা প্রয়াসী। সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রেমগীতিকায় মিলনের চিত্রেরই প্রাধান্য। ফলে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কবিদের দেহ-সম্ভোগের বা ভোগের কবি হিসেবে যে আখ্যা দেয়া হয়েছে, তা যুক্তির নিরিখেই (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৫৬১)। তবে বৈষ্ণব কবিরা সম্ভোগের বা মিলনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেননি (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৮)। মিলনের চেয়ে বিরহের রূপায়ণই হয়ে উঠেছে বৈষ্ণব কবির শিল্প-প্রচেষ্টার প্রধান অনুষঙ্গ।

'দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যহেতু নায়ক-নায়িকার যে ভাবোল্লাস তাকে সম্ভোগ বলে' (নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৯)। দেহ-সম্ভোগ-জনিত উল্লাসই সম্ভোগ বলে কথিত (দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯ : ৫৬২)। বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের মিলনের মানবিক বর্ণনাই সম্ভোগের পদে ফুটে উঠেছে। একে রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলাও বলা হয় (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-১১ : ৩৫৬)।

সম্ভোগ দুই প্রকার : মুখ্য ও গৌণ সম্ভোগ। জাগ্রত অবস্থার মিলনজনিত যে ভাবোল্লাস তাকে মুখ্য সম্ভোগ বলা হয়। স্বপ্নাবস্থায় বা কল্পনার মিলনকে বলে গৌণ সম্ভোগ।

মুখ্য সম্ভোগ আবার চার প্রকার : সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

ভয় ও লজ্জাবশত স্বল্পকালীন যে চুম্বন-আলিঙ্গনাদির মিলন তা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। পূর্বরাগের পরে এ মিলন সংগঠিত হয়। নায়কের বঞ্চনা-স্মরণে, কিংবা বিপক্ষ গুণকীর্তন স্মরণে নায়িকার মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জন্মায় – এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ সম্মিলিত না হলে যে মিলন ঘটে, তাকে সংকীর্ণ সম্ভোগ বলে। এ সম্ভোগ ঘটে মানের পরে। স্বল্পকালীন প্রবাসের পর যে মিলন ঘটে, তাকে বলে সম্পন্ন সম্ভোগ। দূরপ্রবাসের পর নায়ক-নায়িকার মিলনে হয় সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

সম্ভোগের উপর্যুক্ত চার ভাগের প্রতিটির রয়েছে আটটি করে উপবিভাগ (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৮৮-৮৯, নীলরতন সেন ২০০০ : ৫৯)।

চণ্ডীদাসের একটি মিলনের পদ :

পিরীতি-রসেতে ঢালি তনুমন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
(চণ্ডীদাস ১৯৯৮ : ১৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মুর্তাজার পদে রাধার কৃষ্ণে বিলীন হওয়ার পরম অনুভূতি ব্যক্ত :

তুমি সে আমার আমি সে তোমার
তোমার তোমাকে দিতে কি যাবে আমার।
কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব
তোমার তোমারে দিয়া, তোমার হইয়া রব ॥
(সৈয়দ মুর্তাজা ১৯৯৮ : ১৯৫)

বিরহের গাঢ়-গভীর অনুভূতির আকুতি, না-পাওয়ার অতল অতৃপ্তিই যেন বৈষ্ণব পদাবলির মূল ভাব-সৌন্দর্য। এখানে মিলন আসে অনেক অপেক্ষার বিরহের অনলে পুড়ে। ক্ষণিকের মিলন তাই নিয়ে আসে সীমাহীন সুখের আনন্দ। রাধারমণের মিলনের পদেও আমরা এই রীতিই লক্ষ করব। যেমন :

ক. একাসনে রাইকানু প্রেমে ভাসিয়া যায়
একজনের গায়ের বসন আরেক জনের গায়
কে রাধা কে কৃষ্ণ চিনন না যায় ॥
শ্যামের বামে রাইকিশোরী বইছইন দুইজনে
পুষ্পবৃষ্টি করে তারা সব সখিগণে।
দুবাহু তুলিয়া শ্যামে ধরেন রাইর গলায়
চন্দ্রগ্রহণ লাগিয়াছে ভাবে বুঝা যায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে দেখো সখিগণে
যুগলমিলন হইল আজি রস বৃন্দাবনে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬০)

খ. কত আদরে আদরে
শ্যামসুয়াগী রসিক নাগর মিলিল দুইজনে।
কত ভঙ্গী করি দাঁড়াইয়াছে একই আসনে ॥
শ্যাম কুলে রাই রাইকুলে শ্যাম, শ্যাম রাইর কুলেতে
কী আনন্দ হইল আজি নিকুঞ্জ বনে ॥
মেঘের কোলে সৌদামিনী উদয় গগনে
কত পুষ্পচন্দন ছিটাইয়াছে সব সখিগণে
ভাইবে রাধারমণ বলে, আমায় রাখিও কমল-চরণে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০০ : ৩৬১)

Dhaka University Institutional Repository

গ. ছাড়িয়া না দিব বন্ধুরে ছাড়িয়া না দিব
তুমি যদি ছাড় বন্ধুরে আমি না ছাড়িব।
ওরে সুনারো পুতুলার মত হৃদয়ে রাখিব ॥
তুমি হইবায় কল্পতরুরে বন্ধু আমি হইব লতা
দুই চরণ বান্ধিয়া (রাখব) ছাড়িয়া যাইবায় কোথা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৪)

ঘ. পূর্ব দিকে চেয়ে দেখ আর তো নিশি নাই
জয় রাধিকা জাগো শ্যামের মনমোহিনী
বিনোদিনী রাই।
... শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে কি সুখে আছো ঘুমিয়ে
লোকনিন্দার ভয় কি তোমার নাই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৫)

ঙ. মধুর মধুর অতিসুমধুর মোহন মুরলী বাজে
দেয় করতালি ব্রজের নাগরী মঙ্গল আরতি মাঝে।
শঙ্খ ঝাঞ্জরী পাখোয়াজ খঞ্জরী কেহ কেহ বীণ বাজে
তা ধৃক তা ধৃক তা – তা তা থৈয়া মধুর মৃদঙ্গ বাজে।
ধূপ দীপ লইয়া মধুর আনন্দে ললিতা বিশাখা সাজে
ময়ূরা ময়ূরী নাচে ঘুরি ঘুরি রাই কানু থইয়া মাঝে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৬)

চ. মিলিল মিলিল মিলিল রে
আজ কুঞ্জে রাধা কানাই মিলিল রে।
শ্রীরাধিকার প্রেমরসে বিচিত্র পালঙ্ক ভিজে
কানাইর মাথার চূড়া হালিল রে।...
ভাইবে রাধারমণ কয় রাধা কানাইর মিলন হয়
মধুর বৃন্দাবন আজ প্রেমরসে ভাসিল রে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৭)

ছ. সখী দেখো রঙ্গে কেলি কদমতলায় নাচে রাধাবনমালী ॥
দুই তনু এক করি করে তারা কেলি
বামেতে রাধিকা দেখো ডানে বনমালী।
দুই রূপ এক হইয়া উঠিছে উজালি
বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে করে ঝলমলি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৮)

জ. সুখের নিশিরে বিনয় করি প্রভাত হইও না
তুমি নারী হইয়ে নারীর কোন বেদন জান না ॥
ও নিশিরে আমার একটা কথা রাখ আঁধার হইয়া থাক
প্রভাত কালে যাবে ফেইলে কেনো নিশিরে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৮)

অনেক প্রতীক্ষার পর আসে কাঙ্ক্ষিত মিলনের প্রহর। রাধা এবং বনমালীর মিলনে আনন্দ সীমার বাঁধনকে অতিক্রম করে। একে অপরের আলিঙ্গনে অভিন্ন হয়ে মিশে যায়। চণ্ডীদাসের পদে আমরা দেখি রাধিকা কলঙ্কের মালাকে আগ্রহ ভরে বরণ করে নেয়। সুখ আর কলঙ্ক যেন তখন সমার্থক হয়ে ওঠে। রাধারমণের পদেও আমরা লক্ষ করি রাধার লোকলজ্জার প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা। লতা হয়ে প্রেমিক কল্পতরুর গায়ে জড়িয়ে থাকার সাধ আধ্যাত্মিকতার রহস্যময়তাকে অতিক্রম করে মানবিকতার অনুভূতিশীল প্রাণকে যেন স্পর্শ করে যায়। মিলনের পদে রাধারমণের কবিত্ব শিল্পদৃষ্টির পরিচায়ক। রাধাকৃষ্ণের মিলনকে 'মেঘের কোলে সৌদামিনী'র তুলনা কিংবা, মিলনের আনন্দে বিভোর রাধিকার রাত্রির প্রতি প্রভাত না হওয়ার যে কাতর আহ্বান, তা শিল্পের ঐতিহ্যবাহী কাব্যিক দৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

আমরা লক্ষ করি, কেবল রাধিকার উক্তিতে নয় – কবি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেও মিলনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ফলে, কেবল বর্ণনা না হয়ে তা হয়ে উঠেছে একেকটি চিত্রকল্প। রাধাকৃষ্ণের মিলনে (উদাহরণ 'ঙ') ললিতা-বিশাখার সাথে যেভাবে নৃত্য-গীত-সুর-তালে জেগে ওঠে প্রতিবেশ, তাতে প্রতীয়মান হয় – এই মিলনের জন্যেই বুঝি অপেক্ষায় ছিল প্রকৃতি। না হলে তার আনন্দ এতো সর্বপ্লাবী হবে কেন!

বৈষ্ণব পদাবলির ধারায় রাধারমণের কবিতা পাঠে আমরা বলতে পারি, রাধারমণ ছিলেন পদাবলি সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক। গোস্বামীগণকৃত রসতত্ত্বের যে শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠিত তার অনুসরণেই তিনি পদ রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রাধারমণের কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক

(ক) রাধারমণের কবিতার বিষয়বস্তু

রাধারমণের সহস্রাধিক পদাবলি নানা বিষয়কে ধারণ করে শিল্পরূপ লাভ করেছে। এরমধ্যে বিশিষ্ট বিষয়গুলো হচ্ছে : প্রেম, প্রার্থনা, দেহতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য। এছাড়া শক্তিবন্দনা, ত্রিনাথবন্দনা, বিয়ে, সমসাময়িক কোন বিষয়কে আধেয় করে কবি রচনা করেছন বিপুল পরিমাণ গীতিকবিতা।

প্রেম : গীতিকবির পদাবলির মৌল বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সংগৃহীত গানের সিংহভাগ রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার শিল্পরূপ।

রাধাকৃষ্ণ বিষয় বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি জনপ্রিয় অনুষঙ্গ। লোকসংস্কৃতি থেকে আধুনিক শিল্প-সাহিত্য – ছড়া, কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, ভাস্কর্য প্রভৃতির চরিত্র হয়ে বাঙালি পাঠকের অন্তরে স্থায়ী আসন পেতে আছে রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যান। এক গোপ বালকের প্রেমিকসত্তায় উত্তরণ এবং গোপ বালিকাবধূর গভীর-গোপন প্রণয়ের কাহিনি যুগযুগ ধরে পাঠকশ্রোতার আনন্দ ও ভক্তির কারণ হয়েছে। মানবিক এই প্রেমকাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে বিপুল পরিমাণ শিল্পভাণ্ডার (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ১২০)।
তবে রাধারমণের গানের বিষয় কেবল মানবিক প্রেমোপাখ্যান নয়। এতে লৌকিক কাহিনি বৈষ্ণবীয় ধর্ম-দর্শনের অলৌকিক কাব্যের রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা এবং রাধা জীবাত্মা – ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা – দুয়ের সম্পর্ক প্রেমের। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনে ভেদ ঘুচে গিয়ে অভেদরূপ লাভ করে (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : গ-ঘ, আহমদ কবির ২০০৮ : ৫০৪)। এই প্রেমতত্ত্বকে শশিভূষণ দাশগুপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা নিত্য-কিশোর-কিশোরী, এই নিত্য-কিশোর-কিশোরীর নিত্য-প্রেমলীলাই একমাত্র আস্বাদ্য। বলা যাইতে পারে যে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতু রাধা ও কৃষ্ণ ত স্বরূপতঃ একই; স্বরূপতঃ যাহা এক তাহার আবার যুগলমূর্তির কল্পনা কেন? ইহার জবাব এই যে, উভয়েই এক হইয়াও লীলাচ্ছলে আবার দুই, – অভেদের ভিতরেই ভেদ। অচিন্ত্য শক্তিবলেই এই অভেদে লীলাবিলাসে ভেদ, ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ। (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২১৭)

এই অপ্রাকৃত নিত্য প্রেমলীলা মানবিক ভাবাধারে প্রকাশিত।

রাধারমণের গানের মুখ্য বিষয় প্রেম। যে প্রেম জগৎ-সংসারের বাধা মানে না, লোকলজ্জার ধার ধারে না; মিলনের বাসনা-উদ্‌গ্রীব অন্তর সর্বদা প্রেমাস্পদের জন্য ব্যাকুল হয়। পাওয়ার আনন্দের চেয়ে না পাওয়ার বেদনাই যেখানে মুখ্য। এই প্রেম প্রতিদানের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত নয়, দানের উদারতাতেই সে আনন্দ খুঁজে পায়।

প্রার্থনা : রাধারমণের গান বা গীতিকবিতার অন্যতম প্রধান বিষয় – প্রার্থনা। দয়াল, গুরু, দয়াময়, গৌর, বন্ধু, হরি প্রমুখের শরণ নিয়ে রাধারমণ এ জগৎ-সংসারের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধারের আকুতি জানিয়েছেন। তিনি জানেন, যাঁর আশ্রয় তিনি নিয়েছেন, তিনি দয়াময়, কৃপার সিন্ধু – পরম বন্ধু। তিনি চাইলেই পাপী-তাপীর যন্ত্রণা দূর করতে পারেন। ভবসমুদ্রের তীরে অসহায় বসে থাকা কবির সম্মুখে সমনতরি। দয়াল হরির কৃপায় অকূল সিন্ধু পাড়ি দিতেই তাঁকে আকুল প্রার্থনায় ডাকা। নিজেকে তুচ্ছ এবং অধমজ্ঞান করে কবি পরমের নিকট তাঁর অপরাধ ও ত্রুটি ক্ষমার প্রার্থনা জানিয়েছেন। যাঁর ক্ষমা পেলে মানবজন্ম সার্থক হবে।

দেহতত্ত্ব : রাধারমণ কিছু পদের ভণিতায় নিজেকে বাউল হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। বাউল এবং সহজিয়া দর্শনের অনুসারীদের রয়েছে গোপন এবং স্বতন্ত্র সাধন-রীতি। দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এসব সাধনক্রিয়া। বাউলধর্মের মূলসাধনাটি যোগক্রিয়ামূলক। দেহকেন্দ্রিক এই সাধনা 'দেহতত্ত্ব' নামে পরিচিত।

মানবজীবন ও মানবদেহ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের চিন্তা এবং আরাধনার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। বাউল বা সহজিয়া সাধনরীতি এই ধারারই বিশিষ্ট প্রকাশ। তাদের মতে, সকল সত্য আমাদের দেহের মধ্যে। 'যে-সত্য বিরাজিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপুল প্রবাহের ভিতরে, সেই সত্যই বিরাজিত আমাদের দেহের ভিতরে – সমস্ত জৈবিক প্রবাহের ভিতরে' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৪৮)। এই তত্ত্ব বা দর্শনে বিশ্বাস করা হয়, দেহের মধ্যেই মূলতত্ত্ব আত্মা বা ভগবানের বাস। এই মানবদেহকে আশ্রয় করে সাধনভজনের মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি করাই তাদের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮ : ৩২৩)। রাধারমণ বিশ্বাস করেন,'মনের মানুষ' দেহের মধ্যেই বিরাজ করে – 'হৃদয় মণিপুরে' তাঁর ঠিকানা। তার ক্ষুদ্র দেহে মনের মানুষের জায়গা হয় না। তবুও সে মনোহরা ঘরছাড়া থাকে না। বায়ান্ন গলি তিপ্পান্ন বাজারের এই রহস্যময় দেহের মূলকোঠায় মহাজনের বসবাস। দেহের মধ্যেই তাঁর নিবাস; অথচ রাধারমণের আক্ষেপ – 'ঘরে থইয়া ধরতে আমি না পারিলাম অধরা।' 'দেহতরী'র কে কারিগর, কে চালক, কী পরিচয় মহাজনের – তাকে দেখা, বোঝা এবং পাওয়ার আকুতিই রাধারমণের গীতিকবিতায় গীতল ভাষায় বাণীরূপ লাভ করেছে।

শ্রীচৈতন্য : শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক। মধ্যযুগের সামন্তসমাজে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অরাজনৈতিক চরিত্র দ্বিতীয় আর নেই। বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা তাৎপর্যবহ এবং যুগান্তকারী (ওয়াকিল আহমদ ২০০৬ : ২৪৪)। তিনি ঘোষণা করলেন, মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। প্রেম হচ্ছে জগতের প্রাণ। এই প্রেমের দ্বারাই মানুষ চিনে নিতে হয়। তবে কোনো সাধনায় এই প্রেম পাওয়া যায় না। অকপটে ভগবানের নাম, লীলা, গুণগান করলে – একান্তভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করলে তাঁর ভক্তগণের সঙ্গলাভ হয়। ভক্তগণের কৃপা হলেই প্রেমলাভ হয়। তিনি হরিনাম প্রচার করেছিলেন, প্রচারের উপদেশ প্রদান করেছিলেন, এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ২৯)। 'নামাশ্রয়' তত্ত্ব তথা নামকে আশ্রয় করে নিরাকারের সাধনপথের প্রবর্তক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বা শ্রীচৈতন্য (ফরহাদ মজহার ২০০৯ : ৭৭)। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগানুগা ভক্তিবাদ

বৈষ্ণবধর্মের মূলকথা। এতে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা এবং রাধা জীবাত্মা হিসেবে বিবেচিত। মর্ত্যলীলা উপভোগার্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দশক্তিকে রাধারূপে সৃষ্টি করেন। দুইয়ের মধ্যে ভেদ-অভেদ-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। ভেদ বা দ্বৈত অবস্থায় রাধা ব্যথা, বেদনা, আকুলতায় আক্রান্ত। অভেদরূপেই রাধার শান্তি। প্রেমসাধনার দ্বারাই কৃষ্ণকে লাভ করা যায়। প্রেমভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম জপ বা ভজন করলে তাঁকে পাওয়া যায়। এই সাধন-ভজনের দার্শনিক নাম রাগানুগা ভক্তিবাদ। শ্রীচৈতন্য এই রাগানুগা ভক্তিবাদের অনুসারী এবং প্রচারক। রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ধারণ করে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব (ওয়াকিল আহমদ ২০০৬ : ২৪৪)।

রাধারমণের গানে শ্রীচৈতন্যের মহিমার কীর্তন প্রকাশিত। গৌরাঙ্গ কোথাও-বা অবতার রূপে আরাধ্য। লোককবির গানেও আমরা তাঁর অবতার রূপের পরিচয় লাভ করি। নিমাই, গৌর, গৌরচান, গৌরচান্দ, গৌরাঙ্গ, সোনার মানুষ, মানুষ প্রভৃতি নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে এসব গানে। তাঁর শরণ প্রার্থনা করে পাপ-পঙ্কিলে মজা জগৎসংসার থেকে কবি মুক্তি প্রার্থনা করেছেন।

অন্যান্য বিষয় : মাতৃরূপিনী শ্যামা রাধারমণের কিছুসংখ্যক গীতিকবিতার বিষয় হয়েছেন। এই শ্যামাসংগীত বা শাক্তপদাবলিতে মাতৃদেবীর করুণা প্রার্থনার আকুলতা রাধারমণের পদে লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলি যেমন মধুর রসের প্রাধান্য, শাক্তপদ তেমনি বাৎসল্য রসের (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ভূমিকা-ঠ)। রাধারমণের অল্পসংখ্যক গান ত্রিনাথ বা শিবকে বিষয় করে। এতে আরাধনার নিষ্ঠাই মূলত প্রকাশিত। মহাদেবের চরণে আশ্রয় প্রার্থনা এসকল গানের মৌল প্রবণতা। এছাড়া বিয়ে, সামাজিক বিষয় ইত্যাদি রাধারমণের কয়েকটি গানে বাণীরূপ পেয়েছে।

(খ) রাধারমণের কবিতার আঙ্গিক

আধার এবং আধেয়ের যৌথ সমবায়ে গড়ে ওঠে অনন্যশিল্প – কবিতা। আমাদের চিন্তা, কল্পনা, আবেগ, আসক্তি, অনুভূতি ইত্যাদিকে বিষয় করে যেমন কবিতা বৈচিত্র্যপূর্ণরূপে নির্মিত হয়, তেমনি নানা উপাদানে অনবদ্যভাবে সজ্জিত হয় কবিতার বাহ্যিক অবয়ব। কবিতার এই বাহ্যিক কাঠামোকে আমরা বলছি আঙ্গিক (Form)। সম্ভবত, সৃষ্টিলগ্ন থেকেই কবিতার বিষয়ের সাথে আঙ্গিকের প্রসঙ্গটি সমান গুরুত্ব পেয়ে আসছে। কালের প্রবাহে সমকালীনতাকে ধারণ করতে গিয়ে কবিতার বিষয়ে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি কবিতার কাঠামোতেও এসেছে ব্যাপক বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তন।

৪.১ কবিতার রূপ

অনুকরণস্বভাবী মানুষের (আরিস্টটল ২০০৩ : ৪৫) অন্তর্লোকে বাইরের জীবন ও জগতের যে ছায়া পড়ে – যা সাহিত্যস্রষ্টার মানস-লোকে সুরের ঝংকার তোলে, তার শিল্পসম্মত প্রকাশই সাহিত্য (শ্রীশচন্দ্র দাশ ২০০৩ : ২০)। সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কাব্য বা কবিতা। প্রাচ্যের আলংকারিকগণ সাহিত্য এবং কাব্যকে অভিন্নজ্ঞান করলেও (সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১৯৯৮ : ২) আবেগানুভূতি, স্মৃতি-স্বপ্ন-কল্পনার শৈল্পিক আধার কবিতা এক রহস্যময় শিল্পমাধ্যম।

শিল্পের বহুধা বিভক্ত ধারায় কবিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা অধিকার করে আছে (বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯ : ২১)। অনুভূতির আধার কবিতা তার রূপের সৌন্দর্যের বা বৈচিত্র্যময় রসের বিভা ছড়িয়েছে যুগযুগ ধরে। কালের পরিক্রমায় কবিতার রূপ বা শরীরী গঠনের যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি এর সংজ্ঞার্থেও এসেছে নতুনত্ব।

অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিন্যাসকে কবিতা বলা হয়েছে (শ্রীশচন্দ্র দাশ ২০০৩ : ৩০)। কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতিসুখ-সম্ভোগকালে রসমূর্চ্ছিত মানবের ভাববিধুর গদগদ ভাবও কবিতা (শ্রীশচন্দ্র দাশ ২০০৩ : ৩০)। কবির হৃদয়ের 'কল্পনা এবং কল্পনার ভেতর চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা' (জীবনানন্দ দাশ ১৯৯৮ : ৫৫৭) থেকে যে রসাত্মক শব্দবিন্যাস শিল্পের দাবি নিয়ে পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্যের আলোড়ন তোলে, তা কবিতা নামে আখ্যায়িত। শিল্পের ক্ষেত্রে কিংবা কবিতার বিষয়ে সৃজনী কল্পনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, তেমনি সমান মর্যাদা দাবি করে প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা – 'শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে কবিতা' (ওয়ার্ডসওয়ার্থ : উদ্ধৃত : শ্রীশচন্দ্র দাশ ২০০৩ : ৩০)। আত্মপ্রকাশাকাঙ্ক্ষী কবির রহস্যময় মনোভূমি কবিতার প্রকাশ বা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অধিষ্ঠান। কবির অন্তর্লোক হতে বচন আহরিত হয়ে কবিতা নামের আনন্দলোক নির্মিত হয়।

রাধারমণের শিল্পসৃষ্টি কবিতা নামে আখ্যাযোগ্য কি-না – তা প্রত্যক্ষ করার অভিপ্রায়ে উপর্যুক্ত সংজ্ঞা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কবিতার প্রকারভেদ সম্বন্ধে সচেতনতা আবশ্যক।

কবিতাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয় : মন্ময় কবিতা ও তন্ময় কবিতা।

মন্ময় কবিতা : কবি যখন ব্যক্তিগত আবেগানুভূতি, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধকে শিল্প-উপকরণরূপে গ্রহণ করে এর অনন্য প্রকাশ ঘটান, তখন তা মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা রূপে পরিগণিত হয় (কবীর চৌধুরী ২০০৮ : ১০২)। মন্ময় কবিতার নানা বিভাজন : ভক্তিমূলক, স্বদেশ-প্রীতিমূলক, চিন্তামূলক, প্রেমমূলক, শোকমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক, সনেট, লঘুবৈঠকী, স্তোত্র কবিতা।

তন্ময় কবিতা : যে কবিতায় কবি নৈর্ব্যক্তিকভাবে কল্পিত ঘটনাবলি বা চরিত্র, কিংবা বস্তুজগতের যথাযথ পরিস্ফুটন ঘটান, তখন তাকে তন্ময় কবিতা বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বলে (কবীর চৌধুরী ২০০৮ : ১০২)। তন্ময় কবিতাও নানাভাগে বিভক্ত : গাথা, মহাকাব্য, নীতি-কবিতা, রূপক, ব্যঙ্গ-কবিতা, লিপি-কবিতা।

মন্ময় কবিতায় কবির ব্যক্তিগত নিবিড় অনুভূতির প্রাধান্য এবং তন্ময় কবিতায় বস্তুসত্তার আধিপত্য লক্ষ করা যায় (শ্রীশচন্দ্র দাশ ২০০৩ : ৪২)। এই মন্ময় কবিতার অপর নাম গীতিকবিতা। ইংরেজি lyric শব্দের

প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা গীতিকবিতার প্রচলন। গীতিকবিতা 'মোটামুটি ছোট একটি কবিতা, যা কাহিনি বা গল্প বর্ণনা করে না, যার মধ্যে একজন মানুষের মনের ভাব, অনুভূতি বা চিন্তাধারার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটে' (কবীর চৌধুরী ২০০৮ : ৮৮)। গীতি-কবিতার পরিসর নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন,'গীতিকবিতায় একটি মাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টলমল করিয়া ওঠে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১১ : ৪৪৮)। যে-কবিতায় গীত এবং কাব্যের উদ্দেশ্য অভিন্ন; এবং 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮০ : ১৮৭)। বলা যায়, সুনির্দিষ্ট আবেগানুভূতি বা চিন্তা, কিংবা অবস্থার শৈল্পিক প্রকাশ হচ্ছে গীতিকবিতা। আন্তরিকতাকে গীতিকবিতার প্রাণ বলা হয়। আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতি, অবয়বের কৃশতা, সঙ্গীত-মাধুর্য এবং গতিস্বচ্ছন্দ – এইকটি অনুষঙ্গ গীতিকবিতার পূর্ণতায় প্রত্যাশা করা হয়।

রাধারমণের জীবনেতিহাস পাঠ করলে আমরা জানতে পারি, তিনি একজন লোককবি ছিলেন। সহজিয়া বৈষ্ণবানুসারী কবির মনে যখন যে অনুভূতি হতো, সহজ-সরল নিজস্ব ভাষায় তা তিনি প্রকাশ করতেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি গান রচনা করতেন এবং নিজেই গাইতেন। রাধাকৃষ্ণকে চরিত্র করে মূলত তিনি বৈষ্ণবীয় প্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন; বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বকে গীতিময় বাণীতে উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

পিরিতি বিষম জ্বালা সয়না আমার গায়
কুল নিল গো শ্যামের বাঁশি প্রাণ নিল কালায়।
ঘরে বাইরে থাকে বন্ধু ঐ পিরিতের দায়
কালাতো সামান্য নয় রাধার মন ভুলায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ললিতায়
কুল নিলগো শ্যামের বাঁশি প্রাণ নিল কালায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৬)

গীতিকবিতায় অবয়বের কৃশতার যে উল্লেখ কবি-তাত্ত্বিকগণ করেছেন, উপর্যুক্ত কবিতায় তা প্রত্যক্ষ। রাধারমণের অধিকাংশ কবিতা অবয়বের বিচারে দীর্ঘকায় – একথা বলার সুযোগ কম। তবে, যে-সব স্থানে অবয়বের কিছুটা স্ফীতি পরিলক্ষিত হয়, সেখানে আবেগের উদ্ভাস এবং গতিময়তার সৌন্দর্য গীতিকবিতার স্বতঃস্ফূর্ততাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে, বলা যায়।

আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটে গীতিকবিতায়। রাধারমণের কবিতায় হৃদয়-উৎসারিত দরদ ছন্দময় ঝরনাধারার মতো প্রবাহিত :

আমারে বন্ধুয়ার মনে নাই রাইগো
আমারে বন্ধুয়ার মনে নাই।

জাতি যুতি ফুল মালতী বিনা সূতে মালা গাথিগো
আইল না শ্যাম কুঞ্জে আমার কার গলে পরাই।
চুয়া-চন্দন ফুলের অঞ্জন কটরায় ভরি রাখলো গো
দেখলে চন্দন উঠলে কান্দন আমি কার অঙ্গে ছিটাই।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুনগো ধনী রাই
পাইলে শ্যামরে ধরমু গলে ছাড়াছাড়ি নাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৩)

কথা ও সুরের সমন্বয়ে নির্মিত হয় গীতিকবিতা। 'একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশে' গীতির ইন্দ্রজাল সমন্বিত হয়ে যে সুরকাব্য তৈরি হয়, রাধারমণের উপর্যুক্ত পদ বা অন্যান্য পদে তা-ই সুপরিস্ফুট। সংগীতের মাধুর্য নিয়ে বিকশিত গীতিকবিতায় গতির স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশিত হয়েছে লোকছন্দ এবং অন্যান্য ছন্দের নিপুণ প্রয়োগে।

রাধারমণের গীতিকবিতা বাংলা মধ্যযুগের গীতিকবিতার পদাঙ্ক অনুসরণেই রচিত। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম প্রমুখের কবিতার বিষয় মূলত বৈষ্ণবীয় প্রেম। প্রেমাস্পদের প্রতি গভীর অনুরাগহেতু মিলনের প্রবলাকাঙ্ক্ষা, মিলনের অনির্বচনীয় আনন্দ কিংবা বিরহের মর্মযাতনা গভীর আবেগে উৎসারিত হয়েছে এসব পদাবলিতে। তবে মিলনাকাঙ্ক্ষা এবং তৎজনিত ব্যর্থতায় বিরহের অনলে বিদগ্ধ হওয়ার শিল্পভাষ্যের অন্তরালে রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথাই গীত হয়েছে এসব কবিতায়। পদাবলি 'একাধারে ধর্মশাস্ত্র, ধর্মদর্শন, সাধনসংগীত, ভজন, প্রেমগান ও গীতিকবিতা' (মুহম্মদ আবদুল হই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ভূমিকা- ঞ)। পদাবলির ন্যায় রাধারমণের কবিতা বা গানও মূলত সাধনসংগীত। রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা, শ্রীচৈতন্যলীলা তাঁর কবিতার প্রধান সাধনবস্তু। *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতায়* গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে এভাবে :

> আধুনিক সংজ্ঞায় গীতিকবিতা কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি। এতে কবির নিজের ভাবকল্পনা, অনুভূতি ও উপলব্ধির – ব্যবহারিক জীবন, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রবোধ নিরপেক্ষ – নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিঘ্ন ও যথেচ্ছপ্রকাশ ঘটে। গীতিকবিতা তাই আত্মকেন্দ্রিক ও অনন্যপক্ষ। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ভূমিকা- ঞ)

বিপরীতক্রমে পদাবলির বিষয়বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ। প্রেম পদাবলির প্রধান বিষয়। কিন্তু এই প্রেম কবির কামনা-বাসনাজাত নয় – রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার দর্শকজনোচিত বিবৃতিমাত্র। ভক্তি-ভজনের অন্তরালে চাপা পড়ে থাকে শতধা বিভক্ত ব্যক্তিমানস। কেবল একটি অনুষঙ্গ – প্রেম হয়ে ওঠে সাধন-ভজনের কেন্দ্রবিন্দু; যা জীবনের কেবল একটি বিশিষ্ট বিষয় বা অংশকে প্রকাশ করে, সমগ্রকে নয়। ফলে বৈষ্ণব পদাবলি সীমিত অর্থে গীতিকবিতার আখ্যাপ্রাপ্ত হয় (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ভূমিকা - ঞ)।

রাধারমণের পদ উপর্যুক্ত লক্ষণ এবং গুণাগুণকে ধারণ করে শিল্পরূপ লাভ করেছে। ফলে, নিশ্চিতভাবেই এই লোককবির কবিতা গীতিকবিতা হয়ে ওঠে। ভক্তি বা আত্মনিবেদনের আকুতি, কিংবা সমপর্ণের একনিষ্ঠতাকে ধারণ করা রাধারমণের গান ভক্তিমূলক গীতিকবিতার শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করা যায়। উল্লেখ্য, ভক্তিমূলক গীতিকবিতা ধর্ম বা ভক্তিভাবকে অবলম্বন করে পরিস্ফুট।

ধর্ম-ভক্তিতে সমর্পিত লোককবি রাধারমণের কবিতাও ভক্তিমূলক গীতিকবিতার সৌন্দর্য এবং সমগ্রতাকে ধারণ করে অনন্য রূপ লাভ করেছে।

৪.২ কবিতার চরণগঠন

কবিতার আঙ্গিক-গঠনে চরণের উপস্থিতি অনিবার্য। চরণ বা চরণগুচ্ছের সমন্বয়েই তৈরি হয় সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসা 'কবিতা' নামের অনন্য শিল্প-মাধ্যম। ছন্দসৃষ্টির অভিপ্রায়ে ধ্বনিপ্রবাহের যে পূর্ণ-পরিমিত বিন্যাস তা-ই 'চরণ' নামে অভিহিত। চরণমাত্রেরই এক বা একাধিক পর্ব থাকে – উল্লেখ করে জীবেন্দ্র সিংহ রায় চরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'পূর্ণ যতির দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্বনিপ্রবাহকে চরণ (Metrical line) বলে' (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ২৯)। যেমন :

হে ভুবন,
আমি যতক্ষণ

এখানে পঙ্‌ক্তি দুটি, কিন্তু চরণ একটি – 'হে ভুবন, আমি যতক্ষণ' (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৩০)। আবার,

কেন এত ফুল তুলিলি, সজনী
ভরিয়া ডালা।

এখানেও পঙ্‌ক্তি দুটি কিন্তু চরণ একটি। ছয় মাত্রার দুটি পূর্ণ পর্ব এবং পাঁচ মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব নিয়ে চরণটি গঠিত হয়েছে (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২০০১ : ১৯)।

চরণের সংজ্ঞার্থ নিয়ে ভিন্নমত[১] থাকলেও – 'ছন্দের পুরা মাপ যতখানি পাওয়া যায় ততখানিই চরণ'

---

১. প্রখ্যাত ছন্দবিদ প্রবোধচন্দ্র সেন 'পূর্ণযতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগকে' পঙ্‌ক্তি নামে অভিহিত করেছেন। তিনি পঙ্‌ক্তি এবং মুদ্রিত বা লিখিত ছত্র ভিন্ন বলে উল্লেখ করেন (প্রবোধচন্দ্র ১৯৯৭ : ১০-১১)। যদিও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পঙ্‌ক্তি এবং চরণকে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন – 'কবিতার এক একটা লাইন বা ছত্রকে সাধারণত পঙ্‌ক্তি বা চরণ নামে অভিহিত করা যায়' (মনিরুজ্জামান ২০০১ : ১৮)। জীবেন্দ্র সিংহ রায় পঙ্‌ক্তি (written line) এবং চরণকে (metrical line) সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর অভিমত : পঙ্‌ক্তি লিপি নির্ভর, কিন্তু চরণ ধ্বনি নির্ভর (জীবেন্দ্র ১৯৯৩ : ৩০)। (মোহিতলাল মজুমদার ১৩৫২: ৭) – এই প্রত্যয়ে আস্থা রেখেই আমরা রাধারমণের গীতিকবিতার চরণ বিচার করব।

দ্বিপর্বিক চরণ : যে চরণে দুটি মাত্র পর্ব বা পদ থাকে, তাকে দ্বিপদী বা দ্বিপর্বিক চরণ বলা যেতে পারে (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৩০)। রাধারমণের পদে দ্বিপর্বিক চরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. কিরূপ হেরিনু পরান সই ৬+৫
সাধ করে তারে হৃদয়ে থুই। ৬+৫
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮২)

খ. আনন্দ মগন গৌরহরি ৬+৪
প্রেমে ভাসাইল নদীয়াপুরি। ৬+৫
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৯০)

মন্তব্য : উপরের প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি (written line) এক-একটি চরণ। চরণগুলো দুটি পর্বে বিভক্ত। শেষের পর্বটি হ্রস্বতর।

গ. কইতে ফাটে হিয়া ৪+২
দুঃখে দুঃখে বিরহিণীর জনম যায় গইয়া ॥ ৪+৪+৪+২
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬২)

মন্তব্য : এখানে প্রথম চরণে দুটি পর্ব। যদিও দ্বিতীয় চরণে পর্বসংখ্যা চার। দুটি চরণেই একটি করে অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

ঘ. ও শ্যামে বিচ্ছেদ লাগাইল (৩)+৪+২
এগো একা কুঞ্জে রাধা থইয়া মধুপুরে গেল। (২)+৪+৪+৪+২
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৫৯)

মন্তব্য : উদাহরণটিতে প্রথম চরণে দুটি পর্ব এবং দ্বিতীয় চরণে চারটি পর্ব। দুটি চরণেই অতিপর্ব এবং অপূর্ণ পর্ব লক্ষণীয়।

ঙ. চল চল নিকুঞ্জেতে করি গো গমন ৮+৬
লহ লহ বনফুল সুগন্ধি-চন্দন। ৮+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১০)

মন্তব্য : এখানে দুটি চরণে দুটি করে পর্ব রয়েছে। প্রথম পর্ব আট মাত্রার এবং দ্বিতীয় পর্ব ছয় মাত্রার।

চ. নয়নে নয়নে দেখা হইল যেদিনে ৮+৬
সে অবধি প্রেমাঙ্কুর শ্রীরাধারমণে ॥ ৮+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৫)

মন্তব্য : এখানেও দুটি চরণ এবং প্রতি চরণে দুটি পর্ব রয়েছে। প্রথম পর্বে মাত্রাসংখ্যা আট এবং দ্বিতীয় পর্বে মাত্রাসংখ্যা ছয়।

ছ. রাইরূপে শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ৪+৪
কি হেরিলাম গৌর বাঁকা। ৪+৪
এক দিবসে জলের ঘাটে কুখনে গো হইল দেখা ৪+৪+৪+৪
সেই ঘাটে আর কেউ ছিল না সে একা আর আমি একা। ৪+৪+৪+৪
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৩)

মন্তব্য : উপর্যুক্ত উদাহরণটিতে চারটি চরণ। প্রথম দুটি চরণ দুটি পর্বে বিভক্ত এবং পরের দুটি চরণ চার পর্বে বিভক্ত। চরণগুলোর প্রতিটি পর্ব চার মাত্রার।

ত্রিপর্বিক চরণ : ত্রিপর্বিক চরণে তিনটি পর্ব থাকে (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৩০)। রাধারমণের গীতিকবিতায় ত্রিপর্বিক চরণের উপস্থিতি :

ক. পহিলহি রাগ নয়নের কোণে
কালো সে নয়ান তারা। ৬+৬+৮
নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে
হয়েছি পিরিতে মরা ॥ ৬+৬+৮
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৪)

খ. সুখের লাগিয়া পিরিতি করিয়া
অন্তরে বাহিরে জ্বালা। ৬+৬+৮
এ ব্রজ নগরে কে না কিনা করে
রাধার কলঙ্ক কালা ॥ ৬+৬+৮
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৭৪)

মন্তব্য : উদাহরণ 'ক' এবং 'খ'-এর প্রতিটিতে দুটি করে চরণ রয়েছে এবং প্রতিটি চরণে তিনটি করে পর্ব বিভাগ রয়েছে। প্রথম দুটি পর্ব ছয় মাত্রার এবং শেষ পর্বটি আটমাত্রার।

গ. মার কোলতল অতি সুশীতল
জননী উদরে। ৬+৬+৬
রাধারমণ বলে বিপদ কালে
ডাকি তোমারে ॥ ৭+৫+৫
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭০)

ঘ. আশ্বিনে অম্বিকা দিলেন সুদেখা
জীবের উদ্ধারে। ৬+৬+৬
হেরি মার শোভা অতি মনোলোভা
আনন্দ সাগরে ॥ ৬+৬+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৯)

মন্তব্য : উদাহরণ 'গ' এবং 'ঘ'-এর প্রতিটিতে দুটি করে চরণ রয়েছে; এবং প্রতিটি চরণে তিনটি করে পর্ব রয়েছে। প্রতিটি পর্ব ছয় মাত্রা করে হলেও উদাহরণ 'গ'-এর দ্বিতীয় চরণে মাত্রা সংখ্যা কম-বেশি আছে। গেয় কবিতার পর্বের মাত্রাসংখ্যা কমবেশি হতে পারে (জীবেন্দ্র সিংহ রায় **১৯৯৩ : ৮৭**)।

ঙ. তস্যপুত্র মমপৌত্র নিকুঞ্জবিহারী দত্ত
বিন্দু আদি সপ্ত ভগ্নী তার। ৮+৮+১০
যেন বৃন্দাবন শূন্য মথুরা হইল ধন্য
কৃষ্ণলীলা বুঝা অতি ভার ॥ ৮+৮+১০
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৯৮)

চ. তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি মা জগৎ আর্য
দেবদেব হরের ঘরণী। ৮+৮+১০
তুমি মা ব্রহ্মসাবিত্রী তুমি মা বেদগায়ত্রী
স্বাহা সদা প্রণবরূপিনী ॥ ৮+৮+১০
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭১)

ছ. মজিয়া পিরিতি রসে নবকৈশোর বয়সে

রাধাপ্রেমে দাসখত দিল। ৮+৮+১০
প্রেমরস আস্বাদনে পিপাসা বাড়িয়া মনে
মনো বাঞ্ছা পূরণ না হইল ॥ ৮+৮+১০
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৮)

মন্তব্য : উপরিউক্ত উদাহরণ 'ঙ', 'চ' এবং 'ছ'-এর প্রতিটিতে দুটি করে চরণ রয়েছে। প্রত্যেকটি চরণ তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম দুটি পর্ব আটমাত্রার এবং শেষ পর্বটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর – দশ মাত্রার।

চতুষ্পর্বিক চরণ : চার পর্ব বিশিষ্ট চরণকে চতুষ্পর্বিক চরণ বলা যেতে পারে (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৩০)। রাধারমণের পদাবলিতে চতুষ্পর্বিক চরণের দৃষ্টান্ত :

ক. চল কুঞ্জে যাই গো ধ্বনি চল কুঞ্জে যাই ৪+৪+৪+১
কুঞ্জে গেলে প্রাণনাথের দেখা কি বা পাই। ৪+৪+৪+১
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৫)

খ. কী করিব কোথায় যাব বিরহে প্রাণ সহে না ৪+৪+৪+৩
আশা দিয়ে গেল শ্যাম ফিরিয়া আইল না। ৪+৪+৪+৩
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৩৮)

মন্তব্য : উপর্যুক্ত উদাহরণের চারটি চরণেই চারটি করে পর্ব বিদ্যমান। প্রতিটি চরণে অপূর্ণ পর্বও রয়েছে।

গ. লং এলাচি জায়ফল জাতি বাটাতে সাজাইয়া ৪+৪+৪+২
আমার বন্ধু আইলে দিও খিলি মুখেতে তুলিয়া। (২)৪+৪+৪+২
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৭)

ঘ. ওরে একলা কুঞ্জে শুইয়া থাকি পাই না রাধার মনোচোর (২)+৪+৪+৪+৩
সই গো রজনী হইল ভোর ॥ (২)+৪+৩
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৫৮)

মন্তব্য : এখানে চরণগুলোতে অতিপর্ব এবং অপূর্ণ পর্বের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

ঙ. পুণ্য ছাড়া পাপের ভরা

তাল্লাসীতে পড়বে ধরা
মিলবে অনেক মাল বিঝাড়া
লাগবে তখন হুলস্থুল। ৮+৮+৮+১০
তুমি হর্তা তুমি কর্তা
শেষ তুমি আদি মূল
তুমি না তরাইলে মোরে
কেও দিবে না চরণ ধূল। ৮+৮+৮+১০
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৯)

মন্তব্য : উদাহরণটিতে দুটি চরণ। প্রতিটি চরণ চার পর্বে বিভক্ত।

সমপর্বিক চরণ : সমপর্বিক চরণে প্রত্যেকটি পর্ব সমান থাকে (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৩১)। রাধারমণের পদে সমপর্ববিশিষ্ট কয়েকটি চরণ :

ক. ডাকার মতো ডাকরে মন দীন দয়াল বন্ধু বলে ৪+৪+৪+৪
ডাকার মতো ডাকতে পারলে মুক্তি পাবে অবহেলে। ৪+৪+৪+৪
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮৯)

খ. ছয় চোরাতে চুরি করে সন্ধান করি তারে ধরো ৪+৪+৪+৪
অনায়াসে পাবে হরি চোর যদি ধরিতায় পারো। ৪+৪+৪+৪
শয়নে স্বপনে মনো হরিনাম জপনা করো ৪+৪+৪+৪
শ্রীগুরুর হইলে কৃপা পাপেরে খণ্ডাইতে পারো। ৪+৪+৪+৪
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৯৪)

গ. দৃঢ় ভক্তি ভাবে যেই জন ডুবে
বাঞ্ছা পূর্ণ করে। ৬+৬+৬
দীন দয়াময়ী ত্রিভুবন জয়ী
বিদিত সংসারে ॥ ৬+৬+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৯)

ঘ. ঔ অষ্টমী তিথি অতি পুণ্যবতী
মহাষ্টমী গণি। ৬+৬+৬
যাগ যজ্ঞ ধর্ম জপ তপ কর্ম
করে ঋষি মুনি ॥ ৬+৬+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭১)

মন্তব্য : এখানে উদাহরণ 'ক' এবং 'খ'-এ প্রতিটি চরণ চার পর্বে বিভক্ত এবং প্রতিটি পর্ব চারমাত্রা বিশিষ্ট। উদাহরণ 'গ' এবং 'ঘ'-এর চরণগুলোতে তিনটি করে পর্ব রয়েছে। প্রতিটি পর্ব ছয় মাত্রার। চরণে পর্বগুলোর মাত্রাসংখ্যা সমান হওয়ায় একে সমপর্বিক চরণ বলা যায়।

ঙ. দিবসে আন্দারী হল
মন প্রাণ হইল চঞ্চল
কেমনে ভরিব জল
মনে মনে ভাবি তায়। ৮+৮+৮+৮
(ঐ) বুঝিগো প্রাণ বিশখা
বংশী বটে যায় (তারে) দেখা
কাল ত্রিভঙ্গ বাঁকা
শ্রীরাধারমণ গায় ॥ ৮+৮+৮+৮
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৭)

চ. অগাধ জল ভব নদী
তাহে মন পার হবে যদি
নামের মন্ত্র নিরবধি
জপরে বদন ভরি। ৮+৮+৮+৮
হরি নামের পাতায় মন
দৃষ্টি রাখো অনুক্ষণ
সর্ব সময়ে চালু
রাখরে নামের তরী। ৮+৮+৮+৮
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১০০)

মন্তব্য : উদাহরণ 'ঙ' এবং 'চ'-এ দুটি করে চরণ রয়েছে। প্রতিটি চরণে চারটি করে পর্ব রয়েছে।

রাধারমণের গীতিকবিতা মূলত মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলির আঙ্গিকস্বভাবকে স্বীকার করে ছন্দ-সুষমায় গীতময় হয়ে উঠেছে। আধুনিক গীতিকবিতার রূপবৈচিত্র্য এতে নেই।

৪.৩ ছন্দ

লোককবির গান বা গীতিকবিতা মূলত বিভিন্ন লোকসাহিত্যানুরাগী দ্বারা সংগৃহীত। শত বছরের সময়প্রবাহে যা নানা স্থান এবং পাত্রের রুচি-জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ফলে কবিতার বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য অনেকাংশে রক্ষিত হলেও শরীরী গঠনে কোথাও হয়ত-বা কিছুটা পরিবর্তন দুর্লক্ষ্য নয়। তাই সকল গীতে

ছন্দের[১] বিশুদ্ধ প্রকাশ হয়ত নেই। যদিও আমরা জানি, গান হিসেবেই রচিত এবং গীত হয়েছিল এ-সকল পদ। ফলে ছন্দের তাল এবং লয়ের সৌন্দর্য এতে রক্ষিত ছিল – এভাবনা অযৌক্তিক নয়।

মূলত স্বরবৃত্ত বা লোকছন্দের উপস্থিতি আমরা রাধারমণের কবিতায় লক্ষ করব, কিছু ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তও।

৪.৩.১ স্বরবৃত্ত ছন্দ

স্বরবৃত্ত ছন্দে মূলপর্ব শুধু চার মাত্রার হয়। একে দলবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ কিংবা ছড়ার ছন্দও বলা হয়ে থাকে। বাংলা লোকসাহিত্য প্রাচীনকাল থেকে এই ছন্দে রচিত হয়ে আসছে। ছড়া, ঘুমপাড়ানি গান, ব্রতকথা, গ্রাম্যসংগীত, কবিগান প্রভৃতিতে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রচলন দেখা যায়। এই ছন্দে সকলপ্রকার অক্ষর এক মাত্রা (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৫৭)।

রাধারমণের পদে আমরা স্বরবৃত্ত ছন্দের পদের উপস্থিতি লক্ষ করব :

ক. নিতি নিতি ফুল বাগানে ভ্রমর আসে মধু খায় ৪+৪+৪+৩
আয়গো ললিতা সখী আবার দেখি শ্যামরায়। ৪+৪+৪+৩
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৮৩)

খ. বন্ধুর বাঁশি মন উদাসী করিল আমারে ৪+৪+৪+২
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশি ঘরের দুয়ারে। ৪+৪+৪+২
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১২)

গ. নিশি শেষে কেন এসে দেওরে কালা যন্ত্রণা ৪+৪+৪+৩
তুমি যে শ্যাম চন্দ্রার বন্ধু তা কি আমি জানি না। ৪+৪+৪+৩
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২৬)

---

১. আনন্দপ্রত্যাশী মানুষ প্রাচীনকাল থেকে শিল্পের অনাবিল সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে। শিল্পের নানা মাধ্যমে খুঁজে ফিরেছে জীবনের প্রতিরূপ – ছন্দের জাদুস্পর্শে অপ্রাণে সঞ্চার করেছে প্রাণের গতি। কাব্যের সৌন্দর্যানুসন্ধানে তাই ছন্দ অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ছন্দ-সুষমার বোধ মানুষের স্বভাবগত (আরিস্টটল ২০০৩ : ৪৫)। দূর-অতীত কাল থেকে মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্রমবিবর্তিত হয়ে আধুনিক রূপে বিকাশ লাভ করেছে। সৌন্দর্য বা মাধুর্যসৃষ্টি শিল্পমাত্রেরই লক্ষ্য (প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯৭৭ : ১৭) – ছন্দেরও তাই। কথাকে 'তির্যক ভঙ্গি ও বিশেষ গতি' প্রদান করে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করার প্রক্রিয়ার নাম ছন্দ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১১ : ৫২৯-৪১)। প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এভাবে – 'সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাকবিন্যাসই ছন্দ' (প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯৭৭ : ১৬)। আবদুল কাদিরের সংজ্ঞায়ও একই ব্যঞ্জনা – শব্দের সুমিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাসের ফলে যে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা-ই ছন্দ (আবদুল কাদির ২০০১ : ১৯)। বলা যায় – কাব্যাত্মা ধ্বনির (অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৪১১ : ১৫) পরিমিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে যে শ্রুতি-সৌন্দর্য তৈরি হয়, তাই ছন্দ নামে আখ্যাত।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. পিরিতি বিষম জ্বালা সয় না আমার গায় ৪+৪+৪+১
কুল নিল গো শ্যামের বাঁশি প্রাণ নিল কালায়। ৪+৪+৪+১
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৬)

ঙ. বংশী বাজায় কে রে ধনি বংশী বাজায় কে ৪+৪+৪+১
মাথার বেণী বদল দেব তারে আনিয়া দে। ৪+৪+৪+১
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩০০)

চ. চলছে হরি নামের গাড়ী আয়কে যাবি বৃন্দাবন ৪+৪+৪+৩
দীক্ষা শিক্ষা মহাবলী পথে তিনটা ইস্টিশন। ৪+৪+৪+৩
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৫৮)

ছ. ডাকার মত ডাকরে মন দীন দয়াল বন্ধু বলে ৪+৪+৪+৪
ডাকার মত ডাকতে পারলে মুক্তি পাবে অবহেলে। ৪+৪+৪+৪
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮৯)

জ. পঞ্চ প্রহর রাত্র বন্ধু শীতল বাতাস বয় ৪+৪+৪+১
নিশ্চয় জানিও বন্ধু তুমি আমার নয়। ৪+৪+৪+১
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২০)

ঝ. কুহু কুহু কুহু রবে ডাকে কোকিলায় ৪+৪+৪+১
কি দোষে প্রাণ বন্ধুর দয়া হইল না আমায়। ৪+৪+৪+১
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫১)

ঞ. মন্দিরের সামনে গিয়া হস্তে দিলা তালি ৪+৪+৪+২
আপনি খসিল রাধার কপাটের খিলি। ৪+৪+৪+২
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৪)

স্বরবৃত্ত ছন্দের উপর্যুক্ত উদাহরণগুলোতে চরণগুলো চার পর্বের। প্রতিটি পর্ব চার মাত্রার। এর মধ্যে বেশকটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। অপূর্ণ পর্বগুলো ১,২,৩ – বিভিন্ন মাত্রার। সমপর্বিক এবং সমমাত্রিক প্রতি দুই চরণে মিত্রাক্ষর।

৪.৩.২ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নানারূপ রয়েছে – পয়ার, মহাপয়ার, প্রবহমান পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, দিগক্ষরা, একাবলি, সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৩৮-৪১)।

পয়ার : পয়ারে পরস্পর মিত্রাক্ষর দুটি চরণ এবং প্রতি চরণে দুটি পর্ব থাকে। প্রথম পর্বের মাত্রা সংখ্যা আট এবং দ্বিতীয় পর্বে মাত্রা সংখ্যা ছয়। চরণের শেষে ভাবের আংশিক বা পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পূর্ণযতি পড়ে (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৪১)।

রাধারমণের পদে পয়ার ছন্দের উপস্থিতি দেখা যায় :

ক. সাজ সাজ সব সখি আন আভরণ ৮+৬
সাজলো শ্রীমতি রাধা মোহিত মদন । ৮+৬
ওগো রাধে বিধুমুখী পৈরো গো বসন
শুভস্য শীঘ্রং কহে শ্রীরাধারমণ।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১০)

খ. চল সখি রঙ্গ হেরি মিথিলা ভুবন ৮+৬
আসিয়াছইন রামচন্দ্র কৌশল্যা নন্দন। ৮+৬
কাঞ্চনে জড়িত রথ অধিক সাজন
মনিমুক্তা প্রবালাদি ফানুস লেণ্টন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৮৫)

গ. যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ ৮+৬
মুরলী মধুর স্বরে মোহিল অনঙ্গ। ৮+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৮)

ঘ. নয়নে লাগল রূপ হানল পরানে ৮+৬
পাসরা না যায় রূপ শয়নে স্বপনে। ৮+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৫)

ঙ. জয় প্রভু নিত্যানন্দ বড়ই বদান্য ৮+৬
জয় শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র বৈষ্ণবের গণ্য। ৮+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৩২)

চ. উদয়ে চৈতন্যচান্দ সুরধুনী তীরে ৮+৬
ভাসাইল গৌরদেশ রাধাপ্রেমনীরে। ৮+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৪৪)

ছ. সুধামৃত হরিনাম জগতের সার ৮+৬
কুমতি সঙ্গ দোষে সকলি অসার। ৮+৬
দুর্লভ মানব জন্ম না হইব আর
শ্রীহরি সম্বল ভবসিন্ধু তরিবার।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬৮)

জ. ধররে অবোধ মন উপদেশ ধর ৮+৬
অসৎ সঙ্গ পরিহরি সাধু সঙ্গ কর। ৮+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৯১)

ঝ. শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পতিতপাবন ৮+৬
চৌষট্টি মহন্ত সঙ্গে পারিষদগণ। ৮+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৭)

ঞ. কোন বনে বাজে বাঁশি টের না পাই ৮+৬
রাধা বলে বাজে বাঁশি কি করি উপায় ॥ ৮+৬
কর্ণ পাতি শুন সজনী কি মোহিনী তায়
গৃহকর্মে নাহি মন উন্মাদিনী প্রায় ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৭৬)

উপর্যুক্ত উদাহরণসমূহে মূল পর্ব আট মাত্রার, শেষ পর্বটি ছয় মাত্রার।
চরণ : দুই পর্বের।
স্তবক : সমমাত্রিক-সমপর্বিক প্রতি দুই চরণে মিত্রাক্ষর।

লঘু ত্রিপদী : লঘু ত্রিপদীতে মূলপর্ব ছয় মাত্রার এবং দুটি চরণ পরস্পর মিত্রাক্ষর। প্রতি চরণে তিনটি পর্ব থাকে, এবং কোথাও-বা প্রথম দুই পর্বের মিল বা অনুপ্রাস থাকে (জীবেন্দ্র সিংহ রায় **১৯৯৩ : ৫২**)। রাধারমণের লঘু ত্রিপদীতেও এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিছু দৃষ্টান্ত :

ক. হেরি মার শোভা অতি মনোলোভা
আনন্দ সাগরে । ৬+৬+৬
দীন দুঃখী জনে অতি শ্রদ্ধা মনে
অন্নদান করে ॥ ৬+৬+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৯)

খ. করে মার পূজা রামচন্দ্র রাজা
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ৬+৬+৬
খোল করতাল অমৃত মিশাল
রাধারমণবাণী ॥ ৬+৬+৬
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭৫)

উপর্যুক্ত উদাহরণ দুটিতে পর্ব ছয় মাত্রার। প্রথম দুই পর্বে বা পদে অন্ত্যমিল রয়েছে।
চরণ : তিন পর্বের।
স্তবক : সমমাত্রিক ও সমপর্বিক দুই চরণে মিত্রাক্ষর।

গ. কালার পিরিতে ভাবিতে চিন্তিতে
এ তনু হইল সারা। ৬+৬+৮
না জানিয়ে রীতি করিয়ে পিরিতি
একূল উকূল হারা ॥ ৬+৬+৮
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৪)

ঘ. শুনগো কিশোরী বাজেগো বাঁশরী
নিকুঞ্জ কানন বনে। ৬+৬+৮
শুক পিক সব করে কলরব
মধুর মুরলী গানে ॥ ৬+৬+৮
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৭)

ঙ. শুনগো ললিতা প্রাণনাথ কোথা
সুখের যামিনী যায়। ৬+৬+৮
বিশাখা আনিতে গেল প্রাণনাথে
কেননা আনিল তায় ॥ ৬+৬+৮
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৬৯)

উপরি-উক্ত উদাহরণগুলোতে পর্ব ছয় মাত্রার। শেষের পর্ব আট মাত্রার। প্রথম দুই পর্বে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল রয়েছে।
চরণ : তিন পর্বে বিভক্ত।
স্তবক : সমমাত্রিক, সমপর্বিক দুই চরণে মিত্রাক্ষর।

দীর্ঘ ত্রিপদী : দীর্ঘ ত্রিপদীতে দুটি পরস্পর মিত্রাক্ষর-চরণ থাকে এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্ব বা পদ থাকে। তিনটি পদের প্রথম দুটিতে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল থাকে। এর প্রতি চরণে মাত্রাসংখ্যা ৮+৮+১০ (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৪৯)।

আমরা রাধারমণের পদে দীর্ঘ ত্রিপদীর ব্যবহার লক্ষ করি :

ক. এসো গৌর গুণমণি জগতের চিন্তামণি
পতিত পাবন অবতার। ৮+৮+১০
তুমি হে পরম গুরু মনোবাঞ্ছা কল্পতরু
অনাথের নাথ সারাৎসার ॥ ৮+৮+১০
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১২৫)

খ. অকূলে তরঙ্গ নদী তুমি পার হও যদি
নামগুণে নিয়েছি শরণ। ৮+৮+১০
আমি যদি ডুবি মরে নামেতে কলঙ্ক রবে
অপযশ হবে ত্রিভুবন ॥ ৮+৮+১০
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১২৮)

গ. সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক শ্রীগণপতি
এসো গো মা মৃগেন্দ্রবাহিনী।
তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ ক্ষিতিতেজ মরুৎব্যোম
তুমি গঙ্গে পতিত পাবনী ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭১)

ঘ. কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ গুরুবাক্যে প্রাণে পণ
সদা সাধু সঙ্গ সদাচার।
ঔ কৃষ্ণভক্ত জাত আমি অতি অপদার্থ
শ্রীরাধারমণ দুরাচার ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৯৫)

ঙ. দ্বিতীয় রন্ধ্রের গানে তনুমন সদা টানে
কেবা পারে ধৈর্য ধরিবার।
তৃতীয় রন্ধ্রের গানে ঋষি মুনি ভঙ্গ ধ্যানে
কুল নাহি গৃহে থাকা ভার ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩৭)

চ. জলের ছলনা করি পথে নি বন্ধুরে হেরি
আজ ভাল না পুরিল আশা।
কলসে ভরিয়া জল শির্ঘে সখি গৃহে চল
আশা পথে হইলাম নিরাশা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩৮)

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলোতে পর্ব আট মাত্রার। শেষের পর্ব দশ মাত্রার। প্রথম দুই পর্বে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল বিদ্যমান।
চরণ : তিন পর্বে বিভক্ত।
স্তবক : সমমাত্রিক, সমপর্বিক দুই চরণে মিত্রাক্ষর।

দীর্ঘ চৌপদী : দীর্ঘ চৌপদীতে পরস্পর মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ থাকে এবং প্রতি চরণে চারটি পর্ব বা পদ থাকে। প্রতি পর্বে মাত্রা-সংখ্যা হবে আট। তবে শেষ পর্বে মাত্রা দুই-একটা কম হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্বগুলোর প্রথম তিনটির মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল থাকে (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৫০)।

লোককবি রাধারমণের পদে দীর্ঘ চৌপদীর ব্যবহার লক্ষ করব :

ক. দিবসে আন্দারী হল মনপ্রাণ হইল চঞ্চল
কেমনে ভরিব জল মনে মনে ভাবি তায়। ৮+৮+৮+৮
(ঐ) বুঝি গো প্রাণ বিশখা বংশী তটে যায় (তারে) দেখা
কাল ত্রিভঙ্গ আঁকা শ্রীরাধারমণ গায় ॥ (১)৮+(২)৮+৮+৮
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৭)

এখানে পর্ব আট মাত্রার। প্রথম তিন পর্বে অন্ত্যানুপ্রাস আছে।
চরণ : চার পর্বে বিভক্ত।
স্তবক : সমমাত্রিক ও সমপর্বিক চরণ পরস্পর মিত্রাক্ষর।

খ. মায়ারূপী তিরিপুত্র
সামনে সাক্ষাৎ কাল
ছয়জনায় যুক্তি করি
ডুবাইতে চায় লাভ মূল। ৮+৮+৮+১০
ভাসিছি অকুল সায়রে
উদ্ধার করো মোরে
অধম কাঙ্গাল জানি
এতে যেন না হয় ভুল। ৯+৭+৮+৯
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৮)

এখানে প্রথম চরণে তিনটি পর্ব আট মাত্রার এবং শেষ পর্বটি দশ মাত্রার। দ্বিতীয় চরণে পর্বগুলোতে মাত্রা একটু কম বা বেশি আছে। গেয় কবিতায় পর্বের মাত্রাসংখ্যা কম-বেশি স্বীকৃত (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৮৭)।

চরণ : চার পর্বে বিভক্ত।

স্তবক : সমপর্বিক চরণ পরস্পর মিত্রাক্ষর। মাত্রার অপূর্ণতা যেহেতু সুরের মাধ্যমে পুরণ করা হয়, তাই চরণ দুটি সমমাত্রিকও বলা যায়।

দিগক্ষরা : দিগক্ষরায় প্রতি চরণে দুটি পর্ব থাকে এবং প্রতি পর্বের মাত্রা-সংখ্যা দশ (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৫১)।

রাধারমণের পদাবলিতে দিগক্ষরার ব্যবহার লক্ষণীয় :

ক. মাইয়ার প্রেমে বান্ধা হরি দাসখতে দস্তখত করি। ১০+১০
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৮০)

খ. যখন রন্ধনশালায় বসি তখন কালায় বাজায় বাঁশি। ১০+১০
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৪)

গ. মাইয়ার কাছে জগৎ ঘোরে কেহ তো তারে চিনতে নারে। ১০+১০
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭৯)

একাবলি : একাবলির প্রতিচরণে দুটি পর্ব থাকে এবং মাত্রাসংখ্যা হয় এগার (৬+৫) (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩ : ৫৩)।

রাধারমণের পদে একাবলি :

ক. কিরূপ হেরিনু পরান সই ৬+৫
সাধ করে তারে হৃদয়ে থুই। ৬+৫
রূপের চটকে উন্মাদিনী হই
গৃহেতে পাগলী কেমনে রই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮২)

খ. শুন ওরে মন বলিরে তোরে ৬+৫
হরি হরি বল বদন ভরে। ৬+৫
মনরে আপনা বলিছ যারে
দেখিনি আপনা এ সংসারে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ১৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

গ. শ্যামের প্রেয়সী বিনোদী রাই ৬+৫
হৃদয় বিদারে তোর মুখ চাই। ৬+৫
কাননে কি বনে যেখানে যাই
সাধিয়া আনিব নাগর কানাই।

(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৯)

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলোতে প্রতি চরণে দুটি করে পর্ব রয়েছে। দুই পর্বের মাত্রাসংখ্যা এগারো।

৪.৪ অলংকার

সাধারণ ভাব সৌন্দর্যের শৈল্পিক রঙে ঋদ্ধ হয়ে অসাধারণে উত্তীর্ণ হয়। কাব্যের এই সৌন্দর্যই অলংকার (সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১৯৯৮ : ২৫৩)। সংস্কৃত 'অলম্' শব্দের অর্থ ভূষণ বা আভরণ। যার দ্বারা ভূষিত করা হয়, তা-ই অলংকার। কাব্য অলংকারের গুণে সকলের নিকট উপাদেয় হয়ে ওঠে (সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১৯৯৮ : ২৫২-৫৪)। তবে অলংকার এবং কাব্য বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। অলংকারকে কাব্যদেহে সৌন্দর্যবর্ধনার্থে আরোপিত করা যায় না। কাব্য সালংকৃত হয়েই ভূমিষ্ঠ হয় (বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯ : ৮৫)।

কাব্য বা বাক্য মূলত পদসমষ্টির সমাহার। আমরা যখন কাব্য পাঠকরি বা শ্রবণ করি, তখন দুই ধরনের ক্রিয়া ঘটে – এক, আমরা পদের ধ্বনি বা শব্দদ্বারা (sound) আকৃষ্ট হই; দুই, এর অর্থ আমাদের বোধে আলোড়ন তোলে। যা পদের বর্ণময় 'দেহরূপ' এবং অর্থময় 'চিদরূপ' হিসেবে আখ্যায়িত। শব্দধ্বনিকে শ্রুতিমধুর এবং অর্থকে হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর করতেই অলংকারের প্রয়াস। ফলে অলংকারের দুই ভাগ : শব্দালংকার ও অর্থালংকার।

শব্দালংকারের নিয়ন্তা হলো শব্দ বা ধ্বনি (নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৪২)। মূর্তধ্বনি বা ধ্বনি-সংকেত হলো শব্দ। শব্দের বহির্অঙ্গের যে ধ্বনি তা-ই অলংকারের ভিত্তি। শুদ্ধসত্ত্ব বসু শব্দালংকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : ধ্বনির সাহায্যে শব্দ উচ্চারিত হয় – সে ধ্বনিকে কেন্দ্র করে যে অলংকার নির্মিত হয়, তা-ই শব্দালংকার (শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৯৬২ : ৫)। অর্থালংকারে শব্দের (word) অর্থ মুখ্য বিষয় হলেও শব্দালংকারে অর্থানুসন্ধান একেবারেই গৌণ – শব্দের ধ্বনি-সমন্বয়ে গঠিত রূপটিই প্রধান। ফলে শব্দালংকারে শব্দ বা ধ্বনির পরিবর্তন চলে না – অর্থালংকারে যদিও তা স্বীকৃত।

শব্দালঙ্কার ছয় প্রকার : অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ধ্বন্যুক্তি এবং পুনরুক্তবদাভাস (শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৯৬২ : ৫)।

অনুপ্রাস : বর্ণ (ধ্বনি) বা বর্ণগুচ্ছ (ধ্বনিগুচ্ছ) যুক্ত বা বিযুক্তভাবে বাক্যমধ্যে একাধিকবার ধ্বনিত হয়ে যে শ্রুতিমাধুর্য তৈরি করে, তাই অনুপ্রাস (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৯)। অনুপ্রাসে স্বরধ্বনির তেমন গুরুত্ব নেই, ব্যঞ্জনের ধ্বনিসাম্য নিয়েই অনুপ্রাস।

Dhaka University Institutional Repository

রাধারমণের পদে অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারের শৈল্পিক ব্যবহার আমরা লক্ষ করি :

ক. মিছা কেন ডাকরে কোকিল মিছা কেন **ডাক**
এগো ভাঙ্গিয়াছ রাধার বিছানা তোমরা সুখে **থাক**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৪)

খ. চাইর প্রহর রাত্র বন্ধু সাজাই ফুলের **শয্যা**
বন্ধু আসিবে বলি পাইলাম বড় **লজ্জা**।
পঞ্চপ্রহর রাত্র বন্ধু শীতল বাতাস **বয়**
নিশ্চয় জানিও বন্ধু তুমি আমার **নয়**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২০)

গ. অল্প বয়সে লোকে ঘোষে কলঙ্কিনী **রাই**
তুমি যদি ভিন্ন বাসো আমি কোথায় **যাই**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৭৯)

ঘ. আধো মুখে মোহন বাঁশি আধো মুখে **হাসি**
রমণ বলে হৈতাম আমি শ্রীচরণের **দাসী**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৯)

ঙ. যখন বন্ধে বাজায় বাঁশি তখন আমি **রান্দি**
ভিজা লাকড়ি চুলায় দিয়া ধুমার ছলে **কান্দি**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৫৫)

চ. গাছের উপরে লতারে লতার উপরে **ফুল**
শ্যামের পীরিতে রাধার গেল জাতি**কুল**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৯৭)

ছ. আর তুমি হওরে কল্পতরু আমি হইরে ল**তা**
ওরে দুই চরণ বেড়িয়া রাখমু ছাইড়া যাইবা কো**থা**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৩)

জ. ঐ বাজে প্রাণবন্ধের বাঁশি জয় রাধা **বলে**
কলসী নিয়া আয়গো সখী কে যাবে যমুনার **জলে**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৫০)

ঝ. কোন গুণের গুণী আইল ধরতে গেলে ধরা না **যায়**
ধরতে পারলে সাপটি ধরি ভাসবো প্রেম যমু**নায়**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৫৩)

ঞ. প্রাণ থাকিতে দেখি বন্ধু আসে কিনা **আসে**
আসা পথে চাইয়া থাকি মনের অভি**লাষে** ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৮)

বৃত্ত্যনুপ্রাস : একই ব্যঞ্জনধ্বনির দুই বা তার অধিক বার ঘুরেফিরে আসা বৃত্ত্যনুপ্রাসের মৌলবৈশিষ্ট্য (নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৪৫)। একটি বাংলা ছাড়ায় প্রস্ফুটিত হয়েছে বৃত্ত্যনুপ্রাসের সৌন্দর্য :

কাক কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ।

এখানে 'ক' নয়বার ধ্বনিত হয়েছে।

রাধারমণের পদ যেন উপর্যুক্ত বাংলা ছড়ারই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নতুন উপস্থাপনা :

কাক কালা কোকিল কালা কালা প্রাণের হরি
খঞ্জনের বুক কালা এই সে দুঃখে মরি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৭৮)

এখানে 'ক' ধ্বনি সাতবার ধ্বনিত হয়েছে। রাধারমণের পদে বৃত্ত্যনুপ্রাসের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. মধুর মধুর অতি সুমধুর মোহন মুরলী বাজে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৬)

খ. হরিগুণাগুণ কৃষ্ণগুণাগুণ রাধাগুণাগুণ গাও হে
সদায় আনন্দ রাখিও মনে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫০)

গ. জাতি জুতি ফুল মালতী, আমি বিনা সুতে মালা গাঁথি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৯)

এখানে, প্রথম ('ক') উদাহরণটিতে 'ম', 'ধ', এবং 'র' ধ্বনির বৃত্তি বা ঘুরেফিরে আসা লক্ষণীয়; এবং দ্বিতীয় ('খ') উদাহরণটিতে 'গ' এবং 'ণ'-ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে ধ্বনিসৌন্দর্য। শেষোক্ত দৃষ্টান্তে 'ত' ধ্বনি চারবার আবৃত্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছেকানুপ্রাস : 'ছেক' মানে বিদ্বান বা বিদগ্ধজন। বিদগ্ধজনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে অনুপ্রাস তাই ছেকানুপ্রাস। এতে দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে মাত্র দুই বার ব্যবহৃত হয়ে ধ্বনিসাম্যের মাধ্যমে সৌন্দর্য তৈরি করে (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ২৪, নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৪৮)।

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবি রাধারমণের কবিতায়ও আমরা ছেকানুপ্রাসের সার্থক ব্যবহার লক্ষ করি :

ক. বাঁশি নয় গো কালভুজঙ্গে অঙ্গে দংশিয়াছে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৯১)

খ. হল পূজা সাঙ্গ করল মনভঙ্গ
এল ত্রিশূলপাণি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭২)

গ. সঙ্গে দুটি কন্যা জগৎ ধন্যা
বৈকুণ্ঠ বাসিনী।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭৫)

ঘ. অতি মনোরঙ্গে নারীপুত্র সঙ্গে
মহানন্দ ধরণী।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭৪)

ঙ. হরি জগবন্ধু করুণাসিন্ধু আমায় নি করুণা হবে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৩)

চ. যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ
মুরলী মধুর স্বরে মোহিল অনঙ্গ।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৮)

শ্রুত্যনুপ্রাস : ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত হয়ে ধ্বনি বা বর্ণ যে শ্রুতিসৌন্দর্য তৈরি করে, তাকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলে (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ১৪, নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৪৯)।

রাধারমণের পদে শ্রুত্যনুপ্রাসের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ :

ক. ধূপ দীপ লইয়া মধুর আনন্দে ললিতা বিশাখা সা**জে**
ময়ূরা ময়ূরী নাচে ঘুরি ঘুরি রাই কানু থইয়া মা**ঝে**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৬)

খ. পাখা নাই যে কিসের পা**খি**
ঝুইরতেছে পিঞ্জিরায় থা**কি**
আর কত বুঝাইয়া রা**খি**
পাখি প্রবোধ না মানে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৯৩)

গ. বৃন্দাবনে তিনটি কমল একটি কমল সা**দা**
এককমলে কৃষ্ণচন্দ্র আর কমলে রা**ধা**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬৫)

মধ্যানুপ্রাস : কবিতার চরণের মধ্যে ধ্বনিসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে যে মিল তৈরি করা হয়, তাকে মধ্যানুপ্রাস বলে (নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৫১)।

রাধারমণের পদে মধ্যানুপ্রাসের উপস্থিতির কয়েকটি উদাহরণ :

ক. প্রাণসজ**নী** আইজ কি শু**নি** মধুর ধ্ব**নি** কানন বনে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৯)

খ. কুজ্জারা**নী** কাল নাগি**নী** গোয়ালি**নী** সনে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬১)

এখানে 'নি' ধ্বনির মিল চরণের মাঝখানে ধ্বনি-সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

গ. বন্ধু আমার চিকন কা**লা** নয়নে লাইগাছে ভা**লা**
বিষম কালা ধইলে ছাড়ে না।
বন্ধু বিনে নাইযে গ**তি** কিবা দিবা কিবা রা**তি**
জ্বলছে আগুন আর তো নিভে না।
এমন সুন্দর পা**খি** হৃদয়ে হৃদয়ে রা**খি**
ছুটলে পা**খি** ধরা দেবে না।
হাতে আছে স্বরম**ধু** গৃহে আছে কুলব**ধূ**
কী **মধু** খাওয়াইল জানি না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৪৪)

উপরি-উক্ত চরণগুলোয় মধ্যানুপ্রাসের অনন্য ব্যবহার রাধারমণের শিল্পসামর্থ্যকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলে।

আদ্যানুপ্রাস : চরণের প্রথম পদের সঙ্গে পরবর্তী চরণের প্রথম পদের যে ধ্বনিসাম্য, তা-ই আদ্যানুপ্রাস (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ২১, নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৫০)।

রাধারমণের কবিতায়ও আদ্যানুপ্রাসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় :

শুন শুন বিনোদিনী আমার বচন
ঘন ঘন বাজে বাঁশি গহন কানন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১০)

তবে, রাধারমণের পদে আদ্যানুপ্রাস বেশি নেই।

যমক : স্বরধ্বনিসহ একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি নির্দিষ্টক্রমে সার্থক কিংবা নিরর্থকভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে যমক অলংকার সৃষ্টি হয় (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৩২)। 'যমক' শব্দের অর্থ হচ্ছে যুগ্ম। একই শব্দ বা একই ধরনের উচ্চার্য শব্দ যদি দুই বা তার অধিকবার উচ্চারিত হয়ে আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন যমক অলংকার হয় (শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৯৬২ : ১৮)।

অলংকারশাস্ত্রে চার প্রকার যমকের উল্লেখ পাওয়া যায় : আদ্য, মধ্য, অন্ত্য ও সর্বযমক।

আদ্যযমক : আদ্যযমকে একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনিসহ পদের আদিতে একাধিকবার উচ্চারিত হয়।

রাধারমণের কবিতায়ও একই রীতির শিল্পসমৃদ্ধ উচ্চারণ :

ক. **দয়াল**রে **দয়াল** বলে সয়াল সংসার
দয়ালের না থাকলে দয়া দয়াল নাম অসার।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪২)

খ. **ঘরে**র মাঝে **ঘর** বেঁধেছে আমার মনোহরা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭৩)

উপর্যুক্ত উদাহরণদুটিতে 'দয়াল' এবং 'ঘর' ধ্বনির সার্থক ব্যবহার যমকের সৌন্দর্য তৈরি করেছে।

মধ্যযমক : পদের মাঝখানে একই ধ্বনির একাধিকবার উচ্চারণে মধ্যযমক হয়।

রাধারমণের পদে মধ্যযমকের সার্থক উপস্থিতি :

ক. শঙ্খ ঝাঞ্জরী পাখোয়াজ খঞ্জরী কেহ কেহ বীণ বাজে
তা ধৃক তা ধৃক তা – তা তা থৈয়া মধুর মৃদঙ্গ বাজে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৬)

খ. কহে প্রেমা**নন্দে** মনের **আনন্দে** আর কি এমন হবে
শ্রীরাধারমণ যুগলচরণ কবে সে দেখিতে পাবে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৬)

গ. যার **কূল** নিলে **কূল** পাইতে পারি আমি তার **কূলে**
গেলাম কৈ ?
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬৬)

অন্ত্যযমক : অন্ত্যযমকে পদ বা চরণের শেষ ধ্বনি পরবর্তী চরণের শেষে পুনরায় ধ্বনিত হয়।

এই সৌন্দর্যের শিল্পিত প্রকাশ আমরা লক্ষ করব রাধারমণের পদে :

ক. আর কেউরি ঋণী নয় ঋণ কেবল শ্রীরা**ধার**
করঙ্গ কপিন পৈরে শুধব রাধার ঋণের **ধার**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫০)

খ. সুবলরে রাধা তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা গলার **হার**
রাধার জন্য আমি থাকি দিবানিশি অনা**হার**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৬)

গ. সজনী ও সজনী আইল না শ্যাম গুণ**মণি**
বুঝি পেয়ে তারে রেখেছে কোন র**মণী**।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫৯)

উপরি-উক্ত উদাহরণগুলোতে ‘ধার’, ‘হার’ এবং ‘মনি’ ধ্বনির সার্থক ব্যবহার আমাদের শ্রবণে ধ্বনিসৌন্দর্যের আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে।

বক্রোক্তি : কোন কথার যে অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত, অথচ শ্রোতা সে অর্থটি না ধরে অন্য অর্থ গ্রহণ করে, তবে বক্রোক্তি অলংকার হয় (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৩৯)। বক্রোক্তি দুই ধরনের – শ্লেষবক্রোক্তি ও কাকুবক্রোক্তি।

'কাকু' অর্থ স্বরভঙ্গি। বক্তা যখন কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গির মাধ্যমে নিষেধাত্মক বক্তব্যকে ইতিবাচক, আবার ইতিবাচক বক্তব্যকে নেতিবাচক অর্থে প্রকাশ করেন, তখন কণ্ঠস্বরের এই বিশেষ ভঙ্গির ওপর সৃষ্ট বক্রোক্তিকে কাকুবক্রোক্তি বলে (নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৫৭)।

রাধারমণের কবিতায় আমরা কাকুবক্রোক্তির বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ করব :

ক. আমার মত রূপেগুণে আর কি মানুষ নাই
কেন যে ঘমট দেখাও তুকাইয়া কারণ না পাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২৮)

খ. আমারে ভুলাইলে বন্ধু নয়নের বানে
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু প্রাণ বাঁচে কেমনে?
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৩৬)

গ. আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একারে সুবলসখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী একবার এনে দেখা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৪৫)

ঘ. আর জ্বালা দিও না বাঁশি আর জ্বালা দিও না আমারে
জনম দুক্ষিনী রাধা জানি কি জান না রে?
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৪৬)

ঙ. তে কেনে যাও না চলি লাংগের লগ ধরিয়া
ডাটা অইয়া উবাই কি লাভ হাইর কাম পালাইয়া ?
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬১)

চ. গৌর পাব প্রাণ জুড়াব কুল মানের ভয় আর কি?
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাদের মন্দয় হবে কি?
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গৌর পাইলে হই সুখী
এবার না পাইলে গৌরচান্দ আর পাইবার ভরসা কি?
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৩)

উপরি-উক্ত উদাহরণে আমরা দেখি, ('ক') রাধার মতো রূপেগুণে আর কোনো মানুষ আছে কি-না – এ প্রশ্নের মাধ্যমে মূলত 'আছে' অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা দেখব, ('খ') প্রাণসখা কৃষ্ণ ছাড়া রাধিকার প্রাণ বাঁচে কি-না – এই প্রশ্নে না-বাচকতাকে যেমন প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি ('গ') কৃষ্ণের রাধা বিনা থাকতে পারার প্রশ্নেও নেতিবাচক অর্থ ব্যক্ত হয়েছে। রাধা জনম দুঃখিনী কিনা – এই প্রশ্নে হ্যাঁ-বাচকতা প্রকাশিত ('ঘ'); তেমনি পরবর্তী উদাহরণে ('ঙ') স্বামীগৃহের কাজকর্ম রেখে বসে থেকে যে লাভ নেই – এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে। শেষোক্ত ('চ') উদাহরণে 'কুল মানের ভয় আর কি?', 'তাদের মন্দয় হবে কি?', কিংবা, 'পাইবার ভরসা কি?' – এসব প্রশ্নের ভেতর দিয়ে না-বাচকতা প্রকাশ পেয়ে শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

ফলে, বক্রোক্তির শিল্পিত ব্যবহারে কবিতার চরণগুলো নান্দনিক হয়ে উঠেছে।

ধ্বন্যুক্তি : শব্দের উচ্চারণে ধ্বনিরূপের মধ্য দিয়ে যদি অর্থের আভাস ঘটে, এবং একই সাথে পাঠক বা শ্রোতার মনে একটা সুরের ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয় – তবে যে সৌন্দর্য তৈরি হয়, তার নাম ধ্বন্যুক্তি অলংকার (শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৯৬২ : ৩১)। ধ্বন্যুক্তি অলংকারে বাক্যের ধ্বনিরূপ দিয়ে অর্থ বোঝানোর প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত।

রাধারমণের কবিতায় আমরা ধ্বনি দিয়ে অর্থ বোঝানোর এই শিল্পপ্রচেষ্টার সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করি :

ক. সিন্দুরের বিন্দু দেখি লাগিতে কপালে
মুখকিনি হাসু হাসু চউখ ঝিম্‌ঝিম্‌ করে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৪)

খ. যং রং লং বং যং রং লং বং সদাই ঝংকারে
একতারে বাজাইলে বাজে বাহাত্তর হাজারে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭৪)

গ. রাধা রাধা রাধা বৈলে বাঁশি দিল টান
অন্তর জ্বলে মিঠা লাগে রিদয় ভেদি বাণ।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৭)

ঘ. শঙ্খ ঝাঞ্জরী পাখোয়াজ খঞ্জরী কেহ কেহ বীণ বাজে
তা ধৃক তা ধৃক তা – তা তা থৈয়া মধুর মৃদঙ্গ বাজে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৬)

ঙ. ঝুনুর ঝুনুর বাজে খাড়ি মধুর ধ্বনি শুনি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭৪)

চ. বাহির হইয়া শুন সজনী ঐ করে কোকিলায় ধ্বনি
ডালে বসে কোকিল পাখি কুহু কুহু রব শুনি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২১)

ছ. কুহু কুহু কুহু রবে ডাকে কোকিলায়
কি দোষে প্রাণ বন্ধুর দয়া হইল না আমায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫১)

একতারা, বাঁশি, মৃদঙ্গ কিংবা কোকিলের ধ্বনি প্রকাশে লোককবির প্রচেষ্টা শিল্পমণ্ডিত। কবিতার চরণগুলো ধ্বন্যুক্তি অলংকারের সার্থক ব্যবহারে সুরধ্বনিময় হয়ে উঠেছে।

অর্থালংকার : অলংকারের সৌন্দর্যের অন্যতম প্রধান অংশ অর্থালংকার। অর্থালংকার তৈরিতে শব্দের অর্থের গুরুত্ব প্রথম এবং প্রধান। যে অলংকার বাক্যস্থিত শব্দের অর্থকে আশ্রয় করে তৈরি হয়, তাই অর্থালংকার। শব্দালংকারে শব্দের পরিবর্তনে অলংকার অস্তিত্ব হারায়; কিন্তু অর্থালংকারে শব্দের পরিবর্তনে অর্থ ঠিক থাকলে অলংকার অক্ষুণ্ন থাকে – শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের মৌল-পার্থক্য এখানেই (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৪২, নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৬০)।

অর্থালংকারের নানা প্রকার – (ক) সাদৃশ্যমূলক অলংকার, (খ) বিরোধমূলক অলংকার, (গ) শৃঙ্খলামূলক অলংকার, (ঘ) ন্যায়মূলক অলংকার, (ঙ) গূঢ়ার্থমূলক অলংকার। এই পাঁচ প্রধান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনেক অলংকার : উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, বিরোধাভাস, কারণমালা, অনুমান, আক্ষেপ ইত্যাদি।

উপমা : বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারকে 'উপমা' বলে। দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের ফলে যে চমৎকৃতির সৃষ্টি হয়, তা-ই উপমা (নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৬৪)। উপমা শব্দের সাধারণ অর্থ তুলনা। এই তুলনা ব্যতীত কাব্যসাহিত্য দুরূহ-ভাবনা মাত্র। উপমা কবিতার প্রাণ। উপমার মধ্যে উপমেয় অনেকটা কঙ্কালের মতো, তাতে রক্তমাংসের সঞ্চার করে উপমান। কাব্যশরীর ও কবিভাষাকে সুষম ও বর্ণাঢ্য করা, এবং মূলভাবনাকে প্রগাঢ় করে তুলতে ইঙ্গিতময়তা প্রদানই উপমার মুখ্য উদ্দেশ্য (আহমদ কবির ১৯৮৬ : ১২)।

উপমার নানাপ্রকার : (ক) পূর্ণোপমা, (খ) লুপ্তোপমা, (গ) মালোপমা, (ঘ) বস্তুপ্রতিবস্তু-ভাবের উপমা, (ঙ) বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভাবের উপমা, (চ) স্মরণোপমা ইত্যাদি (নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৬৫)।

আমরা রাধারমণের পদে উপমার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার প্রত্যক্ষ করব। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

ক. জানিয়ে সুহৃদ বাড়াইলে রিদ
না জানি পুরুষ ধারা।
পাষাণ সমান পুরুষ কঠিন
অবলা পরিল মারা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৫)

খ. শ্যাম হেরিলাম গো কদম্বের তলে
তুষের অনলের মত অঙ্গ মোর জ্বলে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৪০)

গ. সিন্দুরের ইন্দুবিন্দু ললাটে চন্দন
কে খাইয়াছে কমলমধু শুকাইয়াছে চাঁদবদন।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৮৭)

ঘ. শ্যাম আমার চিকণ কাল অমাবস্যার নিশি
রাই আমার বিদুমুখী পূর্ণিমার শশী।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬৫)

ঙ. রূপের কথা বলব কত বিজুলীর চটকের মত
দাঁড়াইয়াছে কদম্ব তলায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৩)

চ. রাইয়ার মাথায় চিকণ চুল দেখতে লাগে নানান ফুল
সে ফুলের গন্ধে যেমন মন হইল ব্যাকুল।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ২৫৫)

ছ. জনম দুক্ষিণী হইয়া মরিয়া ঝুরিয়া
সব দুক্ষ পাশরিতাম চান্দমুখ দেখিয়া রে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৭৮)

জ. জল আনতে যায় বিধুমুখী
আশার আশে আর কতদিন পন্থপানে চেয়ে থাকি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৮১)

ঝ. চাতক রইলো মেঘের আশে তেমনি মতো রইলাম গো আমি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৮০)

ঞ. তুষের অনলের মত জল দিলে দ্বিগুণ জ্বলে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৯)

যে উপমায় উপমেয়, উপমান, তুলনাবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম – এই চারটি বৈশিষ্ট্যেরই স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, তাকে পূর্ণোপমা বলে (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৪৭, নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৬৫)। উপরি-উক্ত উদাহরণ 'ক'-এ উপমেয় – পুরুষ, উপমান – পাষাণ, তুলনাবাচক শব্দ – সমান, সাধারণ ধর্ম – কঠিন। সুতরাং, চারটি অবয়বেরই স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় উপমাটি একটি পূর্ণোপমার সৌন্দর্যে প্রকাশিত। উদাহরণ 'খ'-ও একটি পূর্ণোপমার উদাহরণ। এখানে উপমেয় – অঙ্গ, উপমান – তুষের অনল, তুলনাবাচক শব্দ – মত এবং সাধারণ ধর্ম – জ্বলে।

উদাহরণ 'গ' এবং 'ঘ' লুপ্তোপমার দৃষ্টান্ত। যে উপমায় উপমেয় ব্যতীত অন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য – উপমান, তুলনাবাচক শব্দ, সাধারণ ধর্ম – এর একটি, দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে, তাকে লুপ্তোপমা বলে (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৫৩, নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৬৭)। 'চাঁদবদন'-এ তুলনাবাচক শব্দ 'মত' অনুপস্থিত। 'বিদুমুখী' উপমায়ও তুলনাবাচক শব্দ 'মত'-এর উল্লেখ নেই। উদাহরণ 'ঙ'-এ সাধারণ ধর্ম অনুপস্থিত। এখানে উপমেয় – রূপ, উপমান – বিজুলীর চটক, তুলনাবাচক শব্দ – মত। সুন্দর, উজ্জ্বল, ঝলমলে ইত্যাদি সাধারণ ধর্মপ্রকাশক শব্দ অবিদ্যমান।

উদাহরণ 'চ' স্মরণোপমার একটি অনবদ্য প্রকাশ। যে উপমায় কোনো বস্তু বা বিষয়ের অনুভব থেকে অনুপস্থিত অপর কোনো বস্তু বা বিষয়ের স্মৃতি মনে জেগে ওঠে, তাকে স্মরণোপমা বলে (নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৭৩)। রাধারমণের চরণটিতে আমরা লক্ষ করব রাধার চিকন চুল চোখে পড়তেই নানাবর্ণের ফুলের কথা কৃষ্ণের স্মৃতিতে আসে এবং সে ফুলের গন্ধে মনের ব্যাকুলতা উপমার সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত।

উদাহরণ 'ছ', 'জ' লুপ্তোপমার দৃষ্টান্ত। 'চান্দমুখ' এবং 'বিধুমুখী' উপমায় তুলনাবাচক শব্দ অনুপস্থিত। উদারহণ 'ঝ' একটি পূর্ণোপমার দৃষ্টান্ত; এবং 'ঞ'-এ উপমেয় 'দুঃখ' অনুপস্থিত। ফলে এটি লুপ্তোপমার দৃষ্টান্ত।

রাধা এবং কৃষ্ণকে ঘিরেই মূলত তৈরি হয়েছে রাধারমণের উপমার মালা। এর শিল্পসৌন্দর্যের মাধুর্য চোখে পড়ার মতো।

উৎপ্রেক্ষা : 'উৎপ্রেক্ষা' শব্দের অর্থ অনুমান বা সংশয়। উপমেয়কে গভীর সাদৃশ্যের জন্য উপমান বলে সংশয় হলে যে কাব্যিক সৌন্দর্য তৈরি হয়, তাকে উৎপ্রেক্ষা অলংকার বলে। এই অলংকারে সংশয়ের ভাব থাকা আবশ্যক; এবং এই সংশয়ে উপমানই প্রবল হয়ে ওঠে (শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৯৬২: ৫২)।

উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার : (ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং (খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনাবাচক শব্দ – যেন, মনে হয়, বুঝি, মনে গণি ইত্যাদি উল্লেখ থাকে, তাকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলে (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৮২, নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৭৪)।

রাধারমণের কবিতার কিছু বাচ্যোৎপ্রেক্ষাসমৃদ্ধ পদ :

ক. মন হইয়াছে উন্মাদিনী যেন মণিহারা ফণী।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১০)

খ. সজনী হাতে বাঁশি মাথে চূড়া ময়ূরপুচ্ছ হিলে
যেন মালতীর মালা শ্যাম অঙ্গে দোলে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৭)

গ. তরুমূলে শ্যামরূপ হেরিলাম তরুমূলে
নবীন মেঘেতে যেন সৌদামিনী জ্বলে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭২)

ঘ. আমার বন্ধুর মুখের হাসি যেমন গোলাপ ফুল।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৩৭)

উপরের উদাহরণে ('ক') রাধার মনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণরূপ মণি বা অমূল্যধনকে হারিয়ে রাধার যে মানসিক সংকট, তা সাপের মণিহারা অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ফলে মনের অবস্থার ওপর 'মণিহারা ফণী'র তথা উপমেয়ের ওপর উপমানের আধিপত্য লক্ষণীয়। উদাহরণ 'খ' এবং 'গ'-এ আমরা লক্ষ করি, কৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করতে কবি চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছের দোলাকে কৃষ্ণাঙ্গে মালতীর মালা দোলে বলে সংশয় প্রকাশ করেছেন; এবং শ্যামরূপকে নবীন মেঘেতে সৌদামিনীর দীপ্তির সঙ্গে তুলনার ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, তা-ই উৎপ্রেক্ষায় প্রত্যাশিত।

উপর্যুক্ত তিনটি উদাহরণেই সম্ভাবনাবাচক শব্দ 'যেন' ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে, অলংকারগুলো হয়ে উঠেছে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। উদাহরণ 'ঘ'-এ উপমেয় 'মুখের হাসি' সাদৃশ্যের প্রাবল্যে উপমান – গোলাপ ফুল বলে সংশয় জাগায়। লোককবি এই সংশয়কে 'যেমন' শব্দের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনাবাচক শব্দের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সম্ভাবনাভাবটি গোপন থাকে না – স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, সে উৎপ্রেক্ষাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলে (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৮২, নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৭৫)।

রাধারমণের প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা-সমৃদ্ধ পদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. কাঙ্গালের ধন কাঞ্চাসোনা পইড়ে রবে অন্ধকারে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৭)

খ. গুরু ও দয়াল গুরু আমি ঘোর অন্ধকার দেখি
গুরুর বাড়ি ফুলবাগিচা শিষ্যের বাড়ি কলি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৭)

গ. এ রূপলাবণ্যধন তনু নয়ে আপন
যৌবন বারিষার জল নিশির স্বপন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮৭)

ঘ. জলের ঘাটে দেখিয়া আইলাম কি সুন্দর শ্যামরায়
শ্যামরায় ভমরাগো ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধু খায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৮৩)

ঙ. আর আমার বন্ধু পরশমণি
কতো লোহা বানায় সোনা গো ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৫৭)

চ. পুরুষ ভমরাগো জাতি কঠিন তার হিয়া
না জানে নারীর বেদন পাষাণে বান্ধে হিয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৩৯)

উদাহরণ 'ক', 'খ' এবং 'গ' প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকারসমৃদ্ধ চরণ। সম্ভাবনাবাচক শব্দের ব্যবহার ব্যতিরেকে শিল্পনৈপুণ্যের মাধ্যমে প্রতীয়মানকে প্রকাশ করা হয়েছে। 'মনের মানুষ' পালিয়ে গেলে দেহরূপ কাঞ্চাসোনা অন্ধকারে পড়ে থাকবে ('ক'); গুরু-শিষ্যের তুলনা করতে গিয়ে বিকশিত, প্রস্ফুটিত বাগানের সাথে অবিকশিত ফুলকলির ('খ') কিংবা, তত্ত্বজ্ঞানীর সঙ্গে অজ্ঞান সত্তার বৈপরীত্যের যে ছবি কবি এঁকেছেন, তা নান্দনিক। উদাহরণ 'গ'-এ আমরা দেখি, যৌবনকে একই সাথে 'বারিষার জল' এবং 'নিশির স্বপন' বলে কবি প্রতীয়মানতা প্রকাশ করেছেন। ফলে, উৎপ্রেক্ষার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে চরণটিতে 'যৌবন' বা

উপমেয়কে নিষ্প্রভ করে উপমানের প্রাবল্য প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ 'ঘ', 'ঙ' এবং 'চ'-তে আমরা একই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখতে পাই।

রূপক : পরস্পরকে তুলনা করতে গিয়ে যখন উপমান ও উপমেয়কে অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন রূপক অলংকার হয় (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৬৫, নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৭৭)। এই অভেদকল্পনায় উপমান-উপমেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। উপমেয়ের ওপর উপমান এমনভাবে আরোপিত হয়, যাতে দুয়ের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে সর্বসাম্য ঘটে। একের রূপ অন্যের ওপর আরোপিত হয়ে সৌন্দর্য তৈরি হয় বলেই এর নাম রূপক অলংকার হয়েছে (শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৯৬২: ৫৮)। এখানে উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না করলেও প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে (নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৭৭)।

রাধারমণের কবিতায় আমরা দেখব রূপক অলংকারসমৃদ্ধ চরণ –

ক. আমার মন চোরা তুই হরি
কোন সন্ধানে কৈলায় রে বিশ্বাসের ঘর চুরি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৭৯)

এখানে 'বিশ্বাস' – উপমেয়, 'ঘর' – উপমান। যাতে বিষয়ের ওপর বিষয়ী তথা উপমেয়ের ওপর উপমান আরোপিত হয়ে সাম্য লাভ করেছে। আরো কয়েকটি উদাহরণ :

খ. আর আঙ্গুল কাটিয়া কলম দোয়াত করলাম আঁখি
আমার হৃদপদ্ম কাগজের মধ্যে বন্ধুর সংবাদ লিখি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৮)

গ. আমি ডাকছি কাতরে
উদয় হও রে দীনবন্ধু হৃদয়-মন্দিরে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১)

ঘ. তুই অনাথের বন্ধু পার কর ভবসিন্ধু
না বুঝিলাম এক বিন্দু তোর যত ছলনা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫)

ঙ. ভাইবে রাধারমণ বলে গুরু ফিরিয়া চাও
ডুবছে আমার সাধনতরী নিজগুণে ভাসাও।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭)

চ. আমার দেহতরী কে করলো গঠন
মেস্তরীকে চিননি রে মন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭১)

ছ. গুরুধন ভবার্ণবে আমার জাগা কৈ –
নিজের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না পরার জ্বালা কেমনে সই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৯)

জ. দয়াল হরির দয়া বিনে ভববন্ধন কে ঘুচাবে
হরি জগবন্ধু করুণাসিন্ধু আমায় নি করুণা হবে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৩)

ঝ. কামের সনে পিরিত করি প্রেমের কাছা ভিড়লাম না
কাম সাগরে সাতার দিয়া কিনার তাহার পাইলাম না।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৫১৪)

ঞ. রূপ দেখিয়া নয়ন পাগল গুণের পাগল ময়না
হৃদয় পিঞ্জিরার পাখি সয়াল ঘুরে বেড়ায় দেখ না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫২৮)

উপরি-উক্ত উদাহরণগুলোতে আমরা দেখি ('খ') হৃদপদ্ম – 'পদ্ম' উপমান, 'হৃদয়' উপমেয়; ('গ') হৃদয়-মন্দির – 'মন্দির' উপমান, 'হৃদয়' উপমেয়; ('ঘ') ভবসিন্ধু – 'সিন্ধু' উপমান, 'ভব' উপমেয়; ('ঙ') সাধনতরী – 'তরী' উপমান, 'সাধন' উপমেয় এবং ('চ') দেহতরী – 'তরী' উপমান, 'দেহ' উপমেয়। উদাহরণ 'ছ'-এ গুরুধন – 'ধন' উপমান, 'গুরু' উপমেয়; ভবার্ণব – 'অর্ণব' উপমান, 'ভব' উপমেয়; ('জ') ভববন্ধন – 'বন্ধন' উপমান, 'ভব' উপমেয়; করুণাসিন্ধু – 'সিন্ধু' উপমান, 'করুণা' উপমেয়।

একই ভাবে উদাহরণ 'ঝ'-এ 'কাম সাগর' হচ্ছে কামরূপ সাগর। এখানে 'কাম' হচ্ছে বিষয়, এতে বিষয়ী 'সাগরে'র অভেদকল্পিত হয়েছে। 'ঞ'-তেও 'হৃদয় পিঞ্জিরা ' হচ্ছে হৃদয়রূপ পিঞ্জিরা। এতে 'পিঞ্জিরা' উপমান, 'হৃদয়' উপমেয়।

উপমেয় এবং উপমানের অভেদকল্পনায় কবিতার চরণগুলো রূপকের শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। সহজিয়া সাধনের গূঢ় তত্ত্বকথাই মূলত রূপকগুলো ধারণ করে আছে।

অতিশয়োক্তি : ষষ্ঠ শতাব্দীর আলংকারিক আচার্য দণ্ডী অতিশয়োক্তিকে অলৌকিক মহিমাসম্পন্ন উল্লেখ করে বলেন, অতিশয়োক্তি অলংকারশ্রেষ্ঠ এবং সকল অলংকারের একমাত্র পরমাশ্রয়; সপ্তম শতকের আলংকারিক ভামহও একই অভিমত পোষণ করেন – 'কোহলঙ্কারোহনয়া বিনা?' অর্থাৎ,অতিশয়োক্তি বিনা অলংকারই হয় না (নরেন বিশ্বাস ২০০০ : ৯২-৯৩)। অতিশয়োক্তি অলংকারে উপমানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত। উপমেয়ের উল্লেখ না করে উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হলে তা অতিশয়োক্তি অলংকার হয় (শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৯৬২: ৯৫)। অলংকারটিতে উপমান বা বিষয়ী নিশ্চিতভাবেই উপমেয় বা বিষয়কে গ্রাস করে। উপমেয়ের ওপর উপমানের শ্রেষ্ঠত্বপ্রকাশ অতিশয়োক্তি অলংকার।

রাধারমণের কবিতায় অতিশয়োক্তির উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য –

ক. সখিরে কুলমান সবই নিল নয়ন পানে চাইয়া
আমার অন্তরে তুষের অনল জ্বলে গইয়া গইয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১৯)

খ. নিভিয়া ছিল মনেরই অনল কে দিল জ্বালাইয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১৯)

গ. যার কুলেতে কুল মজাইলাম তার কুল আমি পাইলাম না
পিপাসায় চাতকী মইল গো সখি জল পিপাসা গেল না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২০)

ঘ. বল সখী কি করি উপায় ফুলের শয্যা বাসি হইয়া যায়
আইল না কালশশী কুহু রবে ডাকছে কোকিলায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩১)

ঙ. বাঁশির মধু কতই মধু ঘরের বাহির কৈরে নেয় কুলবধূ
শ্যামের বাঁশি কি মোহিনী জানে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৯৫)

চ. হাঁটিতে যাইতে খসিয়া পড়ে সুধামৃত ধারা
সেই সুধা পান করে ব্রজের ভাগ্যবতী যারা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৩)

ছ. চিরজীবী তুমি কালা গলে পরছি প্রেমমালা
জ্বালা সইয়া জীবন গেলো আর কতকাল জ্বালাইবায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩০৩)

জ. বাঁশি হইল কাল ঘটাইল জঞ্জাল করিলগো পাগলিনী
আশা পথে চাতকিনী সজনীগো কাঙালিনী।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৫)

এখানে, প্রথম উদাহরণে ('ক') রাধার বিরহ বর্ণিত হয়েছে। আমরা দেখি – উপমেয়ের (রাধার চিত্তদাহ) উল্লেখ না করে উপমানের (তুষের অনল) শিল্পিত প্রকাশ। দ্বিতীয় উদাহরণেও ('খ') আমরা উপমানকে (অনল) দেখি উপমেয় – 'দুঃখ'কে গ্রাস করতে। তৃতীয় উদাহরণে ('গ') চাতকীর মতো জলপিয়াসী রাধার সংকট বর্ণিত হয়েছে। এতে উপমেয় তথা বিষয়ের (রাধা) উল্লেখ না করে কবির দৃষ্টিতে কেবল উপমান বা বিষয়ীর (চাতকী) কথাই ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ উদাহরণে ('ঘ') রাধার অপেক্ষার প্রহরের বর্ণনায় উপমেয় – কৃষ্ণ অনুপস্থিত; উপমান (কালশশী) গ্রাস করেছে উপমেয়কে, এবং উপমানই উপমেয়ের স্থান দখল করে কাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। পঞ্চম উদাহরণে ('ঙ') কৃষ্ণের বাঁশির জাদুকরী ক্ষমতার কথা ব্যক্ত হয়েছে – যার মোহিনী সুরে কুলবধূর ঘরে থাকা দায়। এখানেও উপমেয় – বাঁশির সুরকে অধিকার করেছে উপমান (মধু)। ফলে, কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো অতিশয়োক্তির সৌন্দর্যে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে।

একই অলংকার-বৈশিষ্ট্য উদাহরণ 'চ', 'ছ', 'জ'-এ শিল্পমণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

অপহ্নুতি : যদি প্রকৃতকে (উপমেয়) অপহ্নব বা অস্বীকার করে অপ্রকৃত তথা উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে অপহ্নুতি অলংকার হয় (শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮ : ৯১)।

রাধারমণের পদে অপহ্নুতির ব্যবহার :

ক. বাঁশি নয় গো কালভুজঙ্গে অঙ্গে দংশিয়াছে
আমি বাঁশির জ্বালা সইতে নারি কহিতে নারি লাজে।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ২৭৬)

এখানে উপমেয়কে (বাঁশি) 'নয়' শব্দ দিয়ে অস্বীকার করে উপমানকে (ভুজঙ্গ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

খ. বাঁশি নয় গো সুধানিধি তারে কেমনে গড়িল বিধি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৪)

এখানেও উপমেয় 'বাঁশি'কে অস্বীকার করে উপমান 'সুধানিধি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মূলত প্রেম এবং প্রেমতত্ত্বকে রাধারমণ তাঁর পদাবলিতে ভাষিকরূপ প্রদান করেছেন। পদে প্রকাশিত অলংকার সে তত্ত্বের শিল্পসুষমা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে। রাধারমণ রূপদক্ষ কবি কি না – এ প্রশ্নের সরল জবাব সম্ভবত আর দেয়া সম্ভব নয়। কেননা, সময়ের প্রবাহে কবির গান বা বৈষ্ণবপদের শরীরের রূপ-সৌন্দর্য অনেকটা হারিয়ে গেছে। তবে কবিতার শরীরে রক্ষিত শিল্প-উপকরণের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে এ প্রতীতী জন্মে যে, রূপমুগ্ধতা তাঁর ছিল। ছন্দের নানামাত্রিক প্রকাশসহ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদি অলংকারের উপস্থিতি তাঁর পদকে প্রভূত সমৃদ্ধি প্রদান করেছে – একথা যেমন সত্য, তেমনি বলা যায় যে, পদে কবির রূপ-প্রচেষ্টা সযত্ন-প্রসূত নয় – বিষয় এবং প্রকাশরীতির অনিবার্য মেলবন্ধনের ফলেই তাঁর কাব্যের শিল্পমণ্ডিত প্রকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে নাগরিক বা শিক্ষিত-মার্জিত কবির সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য রয়েই যায়। তবে চণ্ডীদাসের সঙ্গেই যেন তাঁর কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করার মতো। প্রকাশের চেয়ে ভাবের মহত্ত্বের দিকে যেন দুই কবির লক্ষ্য। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সমালোচকের বক্তব্য :

> বিশ্বছন্দ চেতনায় ধরা দিলে, ভাবের সঙ্গে ভাবের, রূপের সঙ্গে রূপের মিলন-কামনা, অজস্র প্রায়ই অমার্জিত অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্ট পৃথিবীকে পরিমার্জনার চেষ্টমাত্র না করিয়া কবি সহজ আবেগে কাব্য-বদ্ধ করিয়াছেন। (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২০০৮ : ৯৯)

'অমার্জিত' অলঙ্কার লোকসাহিত্যের সৌন্দর্য। পরিমার্জনা ব্যতিরেকে রাধারমণের পদে আমরা যে রূপ-প্রচেষ্টার পরিচয় লাভ করি, তাতে ভাব এবং রূপ যে কখনো কখনো সৌন্দর্যের মোহনায় এক হয়ে গেছে – এতে সন্দেহ নেই। কবির পদাবলিতে শিল্প-সৌন্দর্যের এই উপস্থিতি লোককবির রূপদক্ষতা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ না করলেও তাঁর রূপমুগ্ধতা বা 'রূপানুরাগ' নানাভাবে ফুটে ওঠে। কোথাও-বা এই রূপপ্রীতি নাগরিক কবির মার্জিত শিল্পকলার সমকক্ষ হয়ে ওঠে। রাধারমণ লোক এবং অ-লোক কবির বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে অনন্য হয়ে আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

রাধারমণের পদাবলিতে মানুষ ও সমাজ

পদাবলি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম-দর্শনের গূঢ় তত্ত্বকথাকে নির্দিষ্ট চরিত্র এবং কাহিনির মাধ্যমে উপস্থাপন করা – সমকাল বা সমকালীন জীবন-বাস্তবতার বর্ণনা তাতে উদ্দিষ্ট নয়। বৈষ্ণব পদাবলির কাহিনি অনেকটা লোক পুরাণ নির্ভর – চরিত্রগুলোও তাই। তবে কবি যেহেতু কোনো ভূখণ্ড বা সমাজের ভেতর থেকে সমকাল ও সমাজবাস্তবতাকে আত্মস্থ করে বিকশিত হন, স্বভাবতই তাঁর রচনায় পৌরাণিক মানুষ ও জীবনের ভেতরে পরোক্ষে ফুটে ওঠে তার অভিজ্ঞতার মানুষ ও সমাজ।

৫.১ রাধা এবং লৌকিক নারী

লোকমানুষের সত্তার গভীর থেকে ক্রমবিকশিত হওয়া চরিত্র রাধা। লোককথা এবং পুরাণের সমবায়ী প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছে ধর্ম-দর্শন এবং মানবিক উপাখ্যানের নায়িকার প্রতিমূর্তি (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ১০৩-২১) বৈষ্ণব পদাবলির প্রধানতম এবং সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র রাধা। কৃষ্ণের আহ্লাদ, প্রেম-ভালোবাসা, আনন্দের প্রতীক রাধা; এবং তার প্রতি অবহেলা – কখনো অপমানের লজ্জা এবং তাকে পরিত্যাগের লাঞ্ছনা ও বিরহের আর্তনাদে মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্যের প্রায় সমগ্রটা দুঃখের নোনা জলে আর্দ্র।

রাধা চরিত্রের নিপুণ অঙ্কনে কবিগণ পুরাণ এবং লোক-ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে ফুটিয়ে তুলেছেন এর ভাষিক প্রতিমা। আবার কখনো সমসাময়িক নারীর মধ্যেই প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন রাধাসত্তাকে। ফলে রাধাচরিত্র এবং সমসাময়িক নারীসত্তা মিলে কখনোবা তৈরি হয়েছে ভারতীয় তথা চিরন্তন বাঙালি নারীমূর্তির প্রতিচ্ছবি। রাধারমণের পদেও আমরা বাঙালি নারীর শাশ্বত রূপ প্রত্যক্ষ করি :

ক. চির পরাধিনী নারীর গো মনে সুক থাকে না।
আপনার সুকে সুকী জগৎ পরার সুক বুঝে না।
নারীর পরার আশে পরার বশে দুঃখে জীবন যাপনা।
দিবস রজনী ঘরে গুরুর গঞ্জনা ॥
নারীর দুল্লব জনম পরার হাতে দুঃখে প্রাণ বাঁচে না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৮০)

খ. আমার নারীকুলে জন্ম কেন দিলায় রে দারুণ বিধি
নারীকুলে জন্ম দিয়া ঘটাইলায় দুর্গতি রে ॥
শিশুকালে পিতার অধীন, যৌবনেতে স্বামীর অধীনরে
ওরে বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন আমারে বানাইলায় রে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৩৩৭)

এই পরাধীন নারী একই সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের নারীসত্তা আবার চিরন্তন বাঙালি নারীর প্রতীক। নিজের পরিচয়ের সন্ধানে সচেষ্ট নারীর সত্তাবিষয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কখনো আমাদের শুনতে হয় উপর্যুক্ত কথারই প্রতিধ্বনি। পিতা, পতি ও পুত্রের 'অধীনে' থাকা নারীর 'দুর্গতি'র চিত্রের ভেতর দিয়ে নারীদের বঞ্চনার ইতিহাসই ফুটে ওঠে (মোস্তাক আহমাদ দীন ২০১২ : ২০)। মূলত, রাধার উক্তির মাধ্যমে নারীর স্ব-অধীন হতে না পারার আর্তি-ই যেন ফুটে উঠেছে রাধারমণের পদে।

এই নারীকে উপস্থাপন করতে গিয়েই উঠে আসে তার ঘর – তার সাথে জড়িয়ে থাকা সম্পর্কগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের শীতলতা-উষ্ণতার কথা। বিবাহিত জীবনে নারী তার স্বামীর সূত্রে প্রাপ্ত সম্পর্কগুলোতে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। এখানেও সে পরের অধীনতারই বশ – হোক তা পুরুষের কিংবা অন্য কোনো নারীর :

কদমতলে বসি কৃষ্ণ বাজায় মোহিনী
আমারে করিল পাগল কর্ণে পশি ধ্বনি।
মুরলী বাজাইয়া বন্ধে কইলো আকুলিনী
ঘরবার করি আমি নিন্দে ননদিনী।
শ্বশুড়ী ননদী নিন্দে আর যত গোপিনী
আমি তার পিরিতে পাগল কুল কলঙ্কিনী।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৯৬)

রাধারমণের পদে এ-নারী যমুনার তীরবর্তী ব্রজের গোপিনী রাধা – প্রেমাস্পদের বাঁশির মোহনীয় সুরে আকুলপ্রাণ। অপরূপ রূপ আর গুণের আধার পরপুরুষ কৃষ্ণ স্বরূপে পরমপুরুষের অমোঘ টানে প্রেমের বাঁধনে জড়িয়ে আছে। ফলে কুলবধূ রাধিকা শাশুড়ি-ননদিনীর গঞ্জনা সহ্য করে পাগলপারা, সমাজের অপবাদ মাথায় নিয়ে কলঙ্কিনী। সংগৃহীত সহস্রাধিক পদের বেশির ভাগ জুড়ে এই রাধার আনন্দ-বেদনার কথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ তথা সিলেট অঞ্চলের নারীর পরিচয়ও ফুটে ওঠে রাধার অবয়বে রাধারমণের পদে। যেমন :

দেবর আসিয়া কইন দেওগো দিদি জাঠা
কি অইতে কি হুনিয়া আনিয়া দিলাম পাটা।
আরি বাড়ির প'রি আইলা দিতাম করি সাদা
ধুতরা পাতা দিতে কইন বাউলা কেনে দাদা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৯৭)

গোপন প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে বিভ্রান্ত নারীর চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সমস্তটি দখল করে আছে বাঁশির জাদুকরী সুর। বোধের জগৎজুড়ে আছে বাঁশিওয়ালা শ্যাম। ফলে প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে বিঘ্নতায়

গুরুজনের গঞ্জনা। প্রতিবেশীর সঙ্গে গৃহস্থ নারীর এই সম্পর্কের ছবি যেমন রাধারমণ এঁকেছেন, তেমনি নিম্নবিত্তের গঞ্জনার ছবি আঁকতে গিয়ে কবির বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদে যেমন সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথনির্দেশই চর্যার পদগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য; তবুও সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রকাশ করেছেন লোকজগতের অভিজ্ঞতার আলোকে। যেখানে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন ও সমাজবাস্তবতার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র লক্ষ করা যায় (বরুণকুমার চক্রবর্তী ২০০৬ : ৯)। রাধারমণের পদেও আমরা দেখি নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র। অন্তরঙ্গে তত্ত্বকথা স্পন্দিত হলেও বহিরঙ্গে প্রাত্যহিকতার জীবন্ত ছবি। গার্হস্থ্য জীবনে ভাতৃবধূর প্রতি ননদিনীর কটু-উক্তিতে আঁকা হয়ে যায় সংসারের প্রাত্যহিক বচসার চিত্র :

হাতের কাম ঝরিয়া পড়ে বাঁশির স্বর শুনিয়া
নিকামা দেখি নন্দে কয় কি শুনো দাঁড়াইয়া।
কি বলি তখন আমি না পাই তুকাইয়া
তখন নন্দে গালি দেয় মা বাপ তুলিয়া।
নন্দের গালি শুনিয়া না শুনি থাকি নীরব হইয়া
বাঁশির সুরে নন্দের গালি যায়গি তলাইয়া।
ভাবে বুঝে নন্দে আমার কয় কথা ঘুরাইয়া
'*লাংগের*' টান টানো বুঝি '*হাইর*' ভাত খাইয়া।
তে কেনে যাও না চলি লাংগের লগ ধরিয়া
ডাটা অইয়া উবাই কি লাভ হাইর কাম পালাইয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬১)

'উপপতি' (লাংগ) এবং 'স্বামী' (হাই) শব্দের (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ২০০০ : ৯০১, ১০০৩) ব্যবহার লক্ষণীয়। কবি পদাবলির হাজার বছরের সময়ের মধ্যেও নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানে আমাদের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করেন; এবং সমাজের নিম্নবিত্তের জীবন-যাপনের সংস্কার এবং সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করেন। আবহমান বাংলাদেশের গৃহস্থঘরের সাধারণ চিত্রই যেন ধরা পড়ে অন্যত্র :

কাঁচা চুলায় ভিজা লাকড়ি চড়াইছি জ্বাল
ওগো জ্বালের চোটে বাসন ফুটে ভাঙিয়া হইল চারিখান।
ওগো বাঁশির সুরে বেভোর হইয়া করিয়াছি লবণ টান ॥
শাকশুকতা ভাজাবরা করিয়াছি পাক
শাশুড়ী মায় খাইলে পরে করিবা বাখান
ননদীয়ে খাইলে পরে তুলিয়া দিবা খোটাকান।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৩১)

শাশুড়ি-ননদির সঙ্গে বধূটির সম্পর্কের তিক্ততা ও শীতলতার কথাই ফুটে উঠেছে এখানে। কবি যে-সমাজের বর্ণনা করছেন তা রাধার নয়, রাধারমণের সময় ও সমাজের।

৫.২ জীবন-জীবিকা

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সবুজ মানচিত্রে বয়ে গেছে অসংখ্য নদী। বিল-হাওরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে কৃষিজীবী মানুষের বসতভিটার কিনারায়। উর্বর মাটি আর তরঙ্গায়িত জলের ভেতর থেকেই উঠে আসে জীবনধারণের উপকরণ – ক্ষুধানিবারণের অন্ন, পুষ্টিসাধনের আমিষ :

ইলশা মাছ কি বিলে থাকে, কাঁঠাল নি কিলাইলে পাকে
মধু কি হয় বলার চাকে মধু থাকে মধুর চাকে।
...
ভাইবে রাধারমণ বলে বিপিন রে তুই কি কাজ কৈলে
ধান তুই বাইন করিলে শাইল ক্ষেতে আমন দিলে
আর কি বীচের নাগাল পাবে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৪)

ঊনবিংশ শতকের লোককবি রাধারমণ জানেন, মাটির গভীর থেকে সোনালি ফসলের বীজ জাগিয়ে তোলার কৌশল – জল ও মৃত্তিকার প্রাচীন ব্যাকরণ, প্রকৃতির ভাণ্ডারে শৃঙ্খলার স্বরূপ। প্রবহমান পানির মাছ রুপালি ইলিশের প্রসঙ্গে ফুটে ওঠে নদীবিধৌত বাংলাদেশেরই ভূগোল এবং ঐতিহ্য। সমাজ থেকেই রূপ নিয়ে রূপক তৈরি করেন কবি (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০০৪ : ৮৩)। কামার-কুমোরের জীবন রাধারমণের পদে শিল্পের উপকরণ হয়েছে। জীবনের গূঢ় রহস্যকে প্রকাশ করতেই সামাজিক জীবনকে তিনি অবলম্বন করেছেন :

ক. কুমারীয়ার পইলের মাটি মাটি হয় না পরিপাটি
কাঁচা মাটিয়ে রং ধরে না পোড়া দিলে হয় সোনা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৮)

খ. আগুন দিলে লোহা গলে
গুরু আমার মন তো গলে না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২)

গ. গুরু তুমি কারবারের রাজা ষোল জনে মারে মজা
বসে বসে হিসাব কষি বইলাম শুধু ভূতের বোঝা।

দোকানে নাই মাল আমদানি বসে শুধু হিসাব টানি
নিজে করি বিকিকিনি নিকাশ দেখি ঋণের বোঝা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭)

গোপন সাধনার তত্ত্বকথায় ভারাক্রান্ত হলেও শেষোক্ত চরণগুলোয় ক্ষুদ্র 'দোকানী'র আত্মসমালোচনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে লাভ নেই, লাভ-ক্ষতির সাম্য নেই – কেবলই ঋণের বোঝা বেড়ে যায়।

৫.৩ যোগাযোগের বাহন

নদী-অধ্যুষিত বাংলাদেশে যোগাযোগের বাহন হিসেবে নৌকা অতি প্রাচীন। চর্যাপদে ব্যবহৃত লোকযানের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে নৌকার কথা। নদীবহুল দেশে – বিশেষ করে বর্ষাকালে নৌকার বিকল্প ঊনবিংশ শতকে কল্পনা করা যেত না। যেমনটা এখনো বর্ষাকালে বিল-হাওরের জলবেষ্টিত সুনামগঞ্জে নৌকা অপরিহার্য মাধ্যম :

রঙ্গে রঙ্গে আর কতদিন চালাইবায় তরণী বানাই
নাইয়া নৌকা লাগাও বন্ধের ঘাটে ॥
নতুন বরিষার জল ঘাটে বা বেঘাটে
সামনে চালাইলায় তরী না চাইলায় ফিরিয়া
দিন গেল বেলা নাই বিপদ নিকটে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬৭)

আষাঢ়ের মেঘ যেমন 'প্রিয়ের আগমন-আশ্বাস' হয়ে আসে (কালিদাস ১৯৯৯ : ৭৩), তেমনি বর্ষার নতুন পানি শুকনো বিল-হাওরের বুকে জাগায় আনন্দের হিল্লোল। জীবনের উচ্ছ্বাস তখন ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে যায়। আষাঢ়ের দিগন্তবিস্তৃত 'ভাসা পানি'র (উকিল মুন্সি ২০১৩ : ৩৪) প্রান্তরে তখন আনন্দের রং – নদীশাসিত বাংলাদেশের এ অতি পরিচিত দৃশ্য। নতুন 'বরিষার জলে' নৌকা চালানোয় রাধারমণের সতর্কবাণী।

যন্ত্র-সভ্যতার ঢেউ এসে লাগে বাংলাদেশে। যোগাযোগে তৈরি হয় নতুন অধ্যায়, আসে রেলগাড়ি। ধীরে চলা গরুর গাড়ি কিংবা মহিষের গাড়ির দেশে, কিংবা পালকি-নৌকার জনপদে দ্রুতগতির ইঞ্জিনের যান দেখে মুগ্ধ লোককবির পদে তারই ছবি :

ক. চৈড়ে মনোহারী ভবের গাড়ি আয় কে যাবে বৃন্দাবন ॥
বৈসে থাক রূপ নেহারে স্বরূপে রূপ কইরে মিলন।

নয়ন রেলে ভাবের গাড়ি কানেতে চাক যোগান করি
রাগ-অনুরাগ অনল বারি পূর্বরাগ কইরে দাহন ॥
কাম কলেতে টিপনি দিয়ে চালায় প্রেমের ইঞ্জিন
হাওয়ার আগে চলে তিলে পলে ঘুইরে আসে চৌদ্দ ভুবন ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭৩-৭৪)

খ. চলছে হরি নামের গাড়ি
আয় কে যাবি বৃন্দাবন
দীক্ষা শিক্ষা মহাবলী পথে
তিনটা ইস্টিশন।
প্রথম টিকনা নৈদাপুরী
স্টেশন মাস্টার গৌরহরি
নিতাই অদ্বৈত সহায়কারী
নামের গাড়ির মহাজন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৫৮)

রেলের প্রতি ঊনবিংশ শতকের মুগ্ধতাই যেন প্রতিফলিত হয়েছে সাধক কবির বাণীতে। এ মুগ্ধতা আবারও ধরা পড়ে যখন কলকাতার আকাশে বিমান পাখা মেলল :

কিমাশ্চর্য প্রাণসজনী দেখবে আয় ত্বরিতে
এরোপ্লেন উড়িয়া আইল বিস্কুটেরি ক্লাবেতে।
নিচে চাকা পৃষ্ঠে পাখা ইংলিশ লেখা তাহাতে
পাখির মতো উড়ছে যেমন কলের ইঞ্জিন হাওয়াতে
দশবাজিতে কলিকাতাতে উঠিল বিমান রথেতে
বারোটাতে বিপ্রি সাহেব নামল লংলার বাংলাতে
তারের বেড়া গড় পাহারা – পড়ল যখন ভূমিতে
হাতে ছড়ি লাল পাগড়ি ঘেষতে না দেয় কাছেতে
বাঙালি কাবুলি কুলি ধাইল পবনবেগেতে
ঘুরঘুর শুনি ঘর গৃহিণী বাহির হইল মাঠেতে
ভাইবে রাধারমণ বলে ভাবিয়া মনেতে
পাঁচ মিনিটে পাঁচশ টাকা উড়াইল সখ মিটাইতে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৮৪)

৫.৪ বিয়ে-অনুষ্ঠান

রাধারমণের পদে বিয়ের উৎসবের চিত্রে ফুটে ওঠে বাঙালির চিরন্তন জীবনের ছবি। যৌথ জীবনের আনন্দ ধরা পড়ে লোকগানে। এ যেন কৃষিকে ভিত্তি করে বিকশিত হওয়া সমাজের প্রতিচ্ছবি :

ক. আইলারে বাজনিগুষ্টি বইলা বারবাড়ি
শব্দ শুনি জামাইর মায় পাঠাইলা বারবাড়ি ॥
ঘরগজে উঠিতেরে জামাইর মায় দিলা বানা
বিছানা বিছাইয়া দিলা জামাইর মার চারখানা ॥
চাটি দিলা পাটি দিলা আর দিলা গালিচা
তামাক খাইতে দিলা বেলোয়ারি হুক্কা ॥
বালিশ দিলা গিদ্দক দিলা চান্দুয়া মশারি।
পান খাইতে দিলা নারায়ণগঞ্জী থালি ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৮২)

খ. চাউল ভিজাইয়া কন্যার মায়ে ডাকছে আরিপরি
আরিপরি বৌ ঝিয়ারি সকলও নাইওরী,
তোমরা যাইও আমার বাড়ি ॥
কন্যার কাকী উঠিয়া বলইন শক্ত আছে নাড়ী
উত্তর বাড়ি কুটিয়া আইলাম এক পুরা চাউলের গুড়ি
তোমরা যাইও আমার বাড়ি ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৮৫)

বাঙালি সমাজব্যবস্থায় উৎসবে-পার্বণে সামষ্টিক উদ্‌যাপনের যে প্রাচীন রীতি – এ তারই চিত্র। নাগরিক বিচ্ছিন্নতার ছায়া এখানে অনুপস্থিত। মেয়ের বিয়েতে আনন্দে মেতে উঠেছে পাড়াপড়শি। পিঠা তৈরির আনন্দ-কসরতে সকলের অংশগ্রহণ না-হলে নয়। আর নিকট আত্মীয়ের বিয়ে কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠানে বেড়াতে আসার যে আনন্দ তা ধারণ করে আছে একটি আন্তরিক শব্দ – 'নাইওর'। বাঙালি নারীর নাইওর যাওয়ার আকুতি চিরকালীন।

আদরে আপ্যায়নে প্রিয় অতিথির জন্য সুসজ্জিত সজ্জার পাশাপাশি রুচিকর খাবারের বর্ণনায় আবহমান ভারতীয় সমাজের চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি শাশ্বত বাঙালি জীবনও চিত্রিত হতে দেখি :

ক. ফুল বিছানা সাজন করি ফুলের বালিশ ফুল মশারি
তার উপরে চান্দুয়া টানাইয়া ॥
দারুচিনি মাখনছানা লুচি পুরী বরফি ছানা
সাজাইয়া রাখলাম প্রাণবন্ধের লাগিয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৭)

খ. ফুলের আসন ফুলের বসনরে বন্ধু ফুলেরই বিছানা
ওরে হৃদ কসমে চুয়া চন্দন ছিটাইয়া দিলাম না বন্ধুরে ॥
ক্ষীর ক্ষীরিয়া মাখন ছায়ারে বন্ধু রসেরই কমলা
দুই হস্তে চান্দ মুখে আমি তুইলা দিলাম না বন্ধুরে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩৪)

'রসের কমলা'র বর্ণনায় বৈষ্ণব পদের দূরবর্তী বৃন্দাবনের চেয়ে পাহাড়ি সিলেটের কথাই যেন বেশি ফুটে ওঠে। কবির উচ্চারণ দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ নয় বলেই নির্দিষ্ট কাহিনি এবং চরিত্রের বর্ণনায় উপেক্ষিত থাকে না সমকালীন মানুষ-সমাজ – নগর-জনপদ। আমরা লক্ষ করি, রাধারমণের পদে উঠে এসেছে সমকালীন কিছু নগর-জনপদ – যা লোককবির সমাজসংশ্লিষ্টতাকে সময়ের নিরিখে উপস্থাপন করে :

ক. বিলাতের কর্তা জিনি মন হইবি স্বাধীন
মনরে হবিগঞ্জ নবিগঞ্জ কলিকাতা তেলিগঞ্জরে
আশুগঞ্জের লাইনের ভিতর মন আমার ঘোরাবি কতদিন।
রাস্তায় রাস্তায় থাম গজিয়ে তার বসিয়ে রে
তারে চিনিয়ে দেব ঠুকা রে মন, দিনের খবর পাবে দিনে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৯৫)

খ. ঢাকা শহর রং বাজারে রঙের বেচাকেনা
মদনগঞ্জের মাজন মোরা ঐ ঘাটে যাইও না রে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৩)

'বিলাতের কর্তা' এবং 'স্বাধীন' শব্দযুগলে সাধক কবির দেশচেতনা প্রকাশ পায়। বিভিন্ন শহর-জনপদের নামের মধ্য দিয়ে কবি নিজের অবস্থানকেই চিহ্নিত করেছেন। সিলেট তথা পূর্ববঙ্গের মাটিই তাঁর ঠিকানা। যেখান থেকে কলকাতা অনেক দূরের শহর।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ ইংরেজ শাসন এবং সংস্কৃতি

রাধারমণ ব্রিটিশ শাসনামলে তাঁর জীবন-কাল কাটিয়েছেন। ফলে ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ চিত্র তাঁর গানে আমরা লক্ষ করি। বাংলাদেশে রেল-বিমান কিংবা টেলিফোন-টেলিগ্রামের সূচনা এবং সম্প্রসারণে কবি মুগ্ধ ছিলেন। প্রশাসনিক পদের ব্রিটিশ নামকরণ কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিংবা বলা যায় – ইংরেজি ভাষার আধিপত্য তাঁর সিলেটের উপভাষাকেও নাড়া দিয়ে যায় :

ক. গবার্নার শ্রীনিত্যানন্দ এসিস্টেন্ট তার শ্রীঅদ্বৈত
চিপ কমিশন শ্রীবাসভক্ত, সাবডিভিশন শান্তিপুরে।
জর্জ আদালত শ্রীগদাধর হরিদাস তার খুদ মাজেস্টর
শ্রীনিবাস তার ইন্‌সপেক্টর স্বর্গমর্ত্য পাতালপুরে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৫৮)

খ. কাম কলেতে টিপনি দিয়ে চালায় প্রেমের ইঞ্জিন
হাওয়ার আগে চলে তিলে পলে ঘুইরে আসে চৌদ্দ ভুবন ॥
প্রথম টিকেট ব্রজপুরী স্টেশনমাস্টার বংশীধারী
সব সখিগণ সহায়কারী ভাব গাড়ির মহাজন
ভাবনা মূলে আমার টিকেট কাটে বিশাখা সখী
সখীর অনুগত হইয়ে থাকা করে তনুমন অত্মসমর্পণ ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭৪)

ভাষার ব্যবহারে রাধারমণের পদ সমকালীনতাকে ধারণ করলেও এর অভ্যন্তরে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম – দ্বৈত-অদ্বৈতবাদী প্রেমদর্শন।

ব্রিটিশ শাসনশোষণের জাল শহর থেকে গ্রামগঞ্জে বিস্তার লাভ করেছে। শান্তিপ্রিয় জনজীবনে পড়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। 'বাঙালির ধর্মীয় মূল্যবোধ, সমন্বিত সমাজচেতনা সর্বোপরি আমাদের হাজার বছর লালিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেও আঘাত হেনেছে' (আবদুল ওয়াহাব ২০০৮ : ৩১৫)। কবির পদ :

সখিগো যে ঘাটে জল ভরতে গেলাম
সে ঘাটে ইংরেজের কল
এগো কলসীর মুখে ঢাকনি দিয়ে
সাবধানে ভরিব জল।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬৭)

'ইংরেজের কল' বলতে ইঞ্জিনচালিত জলযানের কথাই বলা হয়েছে। নৌকার ধীর ঢেউয়ের সাথে যে নারীর বহু বছরের পরিচয় – ইংরেজের কল তার অনাত্মীয়। ফলে, জলের ঘাটে সাবধানতার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে প্রচলিত ধারণা – ফলে-ফসলে সমৃদ্ধ জনপদ, রাধারমণের কোনো কোনো পদে এর বিপরীত চিত্র আমরা দেখতে পাই। হয়ত দুর্ভিক্ষ কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক কারণে বিপর্যস্ত জনপদ :

ক. আর দেখলাম দেশের এই দুর্দশা ঘরে ঘরে চোরের বাসা
এগো সে চুরায় কি যাদু জানে ঘুমের মানুষ করছে অচেতন ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৪)

খ. কানা চোরায় কৈলে চুরি ঘর থইয়া শিং বারে দেয়
মিছামিছি কাটে মাটি চোরের বাটে মাল টানে না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৮)

গ. ভাইরে ভাই লাভ করিতে আইলাম ভবে ষোলো আনা লইয়া
আমার ধনসম্পত্তি লুইটে নিল ডাকাইতে লাগ পাইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৩)

চর্যাপদের 'কানেট' চুরি হয়ে যাওয়া বধূটির মতোই চোরের উপদ্রবে তটস্থ সমাজ। বাঙালি সমাজ-ব্যবস্থার ওপর বহির্শক্তির আক্রমণে বারবার নিঃস্ব হওয়া বিত্তহীন মানুষের অনৈতিক পথ অবলম্বন কারণ হতে পারে। কিংবা, বাঙালির চরিত্রের নেতিবাচকতার যে নির্যাস ড. আহমদ শরীফ উন্মোচিত করেছেন, তাতে চৌর্যবৃত্তির এই প্রবণতার কারণ প্রকাশিত : 'বাঙালী ভোগলিপ্সু কিন্তু কর্মকুণ্ঠ। বৈরাগ্য-প্রবণ জৈন-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব মতবাদ বাঙালী চিত্তে কর্মকুণ্ঠা আরো প্রবল করেছে। এমন মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি বা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে' (আহমদ শরীফ ২০০০ : ৫)।

চোর কিংবা ডাকাতের রূপকের আড়ালে ঢাকাপড়া সমাজের রূঢ়বাস্তবতার ছবি ফুটে উঠেছে রাধারমণের পদে।

৫.৬ লোকসংস্কার-বিশ্বাস

সংস্কার কবি বা লেখকের নিজের বিশ্বাসজাত, আবার কখনো তা সমাজমানস নিংড়ানো অভিজ্ঞতা – যা কবির রচনায় বাণীরূপ লাভ করে। রাধারমণের পদে আমরা এরূপ কিছু অভিজ্ঞতাজাত অভিব্যক্তির পরিচয় লাভ করি – যার ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে সমাজ ও মানুষের মন-মানস :

Dhaka University Institutional Repository

ক. সিং কাইটে চোর সামাইল ঘরের মানুষ যায় পলাইয়ে।
কাঙ্গালের ধন কাঞ্চাসোনা পইড়ে রবে অন্ধকারে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪৭)

খ. নিজের বেদন সবাই বুঝে পরের বেদন না
গকূলে সুহৃদ পাইনা যার ঠাই করি 'আ'।
'আ' করি না আউয়ার ডরে কি অনে কি কইব
একেতে আর পরচারি কলঙ্ক রটাইব।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৫)

গ. ভাই বন্ধু পরিবার কেবা সঙ্গে যায় কার
মরিলে মমতা নাই ত্বরায় করে ঘরের বার ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৪২)

ঘ. ইমান থাকলে আল্লা মিলে
কাম করলে পয়সা মিলে।
...ভালো মানুষের আত ধোয়াইলে
একদিন কাম আয় নিদান কালে।
এগো কমিন্দর লগে দুস্তি কইলে
মুখ পোড়া যায় বিনাগুইনে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৪)

ঙ. সর্পের বিষ ঝারিতে লামে, প্রেমের বিষে উজান বায়
উঝা বৈদ্যের নাই গো সাধ্য ঝারিয়া বিষ লামাইতো চায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩০০)

চ. সর্প হইয়া দংশো বা গুরু
উঝা হইয়া ঝারো
মরিলে জিয়াইতে পারো
যদি দয়া ধরো।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫)

'ইমান' এবং 'আল্লা' শব্দযুগলে ঊনবিংশ শতকের পূর্ববঙ্গীয় সমাজে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব মিশ্রিত হয়ে আছে। তবে সাপের দংশন এবং এর নিরাময়ে ওঝার ঝাড়-ফুঁকের ইতিহাস কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর নয়। কর্মকুণ্ঠ আর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি সামূহিক বিপদ-আপদ, দৈব-দুর্বিপাকে পরিত্রাণের সন্ধান করেছে নিজস্ব পথে। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*-এ তারই নিরাভরণ চিত্র :

> 'বাঙালীচরিত্রে যে একদিকে মিথ্যা ভাষণ, প্রবঞ্চনা, চৌর্য, ছদ্ম বৈরাগ্যভাব, চাতুর্য, সুবিধাবাদ ও সুযোগসন্ধান, তোয়াজ ও তদবিরপ্রবণতা প্রভৃতির প্রাবল্য এবং আত্মসম্মানবোধের অভাব, অন্যদিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যে দেবানুগ্রহজীবিতা রয়েছে, তা ঐ কর্মকুণ্ঠারই প্রসূন। তাই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগে আমরা বাঙালিকে কেবল তুক-তাক, দারু-উচাটন, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-মারণ, বশীকরণ, কবচ-মাদুলি, যোগতন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনী নির্ভর দেখতে পাই।' (আহমদ শরীফ ২০০০ : ৫-৬)

রাধারমণের উপর্যুক্ত পদে তন্ত্রশাসিত সমাজ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতক অবধি বাঙালির মর্মমূলে লালিত সংস্কারের ক্ষুদ্র অথচ সূক্ষ্ম এবং তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য অভিব্যক্ত হয়েছে।

আবহমান বাংলাদেশের লোকমানুষের বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতিফলন রাধারমণের পদে লক্ষ করা যায়। নিম্নবিত্তের মানুষের অনেকটা অজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে তৈরি হওয়া বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে বাঙালির হাজার বছরের জীবন-যাপনের ইতিহাস, যা দারিদ্র্যকে উপস্থাপন করে – অর্থনৈতিক দৈন্যে অবিকশিত সত্তার অন্ধতাকে প্রকাশিত করে কখনো। রাধারমণের পদে উন্মোচিত হওয়া বাংলাদেশের সমাজ ও মানুষের ইতিহাস চর্যাপদে বিধৃত সামাজিক ইতিহাসেরই যেন আধুনিকতর রূপ – যাতে বিত্ত নেই, বিলাস নেই। মানবিক মুক্তির আলোর দেখা পাওয়াও যেখানে কষ্টসাধ্য।

৫.৭ ইতিহাসের চরিত্র

রাধারমণ তাঁর স্বপ্ন-বাস্তবতা, বিশ্বাস-সংস্কার কিংবা জীবন-দর্শনকে গানে পরিস্ফুট করেছেন। আমরা জেনেছি, তিনি সহজিয়া বৈষ্ণবদর্শনের অনুসারী ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ব্যাপক প্রভাব তাঁর পদে লক্ষণীয়। ফলে বৈষ্ণব দর্শন এবং ধর্ম যাঁদেরকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে এবং বিস্তার লাভ করেছে, তাঁদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ভক্তি প্রকাশিত। কবির গানে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ের বাইরে 'শ্রীচৈতন্য' অন্যতম প্রধান বিষয়। 'পঞ্চতত্ত্ব' এবং গৌড়ীয় 'গোস্বামী'বৃন্দ প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর পদে স্থান করে নিয়েছেন। যাঁদের অনেকের নাম ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭.১ শ্রীচৈতন্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য[১](১৪৮৬-১৫৩৩) চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। কাটোয়ানিবাসী কেশব ভারতীর নিকট গমন করলে তিনি তাকে দীক্ষিত করে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম প্রদান করেন। পরে তিনি শ্রীচৈতন্য নামে খ্যাত হন। এসময় নানা স্থান থেকে ভক্তরা এসে জুটতে লাগল। অনেক দুষ্কৃতিকারী চৈতন্য এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে বৈষ্ণবমত গ্রহণ করে। এর পর চৈতন্য পরিব্রাজকের বেশে পথে বের হলেন। ১৫১০ সালের দিকে অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দের ওপর বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পুরীধামে গমন করলেন। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষে তিনি পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল ভ্রমণ করলেন। পুরীতে ফিরে তিনি বৃন্দাবন পরিক্রমায় বের হন। তার আগে তিনি গৌড়ে আসেন এবং এখানে মায়ের সাথে শেষবারের মতো দেখা হয়। এর পর তিনি আর বাংলায় ফিরে আসেননি। চৈতন্যের সন্ন্যাস-অবলম্বন বিষয়ে রাধারমণের পদে মায়ের বেদনা-আক্রান্ত হাহাকার :

নিমের তলে থাকরে নিমাই নিমের মালা গলে
মা বলিয়া কে ডাকিবে *বিয়ানে বিয়ালে* রে।
হইয়া যদি মরতায় রে নিমাই না পাইতাম কোলে
দুইচার দিন কান্দা মায়ে পাশরিতাম মনেরে ॥
ভাগবুদ্ধি বড়রে নিমাই পণ্ডিত হইলায় বড়
সংসার বুঝাইতে পার মা ও কেন ছাড়রে নিমাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১১)

'বিয়ানে বিয়ালে'(সকালে বিকালে) কে মা বলে ডাকবে – মায়ের এই আক্ষেপের পাশাপাশি পদটিতে চৈতন্যের পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি এবং সমাজে তাঁর জ্ঞানী হিসেবে পরিচিতির উল্লেখ রয়েছে।

---

১. শ্রীচৈতন্য ভাগীরথী তীরবর্তী নবদ্বীপ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। বৈদিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্র সিলেটের জয়পুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যার্জনের জন্য তিনি নবদ্বীপে গমন করেন এবং সেখানে বসবাস করেন। নবদ্বীপ গমনের পূর্বে কিংবা পরে নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়; এবং নবদ্বীপেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। শ্রীচৈতন্যের পিতাপ্রদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। শচীদেবীর সন্তান শৈশবে মারা যেতো বলে কুলমহিলাগণ চৈতন্যকে নিমাই বলে ডাকত – গৌরবর্ণ গায়ের রঙের কারণে প্রতিবেশীরা ডাকত গৌর, গৌরাঙ্গ বা গোরা। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্য নামে খ্যাত হন। ভক্তরা তাঁকে মহাপ্রভু নামে ডাকে।

চৈতন্য শৈশবে দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। শৈশবে তার জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ করা যায়। অগ্রজ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বিধায় তার পিতা অনেকদিন তাকে পাঠশালায় পাঠাতে সম্মত ছিলেন না। পরে পুত্রের অধিক আগ্রহের কারণে তাকে পাঠশালায় পাঠানো হলো। কৈশোরেই তিনি নিমাই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তরুণ বয়সে তিনি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে আরম্ভ করেন এবং এতে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে – পূর্ববঙ্গ থেকেও তাঁর নিকট ছাত্র পড়তে যেতো। পনের

চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের এবং নিত্যানন্দ বলরামের অবতার – বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে এ ধারণা প্রচলিত ছিল। এরই প্রকাশ দেখি আমরা রাধারমণের গানে :

অবনীতে উদয় নদীয়াতে গউর নিতাই
পাপী নিস্তারিতে অবতীর্ণ দুটি ভাই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১০৭)

চৈতন্যের ধরাধামে আগমন নিয়ে পদ :

সোনার মানুষ উদয় হইল গো নদীয়া পুরে
স্বয়ং মানুষ উদয় হইল শচীরাণীর ঘরে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৯)

৫.৭.২ চৈতন্যের অনুচরদের কয়েকজন

রাধারমণের পদে চৈতন্যের প্রতি ভক্তি ও কীর্তনের প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর অনুচর-পরিকরদের নাম। চৈতন্য মাত্র আটচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। এরমধ্যে শেষ বারো বছর তিনি প্রায় বাহ্যজ্ঞান রহিত ছিলেন। তিনি কোনো গ্রন্থও লিখে যাননি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করেছিলেন তাঁর অনুসারীদের কেউ কেউ। চৈতন্যের ধর্মমত এবং সাধনার আদর্শ বিশেষভাবে প্রচার করেছিলেন তাঁর অনুচর-পরিকরের দল (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ : ৮০)। রাধারমণের পদে এঁদের অনেকেরই উপস্থিতি আমরা লক্ষ

বছর বয়সে তিনি স্বনির্বাচিত কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই সাপের দংশনে বালিকাপত্নীর মৃত্যু হয়। গৌরাঙ্গ তখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে মায়ের পীড়াপীড়িতে তিনি পুনর্বার বিয়ে করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।

এসময় নবদ্বীপে বৈষ্ণবধর্মের জাগরণ আরম্ভ হয় এবং নিমাই পণ্ডিতের জীবনেও ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ঢেউ এসে লেগে থাকবে। তেইশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃপিণ্ড দিতে গয়ায় গমন করেন। সেখানে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত ঈশ্বরপুরীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সহসা তাঁর মধ্যে ভাবান্তর দেখা দেয় এবং তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট 'দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র' গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণভক্ত হয়ে ওঠেন। শেষে ভক্তিভাবে উন্মত্ত হয়ে তিনি গৃহে ফিরলেন এবং অধ্যাপনা ইত্যাদির কাজ ত্যাগ করলেন। এসময় তাঁর সাথে শান্তিপুরনিবাসী অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দ নামক সন্ন্যাসীর পরিচয় ঘটে। নবদ্বীপবাসী চৈতন্যকে কৃষ্ণের এবং নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। নগরের পথে পথে ভক্তগণ নামকীর্তন করে বেড়াতে আরম্ভ করে। অবৈষ্ণবদের দ্বারা প্রবল প্রতিরোধের মুখেও চৈতন্য নামকীর্তন চালিয়ে যান। ক্রমে মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা এবং শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। চৈতন্য ১৫১৫ সালে বৃন্দাবন পরিভ্রমণ শেষে পুনরায় পুরীতে ফিরে আসেন; এবং আমৃত্যু এখানেই অবস্থান করেন। জীবনের শেষকটি বৎসর দিব্যোন্মত্ততায় অতিবাহিত হয়। ১৫৩৩ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। (সুকুমার সেন ১৯৯৩ : ২২৮-২৩৫, নীলরতন সেন ২০০০ : ১৩-৩৭, গোপাল হালদার ২০০৭ : ৫৭-৫৮, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-১১ : ১২৬-১৩৬, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২ : ১৬৪-১৭৬)

করি। যেমন :

চলছে হরি নামের গাড়ী
আয় কে যাবি বৃন্দাবন
দীক্ষা শিক্ষা মহাবলী
পথে তিনটা ইস্টিশন।
প্রথম টিকনা নৈদাপুরী
স্টেশন মাস্টার গৌরহরি
নিতাই অদ্বৈত সহায়কারী
নামের গাড়ীর মহাজন।
হরিদাসের চৌকিদারী সাতপণ দণ্ড
টাইম নিরূপণ
...
গাড়ী পলকে গোলোকে চলে
কালের কোঠায় রূপ সনাতন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৫৮)

এখানে ভাববৃন্দাবনে যাওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন কবি। এতে চৈতন্যের অনুচরদের কয়েকজনের নাম প্রকাশিত : নিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস, রূপ, সনাতন। আমরা তাঁদের পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরছি :

নিত্যানন্দ :

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ দাস। চৈতন্য সন্ন্যাস-অবলম্বন করে নীলাচলে চলে যাওয়ার পরে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য।

নিত্যানন্দ বীরভূম জেলার একচাকা-খলপপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়সে চৈতন্যের প্রায় দশ বছরের বড় ছিলেন এবং চৈতন্যের মৃত্যুর আটদশ বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। নিত্যানন্দ পিতামাতার একমাত্র সন্তান। দেবলীলা ও নাট্যগানে অনুরক্ত নিতাই কৈশোরেই এক যোগীর সঙ্গে ঘরছাড়া হন এবং তান্ত্রিক-যোগী সাধুদের সঙ্গলোভে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান। ঘুরতে ঘুরতেই তাঁর নবদ্বীপে আগমন এবং চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দেখতে এবং বয়সে চৈতন্যের বড়ভাই বিশ্বম্ভরের সাথে তাঁর অনেকটা মিল ছিল। তাঁকে পেয়ে চৈতন্যের মাতা শচীদেবী কোলে টেনে নিলেন। তাঁর স্বভাব এবং আচরণ পৌরাণিক বলরামের মতো নিরঙ্কুশ ও সরল ছিল। ফলে বৈষ্ণব সমাজে তিনি বলরামের অবতার রূপে স্বীকৃত হলেন। (সুকুমার সেন ১৯৯৩ : ২৩৫-৩৬, আহমদ শরীফ ২০০৮ : ৩৯-৪০, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২ : ৪২-৪৩, রবীন্দ্রনাথ মাইতি [তা.বি.] : ৫২-১০৮)

অদ্বৈতাচার্য :

অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যের প্রধান পারিষদদের একজন। তিনি বয়সে চৈতন্যের চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ বছরের বড় এবং চৈতন্যের মৃত্যুর পরে প্রায় সতের-আঠার বছর জীবিত ছিলেন। অদ্বৈত শ্রীহট্টের লাউড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৈশোরে শান্তিপুরে চলে আসেন। তিনি ছিলেন গৃহী বৈষ্ণব এবং পেশায় টোলের পণ্ডিত। অদ্বৈত মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন এবং চৈতন্যের জন্মের পূর্বেই শ্রীবাস-অঙ্গনে নামকীর্তনের নেতৃত্ব দিতেন।

অদ্বৈতাচার্য প্রথম প্রকাশ্যে চৈতন্যকে নারায়ণের অবতার বলে প্রচার এবং পূজা করেছিলেন। চৈতন্য যদিও তা পছন্দ করেননি। কিন্তু জনসাধারণের সমর্থন থাকায় তিনি দৃঢ় প্রতিবাদ করতে পারেননি। পরবর্তীতে বৈষ্ণব সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেলে একটি শাখার নেতৃত্ব প্রদান করেন অদ্বৈত এবং সীতাদেবী। পরে তাঁদের সন্তানেরা অদ্বৈতপন্থী বৈষ্ণব শাখার সম্প্রসারণে নেতৃত্ব প্রদান করেন। (সুকুমার সেন ১৯৯৩ : ২৩৫-৩৭, আহমদ শরীফ ২০০৮ : ৩৮-৩৯, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২ : ৪৩-৪৪, রবীন্দ্রনাথ মাইতি [তা.বি.] : ১৪৮-১৫৭)

হরিদাস :

হরিদাস চৈতন্যের অন্যতম পারিষদ। যশোহর জেলার বুঢ়ণ পরগনার ভাটকলাগাছি গ্রামে হরিদাসের নিবাস। তিনি হিন্দুর সন্তান ছিলেন এবং পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় মুসলমানের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম মনোহর, মাতা উজ্জ্বলা। তিনি হরিদাস ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে চৈতন্য বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব নিয়ে নবদ্বীপে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারের ভার নিত্যানন্দ এবং যবন হরিদাসকে দিয়েছিলেন। স্বধর্মত্যাগের অপরাধে স্থানীয় প্রশাসক কর্তৃক তিনি লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। চৈতন্য তাঁর উচ্ছিষ্ট খেয়ে তাঁকে বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী ছিলেন তিনি। চৈতন্যের মৃত্যুর কয়েকমাস আগে তাঁর মৃত্যু হয় এবং চৈতন্য নিজে তাঁকে সমুদ্রসৈকতে সমাহিত করেন। (নীলরতন সেন ২০০০ : ৩০, আহমদ শরীফ ২০০৮ : ৩৯, রবীন্দ্রনাথ মাইতি [তা.বি.] : ১৪৮-১৫৭)

ছয় গোস্বামী এবং অন্যান্য :

শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথাকে দার্শনিক রূপ দিতে চাইলেন। 'বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন রচনা করতে' তিনি ছয়জন গোস্বামীকে দায়িত্ব দিলেন। গোস্বামীবৃন্দ হলেন : সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস। রাধারমণের পদে ছয় গোস্বামীর প্রসঙ্গ উল্লেখিত :

১. মনরে হরিনাম প্রভুর মর্ম
ধন্য কলিকালে ছয় গোস্বামীর ধর্ম
তারা হইয়ে জিতে মরা সাধিয়া গেছে অধর ধরা
রসিকের করণ বিষয় জীবন ডুইবে থাকা অভিরাম ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১০১)

২. হুংকার গর্জন ধ্বনি শুনিয়ে কাঁপে মেদিনী
ধন্য চৈতন্য আনিল।
স্বরূপাদি রঘুনাথ প্রভুর যে প্রিয় পাত্র
সঙ্গে করি নামিয়ে আনিল।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৮-১৯)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাধারমণের গুরু রঘুনাথ এবং ষড়গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ এক ব্যক্তি নন। রাধারমণের গুরু রঘুনাথ ঊনবিংশ শতকে জীবিত ছিলেন।

আমরা রাধারমণের পদে নিবাস আচার্যের উল্লেখ পাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নাম এবং মহিমা উল্লেখ করতে গিয়ে কবির পদে শ্রীনিবাসের উল্লেখ :

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র বলরাম নিত্যানন্দ
মহাদেব দ্বৈত অবতার ॥
ব্রহ্মা হৈল হরিদাস নারদ মুনি শ্রীনিবাস
যত প্রিয় ভক্তবৃন্দ আর।
অতিদীন অকিঞ্চন কহে শ্রীরাধারমণ
নিজগুণে কর মোরে পার ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১২৫)

বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে শ্রীনিবাস আচার্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা ব্রজমণ্ডলে গিয়ে গোস্বামীদের নিকট হতে বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে এদেশে প্রচার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান তিনজনের অন্যতম শ্রীনিবাস। 'ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের বাংলাদেশে বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে শ্রীনিবাস সবচেয়ে শক্তিশালী' (সত্যবতী গিরি ২০০৭ : ৩৪৬)।

রায় রামানন্দ চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমতত্ত্বের ভাষ্যকার। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি গঠনে রামানন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাধারমণের পদে রামানন্দের উল্লেখ :

ভজ ও মন প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
অবধূত নিত্যানন্দ রায় ॥
ভজ অদ্বৈত শ্রীবাস প্রিয় গদাধর দাস

শ্রীনিবাস রামানন্দ রায়।
অনর্পিত প্রেমবারি সিঞ্চিল জগৎভরি
রাধাপ্রেমে অবনী ভাসায় ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৩৭)

রাধারমণের পদে স্বরূপ দামোদর 'স্বরূপ' নামে প্রকাশিত। অপরাপর পারিষদ-পরিকরদের সাথে তাঁর নাম লিখিত হলেও কিছুপদে রামানন্দের সাথে তাঁর নাম একসাথে উল্লেখিত হয়েছে। দুজনই নীলাচলে চৈতন্যের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। রাধারমণের পদ :

জয় প্রভু নিত্যানন্দ বড়ই বদান্য
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র বৈষ্ণবের গণ্য ॥
স্বরূপ রামানন্দ শ্রীরূপ সনাতন
সঙ্কীর্তন যজ্ঞারম্ভে কর আগমন ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৩২)

স্বরূপ দামোদর চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গদের একজন। তিনি বৈষ্ণবতত্ত্বেরে আদি ভাষ্যকারদের অন্যতম। তাঁর অপর নাম পুরুষোত্তম আচার্য। স্বরূপের পিতৃভূমি ময়মনসিংহ জেলার ভিটাদিয়া গ্রাম। পূর্ববঙ্গ সফরকালে চৈতন্য এই গ্রামে এসেছিলেন। ইনি চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী, পরে প্রেমধর্মে আকৃষ্ট হন এবং পুরুষোত্তম নাম ছেড়ে 'স্বরূপ দামোদর' নাম গ্রহণ করেন। স্বরূপ বৈষ্ণবধর্মের আদি ভাষ্যকারদের অন্যতম। সুকবি, সুকণ্ঠ স্বরূপ কীর্তনে-নর্তনে চৈতন্যের সহযোগী ছিলেন এবং তিনি চৈতন্যলীলার অন্যতম তত্ত্বজ্ঞ। (আহমদ শরীফ ২০০৮ : ৪০, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২ : ৪১-৪২, রবীন্দ্রনাথ মাইতি [তা.বি.] ২৫৬-২৬৭)

বৈষ্ণবসমাজের 'পঞ্চতত্ত্বে'র অন্যতম শ্রীবাস। অন্যরা হলেন – শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য এবং গদাধর। শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধুস্থানীয়। ফলে চৈতন্যের নিকট তিনি বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন। বৈষ্ণবমতানুসারীরা শ্রীবাসকে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকের অভিমত – শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন নর রূপে নারদের অবতার। শ্রীবাস অদ্বৈতের সাথে শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং-ভগবান বলে প্রচার করেন (রবীন্দ্রনাথ মাইতি [তা.বি.] : ১০৯-১২০)।

রাধারমণের পদে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সংকীর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায় :

শুনে নামের ধ্বনি সুরধনী উজান চলিয়াছে
প্রেম মহাজন নিত্যানন্দ প্রেমের জাতক ভক্তবৃন্দ
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ আনন্দে মেতেছে।
শ্রীবাসের আঙিনায় বেচাকিনি লেগেছে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭.৩ রাধারমণের গুরু : রঘুনাথ ভট্টাচার্য

রাধারমণের গুরু রঘুনাথ ভট্টাচার্য। লোককবির বেশকিছু পদের ভণিতায় ভক্তিসহকারে তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে। তাঁকে গুরু হিসেবেই তিনি বন্দনা করেছেন। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, সাধন-ভজনে অমনোযোগের স্বীকৃতি জানিয়ে গুরুর পদে আশ্রয় প্রার্থনাও আমরা দেখি কোনো কোনো পদে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. প্রভু রঘুনাথ রসের গুরু মনবাঞ্ছার কল্পতরু
রাধারমণ বলে দয়াল গুরুর চরণ কমল সার করিয়াছি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৩৭)

খ. প্রভু রঘুনাথ প্রেম কারিগর রসের নদী বহে নিরন্তর
রাধারমণ প্রেমের কাতর ডুইবে না পাই কিনারা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬০)

গ. রঘুনাথ পদধূলি মস্তকে ভূষণ।
নামকীর্তন গায় শ্রীরাধারমণ ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৩২)

শ্রীহট্ট-প্রতিভায় রঘুনাথ ভট্টাচার্যের যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ইটাপরগণার নন্দীউড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ বিদ্যাবিনোদ বংশে রঘুনাথের জন্ম। ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন হয়ে এক নিকটাত্মীয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। গ্রাম্য টোলে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং অলংকার ও তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। বাল্যাবধি তিনি হরিভক্ত ছিলেন। পরে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু হৃদয়ের বদ্ধমূল ভাব মন থেকে দূর হলো না। তিনি পুঁথিপত্র নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন; এবং মনু নদীর তীরে ঢেউপাশা গ্রামে (বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলা) এক গৃহস্থের বাড়িতে বিদ্যার্থী হিসেবে আশ্রয়প্রাপ্ত হলেন। এখানে সহজিয়া শ্যামকিশোর অধিকারীর সাথে তাঁর পরিচয় হলে সহজধর্ম সম্বন্ধে তিনি কিছুটা অবগত হন। ফলে শাক্ত এবং সহজ মতে কিছুটা সাদৃশ্য দেখে শ্যামকিশোরের উপদেশ মতো বৈদ্যরাজ তিলকচন্দ্র গুপ্তের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লাভ করেন; এবং প্রবল উৎসাহে বৈষ্ণবমত প্রচার করতে থাকেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। রঘুনাথ ১২৯৪ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ 'গোস্বামী' বলে অভিহিত হন। (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৬৯-১৭১)

রাধারমণের পদে চিত্রিত হয়েছে ধর্ম-ইতিহাসের চরিত্রদের লৌকিক-অলৌকিক কাহিনি, বৃত্তান্ত – তাঁদের কৃতিত্ব-মাহাত্ম্য। একই সাথে তিনি বর্ণনা করেছেন বাঙালি সমাজের সেসব মানুষের কথা, যাদের জীবন এবং জীবনসংগ্রামের ইতিহাস হাজার বছরের। কবির পদে তাদের জীবনের দিনলিপি, সন-তারিখের উল্লেখ হয়ত নেই, কিন্তু তাতে তাদের উপস্থিতিতে কোনো অস্পষ্টতা তৈরি হয় না। লোকজীবনের অকৃত্রিম রং নিয়ে মানুষ ও সমাজ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈষ্ণবপদ রচনায় রাধারমণের স্বকীয়তা

রাধারমণ (১৮৩৪-১৯১৫) উনিশ শতকের লোককবি। সহজিয়াবৈষ্ণব মতের অনুসারী এই কবির পদকে আমরা বৈষ্ণবপদাবলির ধারায় উপস্থাপন করেছি। পদাবলি সাহিত্যের হাজার বছরের প্রবহমানতায় জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রমুখের নাম শিল্প ও সাধনার বিশিষ্টতায় অনন্য হয়ে আছে। আমরা রাধারমণের রচনায় এইসব পূর্বসূরি বৈষ্ণব কবির প্রভাব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের উপস্থিতি লক্ষ করেছি; এবং তাঁর পদে সাধনতত্ত্ব ও সাহিত্যের যোগসূত্র আবিষ্কার করে তাঁকে 'সাধককবি'র অভিধায় চিহ্নিত করেছি।

৬.১ চৈতন্যোত্তর কাব্যের বিশিষ্টতার ধারক

শ্রীচৈতন্য ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন, পদাবলি সাহিত্যেও তদ্রূপ। পদাবলি সাহিত্যকে চৈতন্য-পূর্ব এবং চৈতন্যোত্তর – এই দুই ভাগে বিভাজন করা হয়। চৈতন্য-পরবর্তী সাহিত্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য। পদাবলির পালাকীর্তন বা সাধন-ভজনের সূচনা তাঁকে শরণ করেই করা হয়। রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য প্রেমধর্মের যে নতুন পরিচয় সমাজে প্রচার করলেন, তাতে বৈষ্ণব ধর্ম 'গৌড়ীয়' বিশেষণে পরিচিত হলো; শ্রীচৈতন্য অবতারের মর্যাদা লাভ করলেন। রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ধারণ করে গৌরাঙ্গ মর্ত্যে অবতরণ করলেন – এই মতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন তাঁর অনুসারীরা। ফলে বৈষ্ণব কবি বা পালাকার বা গায়ক চৈতন্যোত্তর কালে 'গৌরচন্দ্রিকা' রচনা করবেন – এটাই মহাজন-রীতি (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ : ৯৭)। উনিশ শতকের লোককবি রাধরমণের পদেও চৈতন্যোত্তর পদাবলির বৈশিষ্ট্য প্রত্যাশিত। কবির গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ সংখ্যায় প্রচুর। এর যুক্তিসঙ্গত কারণও অনুমান করা যায়। বৈষ্ণবের কবিতা বা গান মূলত কীর্তন (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৩২)। এই কীর্তন সাধনকার্যের অঙ্গ। ফলে সাধন-ভজনের নিমিত্তেই রাধারমণের বৈষ্ণবপদে গৌরাঙ্গ-পদের প্রাচুর্য।

চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গ-পদ রচনায় শ্রেষ্ঠ কবি। কবিরঞ্জন, রায়শেখর, জ্ঞানদাস, লোচন দাস প্রমুখ কবির রচনায় গৌরাঙ্গ-পদ শিল্পমণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠলেও গোবিন্দদাসে তা ভাব ও রসের যথার্থ মিলন ঘটেছে – যা বৈষ্ণব-শাস্ত্র অনুমোদিত এবং শিল্প-উত্তীর্ণ। ফলে গোবিন্দদাসের কবিতা একদিকে যেমন কারুকার্যময় স্থাপত্যের মতো বাহ্যিক সৌন্দর্যে দীপ্যমান, তেমনি তাঁর কাব্যের ভাবদেহের সৌন্দর্যও সমান সম্মানের দাবি রাখে। (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৯৯৭ : ১১৭-১৮)

রাধারমণের পদের বিশিষ্টতা হলো, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে স্থাপত্যধর্মিতার অনুপস্থিতি। ভাবকে কারুকার্যময় করে প্রকাশের চেয়ে নিরাভরণ-সরল ভাষায় প্রকাশেই তাঁর মনোযোগ। ভাবের আধিক্যে ভাষা যেন ভেসে যায় :

রাধাপ্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে ॥
নদীয়াপুরি ডুবু ডুবু শান্তিপুর ভাসিয়াছে।
গৌরাঙ্গ প্রেম সিন্ধু মাঝে ভাবের বন্যা লাগিয়াছে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৬)

এই 'ভাবের বন্যা' বয়ে যাওয়ার কারণ গৌরাঙ্গের অপরূপ রূপকান্তি। এই রূপ যার নয়নে একবার তার সৌন্দর্যের মায়া বিস্তার করে, তাকে আর 'পাশরা' যায় না :

ক. সুরধুনীর কিনারায় কি হেরিলাম নাগরীগো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়।
সুন্দর কপালে সুন্দর তিলক সুন্দর নামাবলী গায় ॥
সুন্দর নয়নে চাহে যার পানে
দেহ হইতে প্রাণটি লইয়া যায় ॥
যখন গৌরায় গান করে নৈদাবাসীর ঘরে ঘরে
গৌরা প্রেমবশে রাধার গুণ গায় ॥
না জানি কোন রসে ভাসে একবার কান্দে একবার হাসে
পূর্ণশশী উদয় নদীয়ায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে একবার আইনে দেখাও তারে
আমি জন্মের মতো বিকাই রাঙা পায় ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৪)

খ. সোনার মানুষ উদয় হইল গো নদীয়া পুরে
স্বয়ং মানুষ উদয় হইল শচীরাণীর ঘরে।
রসময় রসিক নইলে কে বুঝিতে পারে
রসে মাখা গৌরচান্দ হালিয়া ঢলিয়া পড়ে।
ভাইবে রাধারমণ বলে পাইতাম যদি তারে
যত্ন করি রাইখা দিতাম হৃদয় মাঝারে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১৯)

উপর্যুক্ত পদযুগলে শ্রীচৈতন্যের গৌরকান্তি, প্রেমময় সত্তার চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে। যদিও নাগরিক কবির ভাষার চমৎকারিত্ব বা কারুকার্যের সূক্ষ্ম পরিশীলন তাতে নেই। তবু 'পূর্ণশশী','সোনার মানুষ' গৌরাঙ্গের রূপ তাতে

গোপন থাকে না। বরং চাঁদের কোমল আলোর মতোই তা শিল্পের রং ছড়ায়। 'সুন্দরের' যে ভাষিক প্রতিমা রাধারমণ তৈরি করতে চেয়েছেন, তা প্রেমরূপময় হয়ে ওঠে তাঁর পদে।

গোবিন্দদাসের পদে আমরা শ্রীচৈতন্যের কল্পতরুসম মূর্তি প্রত্যক্ষ করি। সকলেই তা থেকে বাঞ্ছাপূরণে ব্যস্ত। বঞ্চিত কেবল গোবিন্দদাস :

অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহ দূর ॥
(গোবিন্দদাস ১৯৯৮ : ৩)

তবে গোবিন্দদাসের বঞ্চনার আক্ষেপ রাধারমণে ততটা নেই। নিজেকে গৌরার 'রাঙাপায়' বিলিয়ে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা তাকে হৃদয়ে স্থান দেয়ার মনোবাঞ্ছা নিয়ে রাধারমণ উৎসাহিত। বঞ্চনার অনুভূতি তাঁর আছে, তবে গৌরার নাম বিনে যে তাঁর অন্য উপায় নেই। কেননা, রাধা-কৃষ্ণ 'দুই অঙ্গে একাঙ্গ' হয়ে গৌরাঙ্গ অবতার রূপে বিরাজমান।

৬.২ আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভাষা

বাংলা লোকসাহিত্যে বৈষ্ণব-ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রাধারমণ। সিলেট অঞ্চলে তাঁর জনপ্রিয়তা শিখরস্পর্শী। মৃত্যুর প্রায় একশত বছর পরেও জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রচার মাধ্যমসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানে রাধারমণের বৈষ্ণব-গানের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে প্রমাণ করে। সিলেট অঞ্চলে তাঁর পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব কবি দীন ভবানন্দ প্রমুখ – কিংবা, রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা নিয়ে আরও যেসকল পূর্বসূরি কবি পদরচনা করেছেন – সৈয়দ শাহনূর, শিতালং শাহ, কালাশাহ প্রমুখ – তাঁদের কারও রচনায় রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে খণ্ডিতভাবে, কারও রচনা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। কিন্তু রাধারমণ সিলেট অঞ্চলে অতি পরিচিত এবং নিত্য উচ্চারিত নাম। তাঁর গান বিষয় এবং ভাষার নৈকট্যে লোকমানুষের অন্তরে ঠাঁই করে নিয়েছে।

রাধারমণের পদে সিলেট অঞ্চলের উপভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে জাতীয় ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষার সার্থক ব্যবহার তাঁর রচনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। দুএকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায় :

ক. আইলায় নারে শ্যামরসময় রসের বিনোদিয়া
অভাগিনী চাইয়া রইছে পন্থ নিরখিয়া।
চাইতে চাইতে কমলিনীর দিনতো গেল গইয়া
আগে যদি জানিতাম যাইবায় রে ছাড়িয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১১)

এখানে, সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় 'আইলায়,' 'যাইবায়' – পদদুটি আসা এবং যাওয়া ক্রিয়াপদের মধ্যম পুরুষের অতীত কালের রূপ (মুহম্মদ আসাদ্দর আলী ১৯৯৮: ৯৭)। 'গইয়া' শব্দের অর্থ অতিবাহিত হওয়া।

খ. দেশ খেশ সব বাদী সব হইল পর
তোর পিছে ঘুরি ঘুরি জনম গেল মোর রে।
ভাইবে রাধারমণ বলে বন্ধু নয় আপনা
নইলে এমন দুক্ষ কেনে সোনাবন্ধে বুঝে না রে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৭৮)

এখানে, 'খেশ' শব্দের অর্থ আত্মীয়, 'ঘুরি ঘুরি' ঘুরে ঘুরে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শেষ চরণে 'কেনে' শব্দটি 'কেন'-এর আঞ্চলিক রূপ। তবে উপর্যুক্ত শব্দগুলোর উচ্চারণ – বিশেষ করে 'ক'-ধ্বনির উচ্চারণ প্রমিত উচ্চারণের অনুরূপ নয়। 'সিলেটি' উপভাষায় 'ক'-ধ্বনির রয়েছে নিজস্ব উচ্চারণরীতি। 'ক'-ধ্বনির উচ্চারণ জর্মন bach-এর ch এবং স্কচ loch (lake)-এর ch-এর মতো। তেমনি 'খ'-ধ্বনি সিলেটিতে মহাপ্রাণ নয়, এটি আরবি-ফার্সি *খে*-এর মতো (সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৯৮ : ১৭১)।

গ. কে যাবে শ্যাম দর্শনেতে অ সজনি।
মোহনমধুর স্বরে হইয়াছি গো উন্মাদিনী ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৫)

এখানে,'অ সজনি' শব্দযুগলে 'অ' ধ্বনি 'ও' বা 'ওগো' সম্বোধন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সিলেটিতে সম্বোধনে 'অ' ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়। যদিও লোককবির সকল গানে এই উচ্চারণ রক্ষিত হয়েছে– এমন নয়। কবিতার ভাষাকে প্রমিতকরণের চেষ্টা লক্ষ করার মতো। সংগ্রাহকের এবং গায়কের 'ভাষা-সচেতনতা'ই হয়ত এর প্রধান কারণ।

সিলেটি ভাষায় 'ও' ধ্বনি নেই বলে সিলেটের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী মনে করেন (সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৯৮ : ১৭১)। যদিও এবিষয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। তবে সাধারণত সিলেটের উপভাষায় 'ও'-ধ্বনি 'উ'-ধ্বনিতে পরিণত হয়। রাধারমণের পদে আমরা এই বৈশিষ্ট্যের সার্থক উপস্থিতি লক্ষ করি। যেমন :

ঘ. বন্ধে মরে ভির্ন্ন বাসে কি দুষ জানিয়া
লুকের কাছে কইনা লাজে থাকি মনে সইয়া ॥
বন্ধে মরে ছাইড়া গেল প্রেম ফান্দে ঠেকাইয়া
সকি গো ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬২)

এখানে, 'দুষ', 'লুক', 'মরে' (মোরে) শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

সিলেটি রূপমূলে কোথাও কোথাও ব্যঞ্জনের দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপ পায় (নূর-ই-ইসলাম সেলু বাসিত ২০০৮ : ১২০)। যেমন : রসুন > রউন; দেবর > দেঅর প্রভৃতি।
রাধারমণের পদেও এই বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন :

ঙ. নিমের তলে থাকরে নিমাই নিমের মালা গলে
মা বলিয়া কে ডাকিব বিয়ানে বিয়ালে রে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১১১)

এখানে 'বিহান' এবং 'বিকাল' শব্দের আঞ্চলিক রূপ 'বিয়ান' ও 'বিয়াল'। এতে 'হ' এবং 'ক' ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে।

রাধারমণ ভাবকে সাধন-ভজনের উপযোগী করে প্রকাশ করতেই হয়ত আঞ্চলিক শব্দ বা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কবিতায় বা গানে আঞ্চলিক ভাষার এই ব্যবহার লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

৬.৩ চরিত্রচিত্রণ : রাধা ও কৃষ্ণ

অভিজ্ঞতার নিগূঢ় নির্যাস এবং কল্পনার বর্ণিল রং – এ দুইয়ের অনিবার্য মিশেলে তৈরি হয় শিল্প। সাহিত্যের ভাষিক প্রতিমা বা চরিত্রের নিটোল নির্মাণে কবি বা সাহিত্যিক অতীতের অভিজ্ঞতার যেমন মূল্য প্রদান করেন, তেমনি নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি-চিন্তার প্রতিও সহানুভূতিপ্রবণ হন। বৈষ্ণব-পদাবলির চরিত্র-নির্মাণে রাধারমণের পদে আমরা তেমন ভাবনার প্রতিফলনই লক্ষ করি। রাধাচরিত্র নির্মাণে পদাবলির কবিদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে চৈতন্যোত্তর অসংখ্য কবি রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা নিয়ে কাব্যরচনা করেছেন; এবং রাধাকৃষ্ণ চরিত্র নতুন অলংকারে সজ্জিত করে উপস্থাপন করেছেন। ফলে চরিত্রগুলো কবির দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা নিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

অপ্রাকৃত লীলাকথা এবং প্রাকৃত প্রেমগাথার নায়িকা রাধার চরিত্র-চিত্রণে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কবি বিদ্যাপতি। তিনি 'রাধাচরিত্রকে অল্পে অল্পে মুকুলিত' করেছেন। তাঁর রাধা 'নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না, দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল।...লজ্জায় ভয়ে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে' ভেবে পায় না (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১১ : ৫৪৫)। শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করতে কতই-না দ্বিধা – ভয়-লজ্জায় আড়ষ্ট রাধা :

শৈশব যৌবন দরশন ভেল
দুই দল বলে দন্দ পরি গেল।
কবহু বান্ধএ কচ কবহু বিথারি
কবহু ঝাঁপএ অঙ্গ কবহু উঘারি।
(বিদ্যাপতি ১৯৯৮ : ২৩)

বিদ্যাপতির পদে যৌবনাবেগপ্রাপ্ত রাধার রূপও পরিদৃষ্ট। যেখানে যৌবনের সৌন্দর্য নিয়ে শরীরের বিভায় উজ্জ্বল রাধার পরিচয় আমরা বিদ্যাপতির পদে লাভ করি। তেমনি চৈতন্য-পরবর্তী কবি গোবিন্দদাসের পদেও রাধা তার শরীরের সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত। 'অঙ্গ-তরঙ্গিনী' রাধা 'তনু' দেহ নিয়ে জ্যোতির্ময় :

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ॥
(গোবিন্দদাস ১৯৯৮ : ৩২)

রাধারমণ রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথার বর্ণনায় রাধাচরিত্র অঙ্কন করেছেন; এবং প্রায় প্রতিটি পদেই রাধা উপস্থিত – প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে। তবে বিদ্যাপতির রাধার মতো এ রাধার বয়সের ক্রমবিকাশ নেই। শৈশব নেই, শৈশব-যৌবনের দ্বিধা-কম্পিত আড়ষ্ট সময়ের চিত্র নেই। এমনকি প্রথম যৌবনের প্রেমমুগ্ধ যুবতীর পরিচয়ও তাঁর পদে অনুপস্থিত। এ রাধা অভিজ্ঞ। পূর্বরাগ দিয়েই রাধার চরিত্র অঙ্কন করতে সচেষ্ট হয়েছেন কবি। কৃষ্ণের রূপগুণের দর্শনে-শ্রবণে মুগ্ধ রাধাকে বর্ণনা করতে গিয়ে তার অপরূপ রূপের কথা কবি বিস্মৃত হয়েছেন – একথা কি বলা যায়? কবি কি ধরেই নিয়েছেন, বাঙালি শ্রোতা বা পাঠক রাধার রূপের সাথে পরিচিত, রাধার নামের সাথেই তার 'আরাধনা'-মূর্তি এবং রূপের রহস্য লুকিয়ে আছে? হয়ত তাই। আমরা তাঁর দুএকটি পদে রাধার রূপের যে ইঙ্গিতপ্রাপ্ত হই, তাতে প্রতীয়মান হয় – কম কথা বলেই যেন কবি অনেক কথা বর্ণনা করতে চান। কিংবা, বলা যায়, রাধার বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি কবির মনোযোগ নিতান্ত কম। তবুও কৃষ্ণ কাউকে দেখে মুগ্ধ হয়, তার তো কোনো কারণ থাকতে হবে – হোক তা প্রাকৃত প্রেম কিংবা অপ্রাকৃত লীলাকথা। রাধারমণের পদ :

ক. জন্মের মত দিয়া ফাঁকি উড়ে গেল রাধাপাখী
সুবলরে – কলসী লইয়া কাঁখে আড় নয়নে ঘোমটা টেনে
জল আনতে যায় বিধুমুখী,
আসার আশে আর কতদিন পন্থপানে চেয়ে থাকি।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৮১)

খ. আমি চৌদিকে অন্ধকার দেখিরে সুবল
যে দিকে নয়ন ফিরাই
সুবল রে রাধা ছাড়া বৃন্দাবনে ব্রজের শোভা নাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২১)

গ. আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একারে সুবল সখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী একবার এনে দেখা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৪৫)

যে 'বিধুমুখী' আড়নয়নে জলের জন্যে যাচ্ছে, কবি তার কাঁখে কলসি দিয়ে মাথায় ঘোমটা পরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রাধার রূপ তাতে ঢাকা পড়েনি – বরং আরো প্রস্ফুটিত হয়ে বিচ্ছুরিত হয়েছে। রাধারমণ রাধার রূপ হয়ত ঢাকতে চানওনি। তবে রাধার শরীরী সৌন্দর্যের বিশদ বর্ণনাও কবি করেননি। কারণ, 'ব্রজেশ্বরী'র রূপ বর্ণনার বিষয় নয়, রূপের ঐশ্বর্য দেখা এবং মুগ্ধতার বিষয়। ফলে ব্রজের রানি ব্যতীত ব্রজ শোভাহারা হবে – কৃষ্ণের এ আকুতির ভেতর দিয়ে রাধার রূপ কি ফুটে ওঠে না? যদি না-ই হয়, তবে সেটিই রাধারমণের বিশেষত্ব। অল্পটুকু বর্ণনা – বাকিটুকু পাঠকের বা শ্রোতার দায়িত্ব। তিনি বলেন অল্প, বাকিটুকু পাঠকের কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নেন।

কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় কবি কিছুটা যত্নশীল – বলা যায় মনোযোগী। তবে বর্ণনার চেয়ে রূপমুগ্ধতার ছবি আঁকতেই যেন কবির বেশি আগ্রহ। রাধার রূপ অঙ্কনে তিনি যেমন কৃষ্ণের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন, তেমনি রাধার দৃষ্টিকোণ থেকে কবি কৃষ্ণের রূপ দেখেছেন। ফলে, রূপবর্ণনার চেয়ে রূপমুগ্ধতার চিত্রই রাধারমণের পদে প্রবল। বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের রূপের নিটোল বর্ণনা দিচ্ছেন:

ময়ুর পুছেঁ বান্ধিয়াঁ চূড়া
তাত কুসুমের মালা।
চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট
যেহ্ন চান্দ ষোল কলা ॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ১৯৯৮ : ১৩)

কবির নিজস্ব শিল্পদৃষ্টিই এই রূপবর্ণনার মূলে। রাধারমণের পদে এমন বর্ণনার চিত্র প্রায় নেই। কৃষ্ণকে তিনি রাধা হয়ে দেখেছেন। ফলে রাধার দৃষ্টিই যেন কবির দৃষ্টি:

ক. কি রূপ দেখছনি সজনী সই জলে ॥
এগো নন্দের সুন্দর চিকণ কালা থাকে তরুমূলে ॥
সজনী হাতে বাঁশি মাথে চূড়া ময়ূর পুচ্ছ হিলে
যেন মালতীর মালা শ্যাম অঙ্গে দোলে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৭)

খ. তরুমূলে শ্যামরূপ হেরিলাম তরুমূলে।
নবীন মেঘেতে যেন সৌদামিনী জ্বলে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭২)

কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় কবি হাতে বাঁশি এবং মাথায় চূড়ার কথা বারবার প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন। নবীন মেঘে বিদ্যুৎ চমকানো উৎপ্রেক্ষায় তিনি আঁকতে চেয়েছেন কৃষ্ণের কালো অথচ সুন্দর রূপ।

৬.৪ বাঁশির মোহনীয় রূপ

কালিনীর কূলে বাঁশির মোহিনী সুর শুনে চণ্ডীদাসের রাধার তনুমন আকুল-ব্যাকুল করে। রাধার গৃহস্থালির কাজের সময় বেছেই যেন নন্দের নন্দন কানু বাঁশি বাজায়। 'দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা' – রাধার প্রাণ উৎসর্গের এই ব্যাকুল বাসনার প্রকাশ বৈষ্ণব কবিদের প্রায় সকলের পদেই আমরা লক্ষ করি। জ্ঞানদাসের রাধা 'মুরলী' বাজানো শিখবে বলে কৃষ্ণের দ্বারস্থ হয়। বাঁশির রন্ধ্রে 'রাধাশ্যাম' দুটি নাম একত্রে বাজানোর কৌশল রপ্ত করে যুগলে :

রসের হিলোল উঠে দোঁহাকার গানে।
মোহিল সভার মন মুরলীর তানে ॥
(জ্ঞানদাস ২০১০ : ৪২৬)

জ্ঞানদাসের বাঁশি 'রোম্যান্টিক' এবং চণ্ডীদাসের বাঁশি 'প্রাণের শিকড় ছিড়িয়া অশক্ত অবশ দেহটিকে যাহা অভিরুচিমত নাচাইয়া ফেরে' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২০০৮ : ৮০)।

চণ্ডীদাসের মতোই রাধারমণের কৃষ্ণের বাঁশি বাজে অসময়ে – যখন গৃহকাজে নিযুক্ত রাধা; যখন শাশুড়ি-ননদি-গুরুজনবেষ্টিত থাকে গৃহে। দিনে-দুপুরে বাঁশি ডাকাত-ধর্ম পালন করে সর্বস্ব কাড়ে। অষ্ট আঙ্গুল বাঁশি যার 'ছেদা' (রন্ধ্র) শুধু রাধা বলে ডাকে। আর প্রথম সুরেই 'কালায় প্রাণটি নিল বাঁশিটি বাজাইয়া।' এর পর আর কী বাকি থাকে! ফলে রাজপন্থ দিয়ে যে নাগর বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে, তার সাথে কুলমান ত্যাগকরে সঙ্গী হওয়ার বাসনাতে অবাক হবার কিছু নেই। চণ্ডীদাসের রাধা কালার জন্য বনবাসী হতে চায়। কারণ 'কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী'। রাধারমণের রাধার জাতকুলও কালা এবং তার মোহন বাঁশির যৌথ প্রচেষ্টায় বন্দি :

পিরিতি বিষম জ্বালা সয়না আমার গায়
কুল নিল গো শ্যামের বাঁশি প্রাণ নিল কালায় ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৬)

অর্থাৎ, প্রাণ এবং কুল দুটোই বাঁশির নিকট যেন জিম্মি হয়ে আছে। কেননা, কালার বাঁশির এমন অভূতপূর্ব সুরের মোহিনী সর্বস্ব হরণ করা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু করতেই যেন অপারগ :

এমনতো শুনি নাই কখন বিষামৃত এমন মিলন
বাঁশি কালভুজঙ্গ যেমন দংশিল আমারে গো।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৪৫)

'বিষামৃত' পানে রাধার যে অনির্বচনীয় কুলত্যাগী অনুভূতি, তা কবিতার চরণ কিংবা কীর্তনীয়ার কণ্ঠ থেকে পাঠক-শ্রোতার সহৃদয় মর্মে প্রবিষ্ট না হয়ে পারে না। কৃষ্ণের এই বাঁশি রাধারমণের বৈষ্ণবপদে যেন স্বতন্ত্র সত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ফলে সুর-সৃষ্টি করতে গিয়ে কালার অধর-স্পর্শের আর প্রয়োজন পড়ে না। রাধার নাম ধরে বাঁশি নিজেই বেজে ওঠে। এজন্যেই, বাঁশির প্রতি রাধা তথা রাধারমণের আন্তরিক আহ্বান :

বাঁশি বিনয় করি তোরে –
নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না অবুলা রাধারে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১৪)

যে বাঁশি এমন প্রেমময় সুরে আদরে রাধা বলে ডাকে – যে বাঁশি প্রাণনাথের দোসর, তাকে পেলেও যেন প্রাণরক্ষা হয়। ফলে মথুরাগামী প্রেমাস্পদের বিদায়ে রাধার আর্তি মর্মস্পর্শী :

আর তোমার বাঁশির সুরে ভাটিয়াল নদী উজান ধরে রে
ও আমি যৌবত নারী, কেমনে রই পাসরি রে –
আরে ও প্রাণনাথ, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি ॥
...
কিবা মোরে সঙ্গে নেও কিবা মোরে বাঁশি দেও রে
ওরে, তোমার সঙ্গে বানাই নিবায় দাসী রে –
আরে ও প্রাণনাথ, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৮৯)

বাঁশির পদে সুরের যাদু-ধ্বনি যেন কবি যত্ন করে মেখে দিয়েছেন – পড়তে বা গাইতে গেলেই তা বেজে ওঠে, শ্রবণেন্দ্রিয় অধিকার করে নেয় এবং অন্তরে সম্মোহনের মায়া বিস্তার করে। ফলে প্রাকৃত কিংবা অপ্রাকৃত রাধার গৃহত্যাগের কারণ যে বাঁশির হৃদয়ভেদী টান, তার অস্তিত্বের গভীরতা অনায়াসে অনুভব করা যায়।

৬.৫ সখা বা সখী সম্বোধনে রাধারমণের পদ

Dhaka University Institutional Repository

বৈষ্ণব-পদাবলির রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথায় রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রের মতোই সখা বা সখী চরিত্র নিবিড়ভাবে অঙ্গীভূত হয়ে আছে। সখী ব্যতীত রাধা চরিত্রের বিকাশ বা প্রকাশ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি কৃষ্ণ চরিত্রও। আবার কৃষ্ণ চরিত্রের যথাযথ পরিস্ফুটনের জন্যেও শ্রীকৃষ্ণের সহচর চরিত্রের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য-পরবর্তী সকল বৈষ্ণব-কবির পদে সখীর চরিত্র নানাভাবে উপস্থিত রয়েছে। যদিও কবির বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং তা বাস্তবায়নের দক্ষতার ওপর চরিত্রের উপস্থাপন নির্ভরশীল। ফলে চৈতন্য-দর্শনের প্রভাবে চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের পদে সখী চরিত্রের উপস্থিতি হয়ে উঠেছে দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপনের উপায়রূপে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় এই প্রভাব অনুপস্থিত।

বৈষ্ণব-পদাবলিতে কবিদের মূল লক্ষ্য প্রেমতত্ত্বের উপস্থাপন। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'কে প্রেম বলা হয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু এক্ষেত্রে রাধা এবং তার সখীদের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> কৃষ্ণের সর্বাধিক প্রীতি মহাভাবময়ী রাধিকার সঙ্গে প্রেমে ও সঙ্গমে। সুতরাং সখীরা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা করিয়া কৃষ্ণকে অধিকতম সুখ দিতে রাধার সঙ্গে তাঁহার মিলনে সহায়তা করেন। সখীদের প্রত্যক্ষ দেহবাসনা সম্পূর্ণ উৎসাদিত; তাঁহারা কুঞ্জপথের দূতী, ফুলসজ্জার মালিনী, শয়ন-মন্দিরের প্রহরিণী এবং নিশিভোরের সুখসারী; তাঁহারা দুঃখশীতের অগ্নি-শুশ্রূষা এবং আনন্দ-বসন্তের কুঞ্জকোকিলা; কিন্তু কদাপি কামনার প্রতিদ্বন্দ্বিনী বা ঈর্ষার সর্পিণী নন। (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২০০৮ : ৮৩)

সখীদের কখনো 'কৃষ্ণসঙ্গসুখস্পৃহা' নেই। রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনেই তারা পরমানন্দ লাভ করে (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ২৩৮)। দেহবাসনা শূন্য সখীদের নিজ লীলায় মন নেই। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার লীলা করিয়েই সখীরা কামনাপরিতৃপ্তির চেয়ে 'কোটি'গুণ সুখ পায়।

রাধারমণের বৈষ্ণবপদে সখী চরিত্রের বিকাশ নেই; এবং তত্ত্বানুসারে, তাদের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার সুযোগ নেই। কেবল রাধাকৃষ্ণের মিলনে সহায়ক ভূমিকা পালনই যেন তাদের একমাত্র করণীয়। আলোচ্য বৈষ্ণবপদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংলাপধর্মিতা – চরিত্রের বর্ণনার চেয়ে চরিত্রের সরাসরি বক্তব্য। রাধা কিংবা কখনো কৃষ্ণের উক্তিতেই কবি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন – সিংহভাগ পদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। চণ্ডীদাস যেমন সখীকে উদ্দেশ্য করে গেয়ে ওঠেন – 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম', ঠিক তেমনি রাধারমণের পদে সখীকে মর্মের ব্যথা শোনানোর মাধ্যমেই রাধার ব্যথার কাহিনি পাঠক বা শ্রোতা শুনতে পায়। রাধার সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার সাক্ষী বা সমভাগী তার সখীরা। কালার বাঁশির মোহিনী রূপ যেমন সখীদের জানাতে হয়, তেমনি কৃষ্ণের অপরূপ রূপমাধুরীর বর্ণনাও তাদের না দিলে নয়। কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যায় :

ক. কি শুনি মধুর ধ্বনি গো সখী কি শুনি মধুর ধ্বনি
কোন না নাগরে ধরিয়া অধরে এমন অমৃত নাম।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৮)

খ. তরুতলে বাঁশি কে বাজায় গো সখী, জানিয়ে আয়।
বাঁশির রব শুনিয়ে গৃহে থাকা দায়।

(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৭২)

গ. বৃন্দে গো আয় গো বৃন্দে শ্যামকে দেখাও আনিয়া
মনপ্রাণ সদায় ঝুরে তাহার লাগিয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১০)

ঘ. আমার মরণকালে কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণনাম ললিতে গো
কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণনাম।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১)

ললিতা, বৃন্দা প্রমুখ সখীর নিকট সুখ-দুঃখের কথা বর্ণনা করে হয়ত রাধা তার সুখকে আরও প্রগাঢ়ভাবে উপভোগ করতে চাইছে; কিংবা, দুঃখকে ভাগ করে নিয়ে যাতনাকে সহনীয় করতে সচেষ্ট হচ্ছে। তবুও সমস্ত কথা যেন সখীদের বলতে চাচ্ছে না; বা হয়ত রাধার দুঃখের বিশালতা অনুধাবন করতে সখীরা সক্ষম নয়। তার পরও সখীদের উদ্দেশ্য করেই রাধার উক্তি :

ক. কারে দেখাব মনের দুঃখগো আমি বুক চিরিয়া
অন্তরে তুষেরই অনল জ্বলে গইয়া গইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬৬)

খ. চাতক রইলো মেঘের আশে তেমনি মতো রইলাম গো আমি
শ্যামচান্দের আশে গো সই আমি মনের দুক্ষ কার ঠাই কই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৮০)

ফলে রাধারমণের সখীরা রাধার কাছে থেকেও দূরে, আবার দূরে থেকেও যেন কাছের। বিচ্ছেদের অনল-দহন প্রেমিকসত্তার পক্ষেই কেবল অনুধাবন সম্ভব। সম্পূর্ণটা না বুঝলেও রাধার মর্মযাতনার উপলব্ধিতে সখীই শেষ ভরসা।

রাধারমণের পদে প্রিয় বা সখা চরিত্রও ফুটে উঠেছে কৃষ্ণ চরিত্রের মাধ্যমে। রাধা যেমন তার মনোবাসনা সখীদের বর্ণনা করে, কৃষ্ণও তেমনি তার সহচরদের নিকট নিরাবরণ করে দুঃখ-যন্ত্রণা-কাতর অন্তর। যেমন :

ক. আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একারে সুবল সখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী একবার এনে দেখা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৪৫)

খ. সুবল সখা পাইনারে দেখা, কইও রাধারে
বহু দিনের পরেরে সুবল রাধা পড়ে মনে।

(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫৮)

গ. সুবল বল বল চাই, কেমন আছে কমলিনী রাই
রাই কারণে বৃন্দাবনেরে সুবল আমি সদায় কান্দিয়া বেড়াই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৫৭)

৬.৬ ভণিতায় কবির স্বাতন্ত্র্য

পদের শেষে রচয়িতা তার নাম নিয়ে যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাকেই 'ভণিতা' বলা হয় । ভণিতা মূলত পদের শেষে কবির আত্মনিবেদন। প্রাচীনকাল থেকেই প্রায় সমস্ত কাব্য-সাহিত্যে এ রীতি প্রচলিত। পদ বা গানের শেষ শ্লোকে কবির নামনির্দেশ পাঠক-শ্রোতার প্রতি তাঁর আত্মপরিচয় জ্ঞাপক। কোনো কোনো কবির ভণিতা বক্তব্যের প্রগাঢ়তার জন্য পাঠক বা শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাধারমণের পদাবলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ভণিতার ব্যবহার। প্রায় সকল পদ বা গানের শেষে তিনি ভণিতা ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের ভণিতায় কবিগণ নানাভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করেছেন – 'ভণই লুই', 'ভুসুকু ভণই', 'ভণই বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস কহে', 'চণ্ডীদাস কয়', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে' ইত্যাদি। রাধারমণের পদেও 'কহে', 'বলে' বা 'ভণে' শব্দের ব্যবহার দুএকটি পদে পরিদৃষ্ট হলেও রাধারমণ মূলত নিজেকে প্রকাশ করেছেন 'ভাইবে রাধারমণ বলে' – এই ভাষিক স্বাতন্ত্র্যে। বৈষ্ণবপদে রাধারমণ এবং 'ভাইবে রাধারমণ' সমার্থক হয়ে উঠেছে। পাঠক-শ্রোতার নিকট রাধারমণের অবস্থান ভাবনার নির্যাসসহ। ভাইবে বা ভেবে রাধারমণ তাঁর পদের শেষে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন, ভাষার মতোই তা কোনো কোনো পদে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। 'চণ্ডীদাসের ভণিতা তার সংক্ষিপ্ত পদের সংক্ষিপ্ততর ভাবসার – মন্ত্রের মধ্যে বীজমন্ত্র' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২০০৮: ৮৯)। রাধারমণের পদের ক্ষেত্রেও আমরা একথাই বলতে পারি।

গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ততার মধ্যেই এর সৌন্দর্য নিহিত। স্বল্প পরিসরেই কবি ভণিতায় হয়ত বক্তব্যের নির্যাসটুকু প্রকাশ করেন। রাধারমণের কিছু পদ সেই সার্থক শিল্প-সৌন্দর্যকে ধারণ করে। আবার কোনো পদে রাধার বিরহ বা আকুলতা প্রকাশ করতে গিয়ে ভণিতায় কবি নিজেই হয়ত রাধার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন। তখন ভণিতা এবং মূলপদের বিভেদ হয়ত দূরীভূত হয়। যেমন দূর হয়ে যায় রাধা ও রাধারমণের তত্ত্বগত প্রভেদ – গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন যাকে 'রাগাত্মিকা' এবং 'রাগানুগা' ভক্তির বিভাজনে পৃথক করে রেখেছে। কিছু ভণিতার দৃষ্টান্ত দেয়া যায় :

ক. ভাইবে রাধারমণ বলে অসার সংসারো
তুমি সকলরে তরাইলায় গুরু আমি রইলাম পারো ॥

Dhaka University Institutional Repository

(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৪)

খ. ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া
পারৈমু পারৈমু করি দিন ত গেল গইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৭)

গ. ভাইবে রাধারমণ বলে রাখিও রাঙ্গা পায়
আমি মইলে বধের ভাগী তুমি নি অইবায় ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৪)

ঘ. ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পরা কি আপনার হয় পিরিতের লাগিয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৫)

ঙ. ভাবিয়া রাধারমণ বলে কমলিনী রাই
অন্তিমকালে শ্রীচরণে পাই যেন ঠাঁই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২২১)

চ. কথা ছিল সঙ্গে নিবো সঙ্গে আমায় নাহি নিলো গো
রাধারমণ ভবে রইল জিতে মরা হইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬৬)

ছ. ভাইবে রাধারমণ বল শুনগো ললিতায়
কুল নিলগো শ্যামের বাঁশি প্রাণ নিল কালায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৯৬)

জ. ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।
এগো আমি রাধা মরিয়া যাইমু কৃষ্ণহারা হইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৪)

৬.৭ গীতিধর্মী পদের প্রকাশ

আধুনিক গীতিকবিতার ধারণায় পদাবলি সাহিত্যকে পরিপূর্ণ গীতিধর্মিতার স্বীকৃতি দেয়া হয় না। গীতিকবিতায় ব্যক্তির উপস্থিতির অনিবার্যতা এবং তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি – ব্যক্তিক অনুভূতির নিবিড় প্রকাশ প্রত্যাশিত। ফলে, রাধা কিংবা কৃষ্ণের প্রেমময় সম্পর্কের নানা অধ্যায় প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যক্তি কবির আত্মভাব বা মন্ময়তা পরোক্ষতার আবরণে প্রগুপ্ত থাকে বিধায় পদাবলি সাহিত্যকে গীতিকবিতার পরিপূর্ণ মর্যাদা অনেকেই দিতে চান না। পদাবলি সাহিত্য সীমিত অর্থে গীতিকবিতা (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ঞ)।

রাধারমণের বৈষ্ণবপদ পদাবলির নিয়মের ঐতিহ্যানুসারী। ফলে তাঁর পদে ব্যক্তির মন্ময়তা হয়ত সে অর্থে প্রকাশিত নয় – যা প্রায় সকল বৈষ্ণব কবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বৈষ্ণব কবিদের দুই শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়। এক শ্রেণিতে বস্তুনিষ্ঠ বা রূপতন্ময় কবিগণ। তাঁদের কবিতায় শিল্প বা শিল্প-বিষয়ের সঙ্গে শিল্পী তথা কবির দূরত্ব বজায় থাকে। শিল্পীর আবেগের উচ্ছ্বাসও বস্তুনিষ্ঠতার বিভাজনের দেয়াল ভেদ করে যায় না। এই ধারার কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতি ও তাঁর ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস অন্যতম। অন্য শ্রেণির কবিগণ হলেন ভাববিদ্ধ – প্রাণতন্ময়। এঁদের কবিতায় রাধার কথা কেবল রাধার কথা থাকেনি – কবির নিজস্ব বাণীই যেন রাধার মুখে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ফলে কবির এই প্রাণোচ্ছ্বাস বিশেষ থেকে নির্বিশেষে বিস্তার লাভ করে। এই শ্রেণির কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস অন্যতম (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৯৯৭ : ৬১)। রাধারমণ শেষোক্ত ধারার কবি। তাঁর কবিতায় বস্তুনিষ্ঠ তন্ময়তার চেয়ে ভাববিদ্ধ মন্ময়তার প্রাধান্য। রাধার রূপমুগ্ধতা, কর্ণমূলে বাঁশির মোহন সুরের ইন্দ্রজাল, বিরহের দশ দশা, আক্ষেপের মর্মযাতনা কেবল রাধার নয়, রাধারমণেরও। এক কূলপ্লাবী হৃদয়াবেগ শিল্প এবং শিল্পীর দূরত্বকে অতিক্রম করে যায়। ফলে রাধা এবং রাধারমণ অভিন্ন সুতায় গ্রথিত হন। যেমন–

ক. কারে দেখাব মনের দুঃখগো আমি বুক চিরিয়া
অন্তরে তুষেরই অনল জ্বলে গইয়া গইয়া ॥
কার ফলন্ত গাছ উগারিলাম, পুত্রশোকে গালি দিলাম গো
না জানি কোন অভিশাপে এমন গেলো হইয়া ॥
ঘর বাঁধলাম প্রাণ বন্ধের সনে কত কথা ছিল মনে গো
ভাঙ্গিল আদরের জোড়া কোন জন বাদী হইয়া ॥
কথা ছিল সঙ্গে নিবো সঙ্গে আমায় নাহি নিলো গো
রাধারমণ ভবে রইল জিতে মরা হইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬৬)

খ. আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একারে সুবল সখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী একবার এনে দেখা ॥

রাধার কথা মনে পড়লে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
রাধা ছাড়া গোচারণে কেমনে থাকি একা ॥
রাধা আমার প্রেমের গুরু মনবাঞ্ছা কল্পতরু
রাধা আমার হস্তের বাঁশি বলে রাধা রাধা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জনম যায় বিফলে
রাধা ছাড়া গোচারণে ঘুরি একা একা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৪৫)

'আদরের জোড়া' ভাঙার গভীর বেদনা রাধার (উদাহরণ 'ক')। তবে এখানে রাধার উল্লেখ নেই। উপরন্তু, প্রাণের দোসরকে হারানোর মর্মযাতনায় রাধারমণের জীবন্মৃত অবস্থা প্রকাশিত। ফলে, রাধার দুঃখকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে কবির ব্যক্তিগত কোনো বিরহের আর্তি। এই পদের ভিত্তিভূমি যেন গোকুল নয়, পদান্তরে রক্ষিত দুঃখের গোপন স্রোতও জলবতী যমুনার নয়। এ দুঃখের পদাবলি কোনো গীতিকবির – যিনি নিজেকেই প্রকাশ করবেন বলে ফুলের মতো গ্রথিত করেছেন বিরহের কথামালা। কৃষ্ণের উক্তি বা সংলাপে প্রকাশিত পদে (উদাহরণ 'খ') রাধার প্রতি গভীর ভালোবাসার আকুলতা সুপরিস্ফুট। রাধা বিহনে কৃষ্ণের অসার শূন্যতার অনুভূতি এখানে ফুটে উঠেছে। তবে ভণিতায় কবি নিজেকে কৃষ্ণের ভাষ্যে প্রকাশ করায় কৃষ্ণ এবং রাধারমণ অভিন্ন হয়ে ওঠেন। ফলে পদস্থিত অন্তহীন দুঃখের যে বার্তা আমরা প্রাপ্ত হই, তা কেবল কৃষ্ণের থাকেনি। যার বিহনে বিরহের এত আয়োজন, সেই রাধাও যেন 'ব্রজেশ্বরী' নয় – কোনো কবি বা প্রেমিকের ব্যক্তিগত নারীর প্রতিমূর্তি।

ফলে, গীতিকবিতার যে মর্মবাণী – বিশেষ থেকে নির্বিশেষে উত্তরণ, কবির নিজের ভাবকল্পনা, অনুভূতি ও উপলব্ধির তথা 'অন্তর্সত্তার ঐকান্তিক প্রকাশ' (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ঞ) – তার পরিচয় আমরা রাধারমণের কোনো কোনো পদে লাভ করি – একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

৬.৮ গভীর আবেগের প্রাবল্য

আমরা বলেছি, রাধারমণের কবিতা মন্ময়তার গভীর মমতা মাখানো – রাধা এবং রাধারমণ কখনো কখনো একাকার হয়ে আছেন প্রেম কিংবা সাধন, কিংবা আবেগের প্রাবল্যে। দুই সত্তার লক্ষ্য এক – প্রেমাস্পদ পরম পুরুষের সান্নিধ্য, তথা মিলন। এই মিলন-প্রত্যাশী সত্তা রাধার রাগ-অনুরাগ, অপেক্ষা-উপেক্ষা, বিরহের মর্মপোড়া যাতনার শিল্প-ঋদ্ধ বর্ণনা প্রদান করেছেন কবি। তাঁর বর্ণনার যে ভাষাচিত্র, তা কেবল নিষ্প্রাণ বিবৃতির আধার হয়ে থাকেনি, আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততায় ঝর্ণাধারার মতো গীতিময় রূপ লাভ করেছে। চণ্ডীদাস কিংবা জ্ঞানদাস প্রমুখ কবির ভাষায় এই প্রবল আবেগের পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। জ্ঞানদাসের আবেগধর্মী ভাষাকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'ধ্বনি'র অনুরণন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এমন ধ্বনিবাদী বৈষ্ণব কবি আর নেই (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৯৯৭ : ৬২)। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

আলো মুঞি জানো না সই জানো না
জানো না গো জানো না।
(উদ্ধৃত : শঙ্করীপ্রসাদ ১৯৯৭ : ৬২)

এই ধ্বনিনির্ভর পঙ্‌ক্তিতে মূলত লুকিয়ে আছে রাধার 'প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ' – যা 'রোমান্টিক' কবির কাব্যে গীতল রূপ লাভ করেছে।

রাধারমণের গীতিকবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রাণস্পর্শী এই আবেগের উপস্থিতি – যা কথার ভেতর থেকে সুরের মায়া বিস্তার করে, মর্মে প্রবেশ করে অধিকার করে এর সমস্তটুকু। রাধার বিরহের বর্ণনায় এই আবেগধর্মী ভাষার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

ক. কত দিনে ওরে শ্যাম আর কত দিনে
কত দিনে হইব দেখা বংশী বাঁকা ঐ বনে ॥
বাঁশি দেও সঙ্গে নেও যাও নিজ স্থানে
দূরে গেলে ঐ দাসীরে রাখবে কি তোর মনে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৬২)

খ. রে ভমর, কইয়ো গিয়া–
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া ॥
ভমর রে, কইয়ো কইয়ো, হায়রে ভমর
প্রাণ বন্ধের লাগ পাইলে–
আমি রাধা মইরে যাব কৃষ্ণহারা হইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩২৯)

গ. ও বাঁশিরে শ্যামচান্দের বাঁশি, বাঁশি করিলায় উদাসী
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি তরল বাঁশের আগা
কে তোরে শিখাইল বাঁশি আমার নামটি রাধা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৫৫)

ঘ. আমারে বন্ধুয়ার মনে নাই রাইগো
আমারে বন্ধুয়ার মনে নাই।
জাতি যুতি ফুল মালতী বিনা সূতে মালা গাথিগো
আইল না শ্যাম কুঞ্জে আমার কার গলে পরাই।
চুয়া-চন্দন ফুলের অঞ্জন কটরায় ভরি রাখলো গো
দেখলে চন্দন উঠলে কান্দন আমি কার অঙ্গে ছিটাই।

Dhaka University Institutional Repository

(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১৩)

উপর্যুক্ত পদগুলোতে আবেগময়তার বর্ণনা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। একই পদ বা শব্দ-ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে চরিত্রের মনোযাতনার যে পরিচয় কবি প্রদান করেন, তা আবেগময় গীতধর্মিতারই প্রকাশ। রাধারমণের কবিতার নাগরিক বা আধুনিক বিশ্লেষণে নানা অপূর্ণতার ঊনতা লক্ষ করা অসম্ভব নয়। বিষয়ের শিল্পসমৃদ্ধ উপস্থাপনের নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতির আবিষ্কারও হয়ত দুর্লভ নয়। তবে কাব্যের প্রাণ যে আবেগ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাকে বলেছেন – শক্তিশালী অনুভূতি, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে কোনো ঊনতা বা দীনতা নেই; বরং প্রবলভাবে উপস্থিত আছে বলেই শত বছরের কালপ্রবাহের পরেও আমাদের শিল্পবোধে রাধারমণের বৈষ্ণবপদ কথা ও সুরের ইন্দ্রজাল ছড়ায়। কবি এক্ষেত্রে সমসাময়িক অন্য অনেক কবির চেয়ে স্বতন্ত্র – এ দাবি যৌক্তিকতার সীমা অতিক্রম করবে না বলেই বিবেচনা করি।

বৈষ্ণবপদ রচনায় রাধারমণের স্বকীয়তা তাঁকে পদাবলি সাহিত্যের মহৎ কবিদের তালিকায় স্থান দেবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

রাধারমণের রচনায় পূর্ববর্তী সাহিত্যের প্রভাব

রাধারমণের কবিতা বহমান বাংলা লোকসাহিত্যের রীতি-অনুসারী। বিষয়, প্রকাশশৈলী এবং চিন্তা বা তত্ত্বের যে পরিচয় আমরা তার কাব্যে প্রত্যক্ষ করি, তাও ঐতিহ্যের অনুবর্তন। বৈষ্ণবীয় সহজ সাধনার যে চর্চা তাঁর গানে প্রকাশিত, তার শিকড় বাঙালির জীবন-ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। চর্যাপদে বাঙালির জীবন এবং সাধনার মূলে তন্ত্র-সাংখ্য-যোগের সাধন-ভজনের যে ইতিহাস, তা ঐতিহ্যকে ধারণ করে আজও প্রবহমান। রাধারমণ এই ঐতিহ্যের ধারক। বাঙালির বৈষ্ণব-সাধনের ইতিহাসও হাজার বছরের। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখের মাধ্যমে বৈষ্ণবপদাবলি যে চূড়াস্পর্শী শিল্পসাফল্য লাভ করেছিল, তা বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদে পরিণত হয় এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনেক কবি বৈষ্ণবীয় ধারায় সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত হন। রাধারমণ এ ধারারও উত্তরসূরি। ফলে তাঁর কাব্যে ঐতিহ্যের অনুসরণ এবং কবিদের প্রভাব স্বাভাবিক বলেই বিবেচনা করা যায়।

৭.১ চর্যাপদ

রাধারমণের পদে আবিষ্কৃত 'চর্যাগীতিকোষ'-এর প্রভাব পড়েছে – এমনটা বলা সমীচীন হবে না। কেননা, চর্যাপদ যখন প্রকাশিত হয় (১৯১৬), তার বছরখানেক আগেই রাধারমণ (জন্ম : ১৮৩৪, মৃত্যু : ১৯১৫) গত হয়েছেন। তবে, চর্যাপদে প্রকাশিত সাধনপদ্ধতি – যা হাজার বছর ধরে সাধকপরম্পরায় গোপনে চলে এসেছে, সেই সাধনপদ্ধতির বা সাধনরীতির অনুসারী হয়ে তাকে আরাধনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। চর্যাপদের সাধনপদ্ধতির প্রবহমানতা প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের অভিমত : 'চর্যাপদের সাধনার ধারা বাহিরের দিকে অবলুপ্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে প্রবহমান ছিল। সে সাধনার উত্তরাধিকারী ষোড়শ ও পরবর্তী শতাব্দীর রাগানুগা বৈষ্ণব ও মরমিয়া সাধকেরা' (সুকুমার সেন ২০১০ : ৪১)।

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। পণ্ডিতগণের অভিমত – সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই চর্যার পদগুলো রচিত হয়েছে (সুকুমার সেন ১৯৯৩ : ৫৫)। সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের সাধনকথা 'সন্ধ্যা' ভাষায় চর্যাপদে প্রকাশিত (আহমদ শরীফ ২০০৮ : ৩৫৯-৬১, নির্মল দাশ ২০১২ : ১০৬-০৭)। বোঝা না-বোঝার ভেতর বা 'উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৮৮ : ৮)। সহজপন্থার মূলকথা মুক্তি। তবে এ মুক্তি সহজ ব্যাপার নয়। নীলরতন সেনের অভিমত :

> মন্ত্রতন্ত্র, জপতপ বা ধ্যান-ব্যাখ্যানের দ্বারা মুক্তি লভ্য নয়। মুক্তির সহজপথ গুরুর সাহায্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ – সবই মানুষের চপল মনের কল্পনা। কারো ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাভাবিক রিপুগুলি অস্বীকারের প্রয়োজন নেই। শুধু গুরুর নির্দেশমতো দেহমনকে সংযত করতে

> শিখতে হয়। – 'সহজ'কে উপলব্ধির সোপানে নিজেকে উন্নীত করতে হয়। একবার সেখানে পৌঁছাতে পারলে যথার্থ মুক্তির আনন্দ উপভোগ সম্ভবপর। (নীলরতন সেন ২০১০ : ৪৬)

এই 'মুক্তির আনন্দ' লাভ করার সাধনপন্থাকে নিজস্ব ভাষায় বা রূপকের আড়ালে চব্বিশ জন পদকর্তা যে সাধনসংগীত রচনা করেছেন, চর্যাপদ তারই সংকলন।

প্রায় হাজার বছর পূর্বে রচিত হওয়া চর্যাপদের সঙ্গে রাধারমণের বৈষ্ণব কবিতার বিষয় কিংবা শিল্প-বিষয়ে সাদৃশ্য খোঁজা আপাত কষ্টকল্পনা হলেও, বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম নিদর্শনের সাথে ঊনবিংশ শতকের রাধারমণের পদের রয়েছে গভীর ঐক্য। ভাব কিংবা চিন্তার ক্ষেত্রে যে মিল আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাতে এ বিষয়টি পরিস্ফুট যে, চিন্তা কিংবা চিন্তাকে প্রকাশের ভাষার রয়েছে ঐতিহাসিক যোগসূত্র – প্রভাবিত হয়ে কিংবা প্রভাবিত করেই টিকে থাকে কোনো ধর্ম-দর্শন কিংবা মতবাদ।

চর্যার পদগুলো সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধন-ভজনের শিল্পরূপ। আমরা দেখি, নানা 'সন্ধ্যা' অবগুণ্ঠনে প্রকাশিত তাদের তত্ত্বকথা। বোঝা না-বোঝার আলো-আঁধারীতে আমরা প্রত্যক্ষ করি সহজ পথের অনুসন্ধানী নিবিড় সাধকের মর্মকথা :

ক. করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দুল দলিয়া ॥
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ।
পেখ রে ভুসুকু সহজ সরুআ ॥[১]
(ভুসুকু ১৩৮৮ : ৫১)

খ. আপণে নাহিঁ, সো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা ॥
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।
চৌকোটি বিমুকা জইসো তইসো হোই ॥
জইসনে অছিলে তইছন অচ্ছ।
সহজ পিথক জোই ভান্তি মা হো বাস ॥[২]
(তাড়ক ১৩৮৮ : ৬২)

---

১. আধুনিক বাংলা : ভাব-অভাবের কুয়াশা দলিত করে করুণা মেঘ নিরন্তর স্ফূরিত হচ্ছে। গগন-মধ্যে উদিত (হয়েছে) অদ্ভূত; রে ভুসুকু, সহজ-স্বরূপ দেখ (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা ১৪০২ : ১৩৫)।

২. আধুনিক বাংলা : আমি নিজেই নেই, আমার কাকে শঙ্কা? তাই আমার মহামুদ্রার আকাঙ্ক্ষা টুটে গেল। সহজ অনুভব কর, ওরে যোগী, ভুলো না, (কোনো কিছু) যেমন চতুষ্কোটি বিমুক্ত হয়, তেমনি হতে হয় তোমাকেও। যেমন ইচ্ছা করলে তেমনি থাক , সহজ পথের (বিষয়ে) হে যোগী ভুল করো না (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা ১৪০২ : ১৫৪)।

রাধারমণের গানেও এই সহজের সাধনা লক্ষ করা যায়। 'সহজ' পথই সাধকের পথ – সত্য উপলব্ধির বিশেষ পন্থা (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০০৪ : ৮৪)। রাধারমণ এই 'সহজে'র অনুসারী :

ক. যাবে যদি মন সহজ ভাবের দেশে
অধর মানুষ বিরাজ করে সহজ রসে ॥
হিংসা নিন্দা খুটিনাটি কৈতবাদি ময়লামাটি
ছেড়ে হও খাঁটি।
ত্যেজে গরল হওরে সরল রিপু ইন্দ্রিয় নেও বশে ॥
সহজ রসে অধর ধরা সহজের ফুল জিতে মরা
হইলে হয় সারা
দেহতরী শ্রদ্ধা পালে অনুরাগ বাতাসে ॥
সহজরস আনন্দ চিন্ময় সহজ ভাবে নারী প্রেমের উদয়
সাধলে সিদ্ধ হয়
রাধারমণ বলে মনরে রইলে কার আশে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৯৭)

খ. সজনি, আমি ভাবের মরা মইলাম না–
সহজ পিরিতি হইল না।
সহজ পিরিতি হইতে পারে–
দুইজন হইলে একমনা ॥
মধুর লোভে কাল ভমরে
করছে আনা-যানা।
শুকাইলে কমলার মধু
ফিরে ভমর আসবে না ॥
আর ভাইবে রাধারমণ বলে
মনের ওই বাসনা।
সহজ পিরিতি সিংহের দুধ
মাটির বাসনে টিকে না ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮০)

সহজসাধনা বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত – 'প্রকৃত সহজ সেই, যার মধ্য দিয়ে মানুষ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে; সহজ সেই যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় সংযত করে; প্রকৃত সহজ সেই যাতে স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ ও আকাঙ্ক্ষা সমাহিত' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ১২৪)। 'প্রকৃত সহজে'র সাধক রাধারমণ। তিনি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে – স্ত্রীপুত্র-পরিজনের মোহ ত্যাগ করে – ইন্দ্রিয়কে সংযত করে ভাব ও অভাবের উর্ধ্বে

আরোহন করতে চান – যেখানে পরমানন্দ বিরাজ করে। 'সহজ পিরিতি' হলো না বলে রাধারমণের আক্ষেপ তাঁর পদে প্রকাশিত। যুগলে 'একমনা' হয়ে সাধন করলে এ সাধন সফল হতে পারে বলে কবির বিশ্বাস। তবে তিনি এ-ও জানেন মাটির শরীরে 'সিংহের দুধ'সম সহজসাধনকে ধারণ করা সহজ নয়।

সহজ-সাধনার চর্যাপদের যে ধারা তা দেহকেন্দ্রিক তান্ত্রিক সাধনা। দেহকে ব্রহ্মাণ্ড চিন্তা করে এর ভেতর নদীর প্রবহমানতা কল্পনা করার রীতি আমরা লক্ষ করি এবং এই নদীর বিভিন্ন উপধারার উল্লেখও পরিদৃষ্ট। যেমন :

ক. গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
তহিঁ চড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই ॥
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅ-পসাএঁ জাইব পুণু জিণউরা ॥[৩]
(ডোম্বী ২০০৭ : ৫৮)

গঙ্গা-যমুনা হচ্ছে ইড়া-পিঙ্গলা নামের দুটি নাড়ি – এর মধ্যবর্তী সুষুম্না বা অবধূতিকা পথে সাধককে এগোতে হবে। সাধনের সময় বয়ে যায়। সদগুরুর পাদপদ্মের প্রসাদে পুনরায় মহাসুখ পুরে প্রবেশ করার তাগাদার কথাই এখানে বর্ণিত (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা ১৪০২ : ৯৯)।

খ. এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি।
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি ॥
(কাহ্ন ২০০৭ : ৪৮)

রাধারমণের পদেও আমরা নদী-সাগর কিংবা 'চৌষট্টি' ধারার প্রবাহ লক্ষ করি। মূলত দেহকেন্দ্রিক সাধনার পরিচয়ই ফুটে ওঠে এসব সাধন-পদে :

ক. একটি নদীর তিনটি নালা – রসিক যারা বুঝবে তারা,
অরসিকে বুঝতে পাইলাম না;
বুঝি আমার কর্মদোষেরে মন আমার সাধন সিদ্ধি হইল না ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬২)

খ. উল্টা আইলাম, উল্টা গেলাম, উল্টা কলে রইলাম
উল্টা কলে চাপি দিয়া তালা না খুলিলাম ॥

---

৩. আধুনিক বাংলা : ওরে, গঙ্গা-যমুনা মধ্যে নৌকা বয়! তাতে চড়ে প্রমত্তাঙ্গী (প্রমত্ত স্ত্রীলোক) নিমজ্জিত ব্যক্তিকে অবলীলাক্রমে পার করে দেয়। হে ডোম্বি, তুই বেয়ে যা, বেয়ে যা ওরে ডোম্বি, পথেই বিকাল হয়ে এলো। সদগুরুর পাদ-প্রসাদে পুনরায় আমি জিনপুরে যাব (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা ১৪০২ : ৯৯)।

এক সমুদ্রের তিনটি ধারা, তারে না চিনিলাম।
গঙ্গার জল ত্যজ্য করে কুজল খাইয়া মইলাম ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৬)

গ. রসের নাগর সে কালাচাঁদ আছে সহস্রারে
পাইলে সুযোগ করিও সংযোগ সে যমুনার পারে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭৪)

ঘ. প্রেম বিলাতে যাবে যদি মন, রাধারাণীর কল গাড়িতে
ত্বরিতে কর আরোহণ।
শমনের ভয় রবে নারে পাবে নিত্য ধন।
উত্তম বসন পরে চৌষট্টি অলংকারে, আনন্দ দূরবীন
শিরে সাজিয়ে কররে গমন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৯৩)

নদী বা সমুদ্রের তিনটি ধারা প্রসঙ্গে মূলত গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী – এই তিনটি প্রবাহের কথা বলা হয়েছে। দেহের মধ্যে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ি নদীরূপে কল্পিত হয়েছে (আহমদ শরীফ ২০০৩ : ৪৩)। মস্তকস্থিত 'সহস্রারে'র উল্লেখেও শরীরকেন্দ্রিক সাধনার কথাই ব্যক্ত। রসের নাগর কালাচাঁদের অবস্থান সেখানে। রসিকজনেই কেবল তাঁকে পেতে পারে – 'অরসিক' রাধারমণের নিকট সে-সাধন দুর্বোধ্য। ফলে 'গঙ্গার জল' তথা সাধনসিদ্ধি থেকে বঞ্চিত কবি। দেহভিত্তিক তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারাই 'বৌদ্ধ দোঁহাকোষ ও চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৪১৬ : ১২)।

সহজিয়াবৈষ্ণব মতের সাধক রাধারমণের পদে তন্ত্রসাধনার ধারাবাহিকতার পরিণতিই প্রকাশিত হয়েছে।

সহজ-সাধনার ধারায় গুরুর ভূমিকা মুখ্য, তাকে বিনা রহস্য জানা সম্ভব নয়। চর্যাপদে সাধকের সংশয়-সংকটে বারবার প্রকৃত গুরুর শরণাপন্ন হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১ : ৪৮) – এই রীতির কথা চর্যাপদের পদগুলোতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

ক. কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥[৪]
(লুইপা ১৩৮৮ : ১)

৪. আধুনিক বাংলা : শ্রেষ্ঠ তরু (সদৃশ) এই শরীর, পাঁচটিই তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে (ধ্বংসরূপী) কাল প্রবেশ করে। (এই চিত্তকে) দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলেন, গুরুকে শুধিয়ে জেনে নাও (কীভাবে তা করতে হবে) (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা ১৪০২ : ৬৪)।

রাধারমণের পদে আমরা গুরুর প্রতি অটল ভক্তি এবং আস্থার প্রকাশ লক্ষ করি; এবং গুরুকে চিনতে না পারার আক্ষেপও কোথাও প্রকাশিত। যেমন :

ক. সজনী গো গুরু কি ধন চিনলাম না
অমূল্য ধন গুরুর চরণ ভজন হইল না ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭৮)

খ. সাধন করা সহজ নয় সাধন কর মরণ পণ
সাধনায় সিদ্ধি চাইলে সার করো গুরুর চরণ।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮৪)

গ. অকূল সমুদ্রমাঝে ভাসিয়া ফিরে পেনা
কতদিনে দয়াল গুরু লওয়াইবায় কিনারা ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮৫)

ঘ. গুরুপদ পদারবৃন্দে মনভুজঙ্গ মজনারে
সুধামাখা গুরুনামে ভবক্ষুধা যাবে দূরে ॥
জয়গুরু জয়গুরু বইলে ডাকো তারে প্রাণ খুইলে
গুরু বিনে কেহ নাইরে ভবার্ণবে যে নিস্তারে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮৮)

কবির বিশ্বাস 'সুধামাখা' গুরুর নামে জাগতিক কামনা-বাসনা দূর হয়ে যাবে। ভবসমুদ্র পাড়ি দিতে একমাত্র ভরসা গুরু। 'সহজ'সাধন সহজ নয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে গুরুর শরণ একান্ত প্রয়োজন। সদগুরুর 'পাদপদ্মের প্রসাদে' মহাসুখপুরে যাওয়ার যায় (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা ১৪০২ : ৯৯)। রাধারমণ গুরুর এই পাদপদ্মের প্রত্যাশী।

দেহকে নৌকার সাথে তুলনা করে সাধনভজনের রীতি চর্যাপদে লক্ষণীয় :

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেডুআল।
সদগুরু-বঅণে ধর পতবাল ॥[৫]
(সরহ ২০০৭ : ১০১)

৫. আধুনিক বাংলা : কায়া একটি ছোট্ট নৌকা, খাঁটি মন (হচ্ছে) বৈঠা; সদগুরুর বচনে হাল ধর (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা ১৪০২ : ১৫৬)।

চর্যাপদের সাধকদের মতে, দেহই ব্রহ্মাণ্ড। সত্য বাইরে নেই – দেহের মধ্যেই তা বিরাজমান। তাই তাদের সাধনাও দেহকেন্দ্রিক। রাধারমণের কয়েকটি পদে আমরা দেহকে তরির সাথে এক করে ভাবনার চিত্র দেখতে পাই। যেমন :

ক. আহা, চুরের ঘাটে নাও লাগাইয়া ভাবছ কিরে মন
ঐ নাও যতনে অতি গোপনে সাধরে অমূল্যধন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৩)

খ. আমার দেহতরি কি দিয়া গড়িলায় গুরুধন।
আমি ভূতের বেগার খাইটে মইলাম
পাইলাম না শ্রীগুরুর চরণ ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭১)

গ. আমার দেহতরি কে করলো গঠন
মেস্তরি কে চিননি রে মন।
ঐসে নায়ের গুড়া আছে ছোটবড় সব দিয়াছে
কে কৈলো গঠন গো নায়ের কে কৈলো গঠন
লুআ ছাড়া তক্তার জোড়া বেশ করিয়াছ পাটাতন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭১)

ঘ. এই যে নাওয়ের ষোল্লতালা
খুল্লায় নারে ও মন ভোলা ঘুমে অচেতন ॥
তালা খুলবে যখন দেখবে তখন
মোহর মারা আছে ধন ॥
মছতুলে দিয়ে বাত্তি রংমলেতে করে জ্যোতি
একবার খুলে দেখরে নয়ন ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৭২)

'অতি গোপনে' সাধন করে দেহতরির মর্মকথা জানার কথা বলেছেন কবি। 'মেস্তরি' বা নৌকার কারিগরকে জানার তাগিদ এতে প্রকাশিত। ষোলতালা নায়ের মধ্যেখানে রয়েছে মহামূল্য ধন। অন্তর্চক্ষু দিয়েই কেবল তাকে দেখতে হয়। রাধারমণ সে অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য অপেক্ষমান।

হাজার বছরের ব্যবধানকে অতিক্রম করে চর্যাপদের সহজিয়া সাধনরীতি রাধারমণের পদে ছায়া ফেলেছ। বৌদ্ধ-সহজিয়ার সাধনরীতির পুরোটাই রাধারমণের পদে নেই। তবে সহজিয়া সরল পন্থার সাধনা

বা কায়াকেন্দ্রিক যে সাধনরীতি এবং তা প্রকাশের যে ভাষিক পদ্ধতি তা রাধারমণের পদে ভালভাবেই প্রকাশিত।

৭.২ জয়দেব

গৌড়েশ্বর লক্ষণসেনের রাজসভার (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৬) (নীহাররঞ্জন রায় ১৪১৬ : ৪০৭) বিখ্যাত পঞ্চকবির 'সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন' জয়দেব (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-১১ : ৬২)। 'গীতগোবিন্দ' তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার কাব্যপ্রতিমা নির্মাণে তিনি যে সাফল্য দেখিয়েছেন, তা তুলনারহিত। তাঁকে বৈষ্ণবপদাবলির আদি কবি বিবেচনা করা হয় (সুকুমার সেন ১৯৯৫ : ভূমিকা– সাত, বংশীধর মোদক ১৯৯৪ : ৯)। বাঙালি কবি জয়দেব অবহটঠে লেখা প্রাচীন পদাবলির অনুকরণে সংস্কৃতে তাঁর পদগুলো রচনা করেন। 'গীতগোবিন্দে'র গানগুলো কেবল মিথিলা, বাংলা কিংবা আসাম নয় – গুজরাট, পাঞ্জাব ও রাজস্থানসহ ভারতবর্ষের অন্যত্র বৈষ্ণবপদাবলি চর্চার পথ খুলে দিয়েছিল (সুকুমার সেন ১৯৯৫ : ভূমিকা– ছয়)।

সেন রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন (ওয়াকিল আহমদ ২০০৬ : ২৫৯)। যদিও জয়দেব শৈব ছিলেন না বৈষ্ণব ছিলেন এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। তবে এ বিষয় সন্দেহাতীত যে, তিনি বিশিষ্ট কোনো বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। ফলে, নির্মোহ দৃষ্টিতে জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার চিত্র-অঙ্কন করতে ভারতীয় প্রাকৃত প্রেমরসের অনুসরণ করেছেন। রাধাচরিত্র চিত্রণে বাৎসায়নের কামসূত্র, অমরুশতক বা কালিদাসের কাব্যের শরণ নিয়েছেন। ভাব-ভাষা, ছন্দ-অলংকার ও বাচনভঙ্গিতে কবি সে যুগের একটি সুপ্রচলিত প্রেমাবেগকে ধর্মশুদ্ধির আবরণে বাংলা-প্রভাবিত সংস্কৃত ভাষায় শিল্পরূপ প্রদান করেন। জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলিতে ধর্মীয় লীলাকথা অপেক্ষা বিলাসকলার প্রাধান্য পরিলক্ষিত (নীলরতন সেন ২০০০ : ৬৯)।

বৈষ্ণবপদাবলির ক্রমবিকাশে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এ কাব্যকে ভিত্তি করেই পরবর্তীতে বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। এবং জয়দেবের সাহিত্যের প্রভাবে পরবর্তী কবি বিদ্যাপতি এবং অন্যান্য চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের ওপর কমবেশি রয়েছে। ঊনবিংশ শতকের লোককবি রাধারমণের ওপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ততটা লক্ষণীয় না হলেও দুই কবির কাব্য-বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনদর্শনের পার্থক্যের কারণে দুজনের অবস্থান দুদিকে।

রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিরহ-মিলনের আনন্দ-বেদনার মানবিক অনুভূতিকে বিষয় করে দুই কবিই পদরচনা করেছেন। ত্রয়োদশ শতক এবং ঊনবিংশ শতকের ব্যবধানকে অতিক্রম করে কাব্যিক এবং মানবিক দৃষ্টিতে ভাবের ঐক্যের ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন :

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্ ॥

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ ॥[৬]
(জয়দেব ২০১০ : ১৪)

রাধারমণের পদে এই প্রেমাস্পদের মিলনপ্রত্যাশী রাধার চিত্রই যেন ফুটে ওঠে :

আইলো না গো প্রাণবন্ধু কালিয়া
মুই অভাগী কলঙ্কের ভাগী হইনু কার লাগিয়া ॥
গাঁথিয়া বনফুলের মালা মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা
সয়না প্রাণে মালা দিতাম কার গলে তুলিয়া ॥
বহু আশা ছিল মনে মিশিতাম প্রাণবন্ধুর সনে
মুই অভাগী প্রাণে মরি মদনজ্বালায় জ্বলিয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২১২)

'মদনশর', 'মদনজ্বালা' কিংবা 'বিরহানল' প্রভৃতি শব্দে অলংকারের ব্যবহারে দুইকবির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এবং রাধার প্রতীক্ষা এবং সমর্পণবাসনার বর্ণনায়ও সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। এই সাদৃশ্য রাধারমণের শিক্ষিত পারিবারিক পরিমণ্ডলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর পিতা রাধামাধব দত্ত 'সংস্কৃত ভাষায় জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের টীকা' রচনা করেছিলেন (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৮) – এ-তথ্যে আস্থা রেখে আমরা বলতে পারি – রাধারমণ পদাবলি সাহিত্যের প্রাথমিকপাঠ তাঁর পরিবার থেকেই লাভ করেছিলেন এবং জয়দেবের কবিতার সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয় ছিল।

ফলে বলা যায়, জয়দেব-পরবর্তী কবিদের ন্যায় রাধারমণের পদরচনার অন্যতম প্রেরণা 'গীতগোবিন্দে'র কোমলকান্ত পদাবলি।

৬. বাংলা : যার জন্য আমি রাত্রে এই গহন বনে আসলাম, তিনিই আমার হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করতে লাগলেন। এখন আমার মরণই ভাল, কৃষ্ণবিরহানলে চেতনাশূন্য হয়ে যাচ্ছি। এই বিফল দেহ ধারণ করে কী ফল? এই মধুর বসন্তরজনি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, কিন্তু না জানি কোন্ পুণ্যবতী এই মধুররজনিতে শ্রীহরির মিলনসুখ অনুভব করছে। আহা, তিনি আসবেন বলে আমি এই বলয়াদি মণিভূষণ ধারণ করলাম। কিন্তু হরির বিরহে এখন তা যন্ত্রণার কারণ হলো। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০১০ : ১৪)

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ বিদ্যাপতি

জয়দেবের পরে পূর্ব-ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি বিদ্যাপতি (গোপাল হালদার ২০০৭ : ৮২)। কেবল মধ্যযুগে নয়, আধুনিক যুগেও কবি হিসেবে বিদ্যাপতি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং 'সৌন্দর্য ও প্রেম-মনস্তত্ত্বের কবিরূপে মধ্যযুগে ভাষা-সাহিত্যে তিনি সম্ভবত অদ্বিতীয়' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২০০৮ : ১১১)। মিথিলায় জন্মগ্রহণকারী এবং মিথিলার রাজসভার এই প্রতিভাবান পণ্ডিতকবি ১৩৮০ থেকে ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। বিদ্যাপতি ষাট বৎসরের অধিককাল ধরে সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। বিদ্যাপতির ধর্মমত নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা শৈব ছিলেন (সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭ : ৩৭-৫৫, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২০০৮ : ১২৫)। শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করতেন। বাংলার বৈষ্ণবগণ তাঁকে মহাজনরূপে সম্মান করেন (বিমানবিহারী মজুমদার ১৯৬১ : ১৯৬)।

রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালকে (১৪১০-১৪) বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময়ে তিনি দুই শতাধিক পদ রচনা করেন – যার অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবিষয়ক পদ (নীলরতন সেন ২০০০ : ৭২)। বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভা মূল্যায়ন করে আহমদ শরীফ বলেন, বিদ্যাপতি কাম ও প্রেমের কবি। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহটঠে রাধাকৃষ্ণের কাম-প্রেম লীলা পূর্বে অনেক রচিত হয় এবং জয়দেব এক্ষেত্রে জনপ্রিয় কবি হলেও, নারী-পুরুষের কাম-প্রেম সম্পৃক্ত এমন সূক্ষ্ম, বিচিত্র এবং বহুধা অনুভব বিশ্বসাহিত্যে তুলনা রহিত। পদাবলি সীমিত অর্থে গীতিকবিতা এবং বিশেষ ছাঁচের এবং বিশেষ উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতা নিয়ে পৌনঃপুনিকতা দুষ্ট হয়েও মানববৃত্তির কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনাকে ধারণ করে চির-সৌন্দর্য এবং চির-মাধুর্যের উৎস হয়ে আছে। মধ্যযুগের সীমা ছাড়িয়ে তা চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। সাহিত্যের এধারায় বিদ্যাপতি ভাবনার বিচিত্রতায় এবং প্রকাশের সৌন্দর্যে – ভাষা-ছন্দ-অলংকার তথা রূপ ও রসের শৈল্পিক পরিচর্যায় বিদ্যাপতি আদর্শ এবং পথপ্রদর্শক। বৈষ্ণব কবিরা অবৈষ্ণব বিদ্যাপতির সৌন্দর্যে কোথাও সার্থক, কোথাও-বা অসঙ্গতভাবে সাধনতত্ত্ব বা চৈতন্যানুভূতির রং লাগিয়েছেন মাত্র (আহমদ শরীফ ২০০০ : ৩০২)।

আঙ্গিক নির্মাণে বিদ্যাপতি জয়দেবকে অনুসরণ করলেও তাঁকে বহুগুণে অতিক্রম করে নতুন আসনে সমাসীন হয়েছেন। নীলরতন সেন মনে করেন, জয়দেবের তুলনায় বিদ্যাপতি ভাবের ব্যাপ্তি এবং প্রকাশের বৈচিত্র্যে অনেক উন্নত এবং বিস্তৃত (নীলরতন সেন ২০০০ : ৭৫)। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার বয়ঃসন্ধি, অভিসার, বিরহ, মান, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি পদে বিদ্যাপতি অনন্য। বয়ঃসন্ধির পদের একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ :

শৈশব যৌবন দরশন ভেল
দুই দল বলে দন্দ পরি গেল।
কবহু বান্ধএ কচ কবহু বিথারি
কবহু ঝাঁপএ অঙ্গ কবহু উঘারি।

(বিদ্যাপতি ১৯৯৮ : ২৩)

এ যেন যৌবনের দৃষ্টিতে আঁকা যৌবনেরই প্রেমময় প্রতিমূর্তি – যা সকল কিছুকে ছাপিয়ে কেবল শরীরের মানবীয় সৌন্দর্যের নির্মল পরিস্ফুটন ঘটায়। কিশোরী বালিকার কোমল দেহে যৌবনাগম, তার বিকাশ এবং এর সঙ্গে রাধার মনোজাগতিক পরিবর্তনের চিত্র বিদ্যাপতির অনেক পদে চিত্রের সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশিত (ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৯৯৮ : ১১৫)। বৈষ্ণবপদ রচনায় বিদ্যাপতির সাফল্য শিখরস্পর্শী। এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত কাব্যিক। তাঁর উদ্দেশ্য – 'রাধাকে সৌন্দর্যময়ী করে তোলা, তাই রূপের আতিশয্য ও সেই রূপ কীভাবে দেহজ কামনাকে জাগ্রত করে' তাই ব্যাখ্যা করা (মঞ্জুলা বেরা ১৪০৬ : ৪৭)।

'ব্রজবুলি'র কবির ভাষা এবং রাধারমণের কাব্যিক ভাষায় তফাত আছে। তবে, বিষয়ের নৈকট্য আছে এবং বিষয়কে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে দুজন কবিই গ্রহণ করেছেন সামাজিক মানুষের বহুবছরের লালিত ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাসকে। এক্ষেত্রে কোথাও-বা দুজনের শৈল্পিক দৃষ্টি মিলে গেছে এক বৃন্তে। যেমন, বিদ্যাপতির পদ :

পুরুষ ভমরসম কুসুমে কুসুমে রম–
পেঅসি করএ কি পারে।
(বিদ্যাপতি ১৩৫৯ : ৯০)

অনুবাদ : পুরষ ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু খায় – প্রেয়সী কী করতে পারে।

রাধারমণের পদেও আমরা লক্ষ করি পুরুষ এবং ভ্রমরের প্রকৃতি এক ভাবার উপমা :

পুরুষ ভমরা গো জাতি কঠিন তার হিয়া
না জানে নারীর বেদন পাষাণে বান্ধে হিয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৩৯)

ছন্দ-নির্মাণেও আমরা লক্ষ করি বিদ্যাপতি-অনুসৃত রীতির ব্যবহার। বিদ্যাপতির একাবলি ছন্দের একটি উদাহরণ:

চরণ নূপুর উপর সারী।
মুখর মেখল করে নিবারী ॥
(বিদ্যাপতি ২০১০ : ১২৫)

রাধারমণের পদে একাবলির ব্যবহার :

শ্যামের প্রেয়সী বিনোদী রাই।
হৃদয় বিদারে তোর মুখ চাই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৯)

এগারো মাত্রার চরণগঠণে নাগরিক কবির সঙ্গে লোককবির কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও ছন্দের সৌন্দর্য-গঠনে রাধারমণ পূর্বসূরির নিকট ঋণী – এ কথা বলা যায়।

কবিতার ভাষাভঙ্গি নির্মাণেও বিদ্যাপতির পদের ছায়া আমরা রাধারমণে লক্ষ করি। যেমন :

বিদ্যাপতির পদ :

ক. শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ।
হাম শিখাওব বচন বিশেষ ॥
(বিদ্যাপতি ১৩৫৯ : ৪১৯)

খ. সুন সুন মুগধনি মঝু উপদেস।
হম সিখায়ব চরিত বিসেস ॥
(বিদ্যাপতি ১৩৫৯ : ৪২০)

বিদ্যাপতির রাধাকে বচন আর আচরণের (চরিত) শিক্ষা দেয় তার সখীরা। রাধারমণের সখীও অভিসারগামী বিধুমুখী রাধিকাকে প্ররোচিত করছে। আর এ ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করতে কবি যেন পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতিরই অনুসারী :

ক. শুন শুন বিনোদিনী আমার বচন
ঘন ঘন বাজে বাঁশি গহন কানন।
(রাধারমণ দত্ত ২০০৯ : ২৩৭)

খ. শুন শুন ওরে বাঁশি অবলার কুলবিনাশী
শুন বাঁশি মিনতি আমার।
(রাধারমণ দত্ত ২০০৯ : ২১৫)

আমরা বলতে পারি – ভাব, ভাষাভঙ্গি এবং ছন্দ-নির্মাণকলায় রাধারমণের ওপর বিদ্যাপতির প্রভাব লক্ষণীয়। বিদ্যাপতি যেমন জয়দেবসহ পূর্ববর্তী কবিদের দ্বারা সমৃদ্ধ বা প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি রাধারমণের ক্ষেত্রেও বিদ্যাপতির প্রভাব স্বীকার্য।

৭.৪ চণ্ডীদাস

চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার নানুর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী চণ্ডীদাস বাংলাভাষায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আদি ও সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি । বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। দীনেশচন্দ্র সেন একজন চণ্ডীদাসের পক্ষে মত দিয়েছেন (দীনেশচন্দ্র সেন ২০০২ : ২১১), কারো মতে

চণ্ডীদাস দুইজন – বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বীজ চণ্ডীদাস (সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭ : ৫৬-১১৩)। আবার কেউ কেউ বড়ু, দ্বিজ, দীন – তিনজন চণ্ডীদাসের কথা স্বীকার করেছেন (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ২০০৭ : ৩৬-৫৫)। এসবের বাইরেও অনন্ত, আদি প্রভৃতি চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে নানা মত-অভিমতের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র সমাধানে যে তিনজন চণ্ডীদাসের কথা উত্থাপন করেছেন তা যুক্তিগ্রাহ্য বলে স্বীকৃত (আহমদ কবির ২০০৮ : ৫১৮)। বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস – এই ত্রয়ী চণ্ডীদাসের প্রথমজন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে'র রচয়িতা, দ্বিতীয় জন পদাবলি গানের রচয়িতা এবং শেষোক্তজন, দীনচণ্ডীদাসকে চৈতন্যোত্তর কালের কবি বলে ধারণা করা হয় (নীলরতন সেন ২০০০ : ৯৫)। দ্বিজ চণ্ডীদাসকেই 'পদাবলির চণ্ডীদাস' হিসেবে বিবেচনা করা হয় – যার পদের রসাস্বাদন করেছিলেন শ্রীচৈতন্য (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ : ১০৩)। পদাবলির চণ্ডীদাস মধ্যযুগের সীমা অতিক্রম করে রসপিপাসু মানুষের অন্তরে স্থায়ী হয়ে আছেন।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু চণ্ডীদাসকে অকৃত্রিম বাঙালি কবি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি বাংলা কবি-ভাষার জনক। 'কাহারো কাব্যে এমন করিয়া জাতির দেহজীবন ও প্রাণজীবন এক প্রবাহে নির্গলিত হয় নাই' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২০০৮ : ৪৬)। চণ্ডীদাসকে আক্ষেপানুরাগের শ্রেষ্ঠ কবি বিবেচনা করা হয়। তিনি সাধক এবং কবি। কামগন্ধহীন রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে আঁকতে গিয়ে তাঁর প্রেমসাধনা এবং অধ্যাত্মসাধনা শেষপর্যন্ত একবৃন্তে বিকশিত হয় :

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণপতি হৈও তুমি ॥
(চণ্ডীদাস ১৩৪১ : ১৪৭)

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-কবিদের ন্যায় রাধারমণের চিন্তা-চেতনা জুড়ে আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব। চণ্ডীদাস-সমস্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও পদাবলির চণ্ডীদাস 'প্রাকচৈতন্য যুগের কবি' বলেই বিবেচিত (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ : ১০৩)। ফলে দুজন কবির মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল হবার সম্ভাবনা অনুমান করা যায়। তবে 'বাংলা কবি-ভাষার জনক' চণ্ডীদাসের প্রভাব পরবর্তী কবিদের ওপর ব্যাপক। রাধারমণও এই প্রভাবের বাইরে নন।

রাধারমণের পদে আমরা চণ্ডীদাসের কবি-ভাষার উপস্থিতি লক্ষ করব। কখনো সে-ভাষার নৈকট্য এতো বেশি যে, তা দুজন কবির কালগত ব্যবধানকে অতিক্রম করে যায়। উপমা-উৎপ্রেক্ষা কিংবা রূপকল্প নির্মাণে রাধারমণের কবিতায় চণ্ডীদাসের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায় :

চণ্ডীদাসের পদ : ক. বন পোড়ে, আগ বড়ায়ি! জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
(চণ্ডীদাস ১৯৯৮ : ৬৪)

খ. পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়।
তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায় ॥
(চণ্ডীদাস ২০১০ : ৪৫)

গ. ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হঞা উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি ॥
(চণ্ডীদাস ২০১০ : ৪৮)

ঘ. সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
(চণ্ডীদাস ২০১০ : ৬৬)

রাধারমণের পদ : ক. (১) বন পোড়ে সকলে দেখে মনের আগুন কেউ না দেখে
বিনা কাষ্টে জ্বলছে আগুন আমার রিদের মাঝে।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৮২)

(২) যেমন কুমারের ফণী ভিতরের অগ্নি বাইরে কেউ দেখে না
হৃদয় চিরিয়া দেখ গো সজনী জল দিলে তবু নিবে না।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩১)

খ. শ্যামরূপ হেরিলাম গো কদম্বের তলে
তুষের অনলের মত অঙ্গ মোর জ্বলে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৪০)

গ. এপারে বন্ধুয়ার বাড়ি মধ্যে ক্ষীরোদ নদী।
উড়িয়া যাইবার সাধ করে পাখা না দেয় বিধি ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৮)

ঘ. বুকে রইল গো পিরিতের শেল কেউ দেখে না
কেউ দেখে না কেউ দেখে না বাহিরেতে আসে না গো।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩১৮)

লক্ষণীয়, চণ্ডীদাসের প্রভাব ব্যাপকভাবে রাধারমণের পদে উপস্থিত। 'বন এবং মন পোড়া','কুমারের পণি', 'তুষের অনল', 'পিরিতের শেল', 'পাখি হবার বাসনা' প্রভৃতি শব্দ-উপমায় দুই কবির ভাষিক ঐক্য পরিস্ফুট।

তবে এই সাদৃশ্য বা প্রভাব কেবল অলংকারে সীমাবদ্ধ থাকেনি, কখনো তা পুরো পদেই আধিপত্য বিস্তার করেছে। রাধারমণের কোনো কোনো পদে চণ্ডীদাসের প্রভাব এমনই যে, পদগুলোকে আমাদের নিকট মনে হয়েছে ছায়াপদ। একথা কাব্যের রূপ বা আঙ্গিকের মতোই ভাবগত দিকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমান সত্য। চণ্ডীদাস এবং রাধারমণের মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাসে মিল রয়েছে – দুজনই সহজিয়া-বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। চণ্ডীদাসের ধর্মবিশ্বাস (ক্ষেত্র গুপ্ত ১৪০৩ : ৫৯, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২০০৮ : ৩৪-৩৮) সরাসরি প্রভাব না ফেললেও রাধারমণের কাব্যে তাঁর প্রেম-সাধনার প্রভাব রয়েছে। চণ্ডীদাসের রাধার প্রাণের আকুতি, কৃষ্ণের প্রতি জীবন-মরণের সমর্পণ যেমন কেবল রাধার থাকেনি, কবি এবং রাধা কোথাও-বা একাকার হয়ে গেছেন। রাধারমণের কবিতায়ও তেমনি আবেগের প্রকাশ লক্ষ করার মতো। চণ্ডীদাস-রজকিনীপ্রসঙ্গ রাধারমণের পদে উল্লেখিত হয়েছে। 'কামগন্ধ'হীন যে প্রেমের আরাধনা চণ্ডীদাস করেছেন, তারই অনুসরণ আমরা রাধারমণের পদে লক্ষ করি। আবার, কামনার প্রসঙ্গ যদি কোথাও এসে থাকে, তা প্রাসঙ্গিকতার সীমাকে অতিক্রম করে যায়নি।

৭.৫ জ্ঞানদাস

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদাবলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ তত্ত্ব-দর্শনের সীমানায় পূর্ববর্তী কবিদেরই অনুসরণ করেছেন। জ্ঞানদাস কেবল চৈতন্যোত্তর সাহিত্যের নয় – পদাবলি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্ধমান জেলার কাঁদড়া-মাঁদড়া গ্রামে (বর্তমানে কেতুগ্রাম) জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাতলাভে বঞ্চিত জ্ঞানদাস বাল্যকালে নিত্যানন্দকে দেখেছেন বলে অনুমান করা হয় (নীলরতন সেন ২০০০ : ১১৭)। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর জ্ঞানদাস বৈষ্ণবসমাজের নেত্রীস্থানীয় নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবীর 'মন্ত্রশিষ্য' হয়েছিলেন (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-১১ : ৪৬৯)। সুতরাং, জ্ঞানদাসের মানসগঠনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব থাকার যৌক্তিকতা রয়েছে।

চৈতন্যপূর্ব সাহিত্যে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস দুই প্রধান কবি এবং বৈষ্ণবপদাবলির রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার বর্ণনায় দুটি ধারার প্রবর্তক (নীলরতন সেন ২০০০ : ১১৬)। ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করার শৈল্পিক পাণ্ডিত্য এবং নাগরিক রুচিবোধ এবং জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা বিদ্যাপতিকে পদাবলি সাহিত্যের চূড়ায় যেমন আসীন করে, তেমনি গভীর ভাবানুভূতি এবং প্রকাশের সারল্য – মিলনের গভীরে লুকায়িত বিচ্ছেদের বীজ প্রত্যক্ষ করে রাধাকৃষ্ণের মিলনেও বিচ্ছেদের মর্মযাতনার বিরহগীতি চণ্ডীদাসকে রসপিপাসী বাঙালি পাঠকের অন্তরে স্থায়ী আসনে বসিয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। নায়িকার রূপবর্ণনা, অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার তীব্রজ্বালা, মিলনের ব্যাকুলতা, বিরহের আর্তিতে জ্ঞানদাসের দক্ষতা চণ্ডীদাসের সমতুল্য। তপস্বিনী রাধার মূর্তিনির্মাণে ভাষার নিরাভরণ ব্যবহারে দুই কবির সাদৃশ্য এত বেশি যে কখনো-বা এদেরকে আলাদা করা যায় না (ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৯৯৮ : ১১৩)। চণ্ডীদাসের পদে ভাবের গভীরতা যেমন বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত, জ্ঞানদাসের পদে হয়তো তা এতটা প্রকটিত নয়। তবে জ্ঞানদাস

অনন্য হয়ে আছেন চণ্ডীদাসের মতো কেবল রাধার বিরহীভাবের প্রকাশে নয়, বিরহের পাশাপাশি হর্ষোৎফুল্ল মিলন-ব্যাকুল নায়িকার চিত্রণে।

রাধারমণের পদে আমরা যে ভাষার সারল্য এবং আবেগের প্রবলতা লক্ষ্য করি জ্ঞানদাস তার পূর্বসূরিদের একজন। জ্ঞানদাস 'বৈষ্ণব ধর্মসাধনা এবং ভক্তিমার্গে অবিচল নিষ্ঠা নিয়েই পদরচনা করেছেন' (ক্ষেত্র গুপ্ত ১৪০৩ : ৬৭)। ফলে চৈতন্যোত্তর পদাবলির রীতি অনুসরণে গৌরচন্দ্রিকার পদও রচনা করেছেন। রাধারমণের ক্ষেত্রেও আমরা একই রীতির উপস্থিতি লক্ষ করি। তবে বিষয়ের পাশাপাশি রাধারমণের কবিতার ভাষাভঙ্গি নির্মাণে জ্ঞানদাসের প্রভাব রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন :

জ্ঞানদাসের পদ :

ক. কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে।
অপরূপ রূপ কদম্ব মূলে ॥
(জ্ঞানদাস ২০১০ : ৩৯২)

খ. নিতি নিতি রাই যমুনা সিনানে।
না শুনি না দেখি তার পদ কোন দিনে ॥
(জ্ঞানদাস ২০১০ : ৩৯১)

গ. শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুখের দুখি তেঞি তোরে কই ॥
(জ্ঞানদাস ২০১০ : ৪৩৫)

রাধারমণের পদেও আমরা একই ভাষারীতির প্রয়োগ লক্ষ করি :

ক. কি রূপ দেখছনি সজনী সই জলে ।
এগো নন্দের সুন্দর চিকণ কালা থাকে তরুমূলে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৬৭)

খ. নিতি নিতি ফুল বাগানে ভমর আসে মধু খায়
আয় গো ললিতা সখী আবার দেখি শ্যামরায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৬)

গ. কি রূপ হেরিনু পরান সই
সাধ করে তারে হৃদয়ে থুই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮২)

কবিতার প্রারম্ভিক শব্দ থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যমিল – অনেক স্থানেই দুই কবির সাযুজ্য লক্ষ করার মতো। কালার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে যে চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে তাতেও জ্ঞানদাসের কবিতার প্রভাব রাধারমণের পদে পরিস্ফুট। জ্ঞানদাসের পদে আমরা লক্ষ করি কৃষ্ণের নিকট রাধার বাঁশিবাদন শিক্ষার প্রচেষ্টা। এপ্রসঙ্গে প্রতিরন্ধ্রের সুরবৈশিষ্ট্য রাধা শিখতে চায় :

কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশি অতি অনুপাম।
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশি সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কেকা-রবে নাচে ময়ূরিণী ॥
(জ্ঞানদাস ২০১০ : ৪২৫)

রাধারমণের পদে যেন সেই প্রতিরন্ধ্রের সুর-বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ। যদিও প্রকাশরীতি কিছুটা ভিন্ন, তবে বিষয় একই – বাঁশির রহস্যময় সুর-উৎসারী রন্ধ্র। যেমন :

প্রথম রন্ধ্রের গানে মধুর পরশিল কানে
গৃহকর্ম মনে নাহি আর ॥
দ্বিতীয় রন্ধ্রের গানে তনুমন সদা টানে
কেবা পারে ধৈর্য ধরিবার।
তৃতীয় রন্ধ্রের গানে ঋষি মুনি ভঙ্গ ধ্যানে
কুল নাহি গৃহে থাকা ভার ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৩৭)

রাধারমণের গানে রয়েছে ভ্রমরকে উদ্দেশ্য করে রচিত পদ। দূতী-সখীরা রাধার খবর কৃষ্ণের নিকট পৌঁছে দেয়। তবু রাধারমণের রাধা ভ্রমরের নিকট মনের আকুল আর্তি প্রকাশ করে :

রে ভ্রমর কইয়ো গিয়া –
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া ॥
ভ্রমর রে কইয়ো কইয়ো, হায় রে ভ্রমর,
প্রাণ বন্ধের লাগ পাইলে–
আমি রাধা মইরে যাব কৃষ্ণহারা হইয়া ॥
...ভ্রমর রে, ভাইবে রাধারমণ বলে কান্দিয়া কান্দিয়া
নিবি ছিল মনেরি আগুইন – আগুইন কে দিল জ্বালাইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৬৭)

জ্ঞানদাসের রাধাও ভ্রমরকে দূত করে খবর পাঠায়। মথুরাবাসী মধুকর যেন বিরহিণীর খবর পৌঁছে দেয় :

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখেতে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কিবা কাজ ॥
ব্রজবাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আঁখি
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহঅনল একে তনু খীণ শ্যামশোকে
নিভান অনল দিলা জ্বালি ॥
(জ্ঞানদাস ২০১০ : ৪৬৪)

বিরহের অনলে দুই কবির রাধারই করুণ অবস্থা ফুটে উঠেছে। ভ্রমরকে দেখে রাধার বিরহ যে জেগে উঠেছে – শেষোক্ত চরণে তারই প্রকাশ। রাধারমণের পদের ভাষায় আঞ্চলিকতা স্পষ্ট। তবে তাতে রাধার অন্তর্দহন কম হয়নি। বরং ভ্রমরের প্রতি রাধার সম্বোধনে যে দরদি মিনতি ঝরে পড়ে, তা তুলনা রহিত। যদিও 'মনের অনল জ্বেলে দেয়ার' প্রসঙ্গে রাধারমণের পদে জ্ঞানদাসের প্রভাব স্পষ্ট – একথা বলা যেতে পারে।

৭.৬ গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে মুর্শিদাবাদ জেলার বধুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। প্রথম জীবনে শক্তি-উপাসক থাকলেও পরবর্তীতে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর সাহিত্যের বিকাশ ঘটে বৈষ্ণব-মতাদর্শী হওয়ার পরে (নীলরতন সেন ২০০০ : ১৬২)। তবে 'তাঁর কাব্যচেতনার তীক্ষ্ণতা ধর্মবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি' (ক্ষেত্র গুপ্ত ১৪০৩ : ৭৮)। গোবিন্দদাস ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রের এক অসাধারণ পণ্ডিত। বিদ্যাপতির অনুসারী হিসেবে তিনি পরিচিত – দুজনই 'ব্রজবুলি' ভাষায় পদ রচনা করেছেন। অল্পকিছু সংখ্যক বাংলা পদ ব্যতীত গোবিন্দদাসের সাত শতাধিক পদের সকলই ব্রজবুলিতে রচিত (নীলরতন সেন ২০০০ : ১৬২)।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু গোবিন্দদাসকে সৌন্দর্যের কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে 'সংযমবুদ্ধি'র প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তাতে কাব্যে স্থাপত্যধর্মিতার পরিচয় ফুটে উঠেছে বলে অভিমত প্রদান করেন। পূর্বরাগ, মাথুর ও অভিসারের পদে গোবিন্দদাসের পদ সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল।

গোবিন্দদাসের কাব্যে তত্ত্বের গুরুত্ব স্বীকার্য। তবে তাঁর কাব্যে রূপদক্ষ শিল্পীর সঙ্গে বৈষ্ণবভক্তের সম্মিলন ঘটেছে। প্রবল ভক্তির ভাবাবেগে শিল্পী এবং শিল্পের একাত্ম হওয়ার যে দৃষ্টান্ত আমরা চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রত্যক্ষ করি, গোবিন্দদাসে তা অনুপস্থিত। তত্ত্বের অধ্যাত্মিকতা কাব্যরসকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি (নীলরতন সেন ২০০০ : ২০০-২০১)। গোবিন্দদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্য যতটা কাব্যিক এবং রসোত্তীর্ণ হয়ে বিকশিত হয়েছেন, অন্যত্র তা নয় (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৯৯৭ : ১১৭)।

রাধারমণের পদেও আমরা চৈতন্যবিষয়ক পদের প্রাচুর্য দেখি। তবে এক্ষেত্রে লোককবির সঙ্গে নাগরিক কবির মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। লোককবির কবি-ভাষা মাটির আঘ্রাণস্পর্শী, স্থাপত্যের সৌকর্য সেখানে অনুপস্থিত। গোবিন্দদাস রূপদক্ষ শিল্পী, রাধারমণ ভাবমুগ্ধ। তবুও, কবির পদে অলংকারের নির্মিতিতে গোবিন্দদাসের উপস্থিতি রয়েছে বলেই মনে হয় :

ক. নীরদ-নয়ন নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
(গোবিন্দদাস ১৯৬১ : ১২)

খ. পহিলহি রাধা মাধব মেলি
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি।
(গোবিন্দদাস ১৯৬১ : ১৫০)

গ. শুন শুন সুন্দরী বিনোদিনী রাই।
তোঁহা বিনু কারু নই তোঁহারি দোহাই ॥
(গোবিন্দদাস ২০১০ : ৬৮৮)

রাধারমণের পদ :

ক. নবীন নীরদ শ্যাম লাগল নয়নে গো
নিরুপম রূপমাধুরী পীত বসনে।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ২৪৯)

খ. পহিলহি রাগ নয়নের কোণে
কালা সে নয়ান তারা।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ২৫১)

গ. শুন শুন বিনোদিনী আমার বচন
ঘন ঘন বাঁশি বাজে গহন কানন।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৩৬৫)

দুই কবির ভাবের পার্থক্য আছে। তবে ভাষায় – বিশেষ করে শব্দচয়নে রাধারমণের কবিতায় গোবিন্দদাসের পদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। পদে 'নীরদ', 'নয়ন', 'পহিলহি', 'শুন শুন', 'বিনোদিনী' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে কিংবা রূপক-অলংকার নির্মাণে রাধারমণের পদে পূর্ববর্তী কবির ঋণ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

নায়িকার বারমাসের বিরহবর্ণনা সাহিত্যের বিশিষ্টরীতি। রাধারমণের পদেও আমরা এই কাব্যরীতির প্রকাশ লক্ষ করি। এক্ষেত্রেও লোককবি নাগরিক কবির মুখাপেক্ষী – বলা যায়।

রাধার বিরহের বর্ণনা একটি পদে অঘ্রান মাস থেকে আরম্ভ করেছেন গোবিন্দদাস – রাধারমণের রাধার বিরহের সূচনা চৈত্র মাস থেকে। তবে দুএকটি মাসের বিরহের বর্ণনায় গোবিন্দদাসের পদের ছায়া লক্ষ করার মতো। যেমন :

গোবিন্দদাসের পদ : আওত চৈত চিত কত বারব
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মননথ ফুলশরে হানই
কানু রহল দূর দেশ ॥
(গোবিন্দদাস ২০১০ : ৬৬০)

রাধারমণের পদ : চৈত্রমাসের দিন নিদ্রার আবেশ
আমারে ছাড়িয়া (ঠাকুর) কৃষ্ণ রইলা কোন দেশ।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৬১)

দুই কবির রাধাই কৃষ্ণের 'দূর দেশ' অবস্থানে বিষণ্ন। এদিকে মাস গণনা করে রাধা দিন অতিবাহিত করে। গোবিন্দদাসের রাধার বিরহের অবসানে অপেক্ষার সমাপ্তি হয় ব্যর্থতায়। রাধারমণের রাধার অপেক্ষার সমাপ্তি ফাল্গুন মাসে 'আবিরের বৃষ্টির' মধ্যে কৃষ্ণের আগমনের মাধ্যমে।

৭.৭ দীন ভবানন্দ

দীন ভবানন্দকে অষ্টাদশ শতকের কবি বলে অনুমান করা হয় (মোস্তফা সেলিম ২০১১ : প্রসঙ্গ-কথা)। সিলেটে জন্মগ্রহণকারী এই কবি মূলত রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা নিয়ে গান রচনা করেছেন। সিলেটের গীতিসাহিত্যে যাঁরা 'সোনালি ফসল' ফলিয়েছেন দীন ভবানন্দ তাঁদের অন্যতম (মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ১৯৯৯ : ৩৯৩)। পদাবলির রীতির এই গানে মান, অভিসার, মিলন পর্যায়ের পদ থাকলেও বিরহের পদই সংখ্যায় বেশি। এবং বিরহও পদাবলির রীতি অনুযায়ী প্রধানত রাধারই।

পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে দীন ভবানন্দই সম্ভবত স্থান এবং কালের বিচারে রাধারমণের নিকটবর্তী, যিনি পদাবলি রচনায় উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। রাধারমণের রচনায় দীন ভবানন্দের বৈষ্ণব পদের প্রভাব লক্ষ করার মতো। রাধার বিরহের আর্তি প্রকাশে ভবানন্দের পদ :

ক. রাধা মইলে না পুড়িও না ভাশাইও জলে
রাধারে বান্দিআ থুইও তামাল বিরক্কের ডালে।
(দীন ভবানন্দ ২০১১ : ৮০)

খ. দিন ভবানন্দে বলে নাথ শুনরে কালিআ
পর কি আপনা হএ পিরিতের লাগিআ।
(দীন ভবানন্দ ২০১১ : ৮১)

রাধারমণের পদেও আমরা বিরহিণী রাধাকে দেখি, যে মরণে আগুনে ছাই হতে চায় না, কিংবা জলে ভেসে যেতে চায় না – তমালের ডালে প্রাণনাথের দোসর হতে চায়; কিংবা, কৃষ্ণের জন্যে বিরহের স্মারক হতে চায় :

ক. আমি মইলে ঐ করিও না পুড়াইও না ভাসাইও
আমারে বাইন্দা রাইখ ঐ তামালের ডালে।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৬০)

খ. ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পরা কি আপনার হয় পিরিতের লাগিয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৩৯৪)

দীন ভবানন্দ এবং রাধারমণ – দু'জনেরই প্রেমবিষয়ে সিদ্ধান্ত এক – প্রেমের জন্যে পর কখনো আপন হয় না। দুই কবির ভাবপ্রকাশের ভাষাও প্রায় এক-ই। আবার, বাসকসজ্জার প্রতীক্ষায় আমরা দেখি, ভবানন্দের রাধা প্রতিপ্রহরে প্রতীক্ষায় ক্রমশ নিজেকে তৈরি করছে। অন্তরে অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা নিয়ে রাধা অপেক্ষা করে :

এক পর রাত্রি যাইতে রে বন্ধু জ্বালাই মোমের বাতি
তুই বন্ধু আসিবে বলি জাগিয়া পোষাই রাতি রে ॥
দুই পর রাত্রি যাইতে রে বন্ধু আউলাই মাথার কেশ
তুই বন্ধু আসিবে বলি ধরি নানান বেশ রে ॥
তিন পর রাত্রি যাইতে রে বন্ধু চালে পড়ে কুয়া
তুই বন্ধু আসিবে বলি সাজাই পান তামুক গুয়া রে ॥
(দীন ভবানন্দ ২০১২ : ১৪৭)

রাধারমণের রাধা অবশ্য প্রতীক্ষার ভার যেন নিতে পারছে না। শেষে লজ্জায় সংকোচিত রাধা তবু প্রতীক্ষার প্রহর গোনে :

এক প্রহর রাত্র বন্ধু আউলাইল মাথার কেশ
বন্ধু আসিবে বলি ধরি নানান বেশ ॥

দুই প্রহর রাত্র বন্ধু বাটা সাজাইল পান
বন্ধু আসিবে বলি পাইলাম অপমান ॥
তিন প্রহর রাত্র বন্ধু গাছে ফুটল ফুল
নিশ্চয় জানিও বন্ধু গন্ধে ব্যাকুল ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৩৭৯)

প্রাণসখার জন্য নানা সাজে নিজেকে সজ্জিত করা – কিংবা পানের বাটা সাজানোর বর্ণনায় ভবানন্দের অনুকরণ লক্ষণীয়। তবে, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ফুল ফোটার চিত্র অঙ্কনে রাধারমণের পদটি বিশেষ রূপ লাভ করেছে।

চরিত্র চিত্রণে, পরিবেশ তৈরিতে এবং কাঙ্ক্ষিত রস সৃজনে শিল্প-উপকরণের যে সার্থক ব্যবহার আমরা রাধারমণের পদে লক্ষ করি, তাতে দীন ভবানন্দের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

৭.৮ সৈয়দ শাহনূর

সৈয়দ শাহনূর (১৭৩০-১৮৫৫) লোকগানের বিশিষ্ট কবি (সুমনকুমার দাশ ২০১২ : ৭৩৯)। তিনি হবিগঞ্জ জেলার জালালাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান এবং জীবনকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের মতে, শাহনূর ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'উচ্চদরের দরবেশ' শাহনূর ছিলেন স্বভাব কবি। তিনি ভাবাবেগে বিভোর হয়ে গান গাইতেন – শিষ্যগণ তা অমূল্য সম্পদ ভেবে আয়ত্ত করতো (মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৩৮৪ : ২৮)। তাঁর গানে বাউল ও সুফি ধারার সম্মেলন ঘটেছে বলে অনুমিত হয়। যেমন :

ক. অকালে মরিব নাও সমুদ্রে ডুবাইয়া
আল্লা কতদিনে লওয়াইবায় কূল
ও মুর্শিদ কতদিনে লওয়াইবায় কূল ॥
(সৈয়দ শাহনূর ২০১২ : ১৬৪)

খ. তুমি চিনলায় না রে মন
একই মন্দিরে বাসা না হইল মিলন ॥
একই আশা একই বাসা একই ঘরের ধন
একই ঘরে থাকতে কেন না হইল মিলন ॥
(সৈয়দ শাহনূর ২০১২ : ১৭১)

তাঁর গানে আল্লাহ কিংবা মুর্শিদকে উদ্দেশ্য করে যেমন আকুতি ঝরে পড়ে, তেমনি দেহকেন্দ্রিক সাধনা-ভজনও প্রকাশিত। তবে এর সাথে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবীয় রীতির প্রেমতত্ত্বের পরিচয় গোপন থাকে না :

আইস আইস আরে বন্ধু করি নিবেদন
অবলা রাধারে বন্ধু দেও দরশন ॥
মিনতি করিয়া রাধে কহিলে চরণে
তোমার শোকে পরাণ ঝরে দহে কামবাণে ॥
(সৈয়দ শাহনূর ২০১২ : ১৭৫)

রাধারমণ মূলত রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথাকে তাঁর সাধন-ভজনের বিষয় করে গান রচনা করেছেন। সে হিসেবে তিনি পূর্ববর্তী কবি সৈয়দ শাহনূরের কাব্যচর্চার উত্তরাধিকারী। ফলে, গানের ভাব-ভাষার দ্বারা কোথাও তিনি প্রভাবিত হয়েছেন – এ অনুমানকে দৃঢ় করবে দুএকটি উদাহরণ :

সৈয়দ শাহনূরের পদ : বন্ধু তোর লাইগা রে আমার তনু জর জর
মনে হয় ছাড়িয়া যাইতাম থইয়া বাড়ি ঘর ॥
অরণ্য জঙ্গলার মাঝে আমার একখান ঘর
ভাইও নাই বান্ধব নাই কে লইব খবর ॥
(সৈয়দ শাহনূর ২০১২ : ১৭৪)

রাধারমণের পদেও আমরা একই প্রাণময় আকুতি এবং কৌতূহলী জিজ্ঞাসা ঝরে পড়তে দেখি। যেমন :

ওরে মন কুপথে না যাইও
ঘরে বসি হরিনাম নিরবধি লইও ॥
অরণ্য জঙ্গলার মাঝে বানাইয়াছি ঘর
ভাই নাই বান্দব নাই কে লইব খবর ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৮৫)

শাহনূরের মতোই রাধারমণের ঘর 'অরণ্য জঙ্গলার মাঝে'। তাঁর খোঁজ-খবর করবে এমন কেউ নেই। নিঃসঙ্গতাই দুই কবির সঙ্গী। সৈয়দ শাহনূরের 'বন্ধু' এবং রাধারমণের 'হরি' আপাত আলাদা হলেও, দয়াময় কৃপার সাগর রূপে কখনো-বা অভিন্ন হয়ে যায় – সাধন-ভজনের ভাব-ভাষার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

৭.৯ শিতালং শাহ

লোককবি শিতালং শাহ (১৮০০-১৮৮৯) সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার শ্রীগৌরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শিতালং শাহর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ সলীম শাহ। 'শিতালং' তাঁর গুরুপ্রদত্ত নাম। মাদ্রাসা-শিক্ষিত শিতালং সিলেটের ফুলবাড়ির মাওলানা আবদুল ওহাবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মারফতি পন্থায় দীক্ষিত হয়ে গুরুর নিকট নতুন নাম প্রার্থনা করলে নতুন নামে পরিচিত হন ঊনবিংশ শতকের এই সাধক-কবি (মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ২০০৫ : ১০)।

শিতালং শাহ মূলত সুফি তত্ত্বাশ্রয়ী লোককবি। তাঁর গানে ইসলামি ভাবধারার প্রতি প্রবল প্রীতি লক্ষ করা যায়। ভাবুক-সাধকের হৃদয়ের আকুলতা তাঁর গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে (মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ২০০৫ : ১০)। সুফিবাদী ভাবধারার বাইরে শিতালং শাহ 'রাধাকৃষ্ণ'কে অবলম্বন করে অনেক গান রচনা করেছেন। তবে তিনি 'বৈষ্ণব সাধক' বা 'সুফি' ছিলেন না। তাকে বাউল বলাও সমীচীন নয়। (চৌধুরী গোলাম আকবর ২০০৫ : ১৮) তবে, রাধাকৃষ্ণ প্রতীকমাত্র – আল্লাহ রসুল তার প্রকৃত কাম্য (মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ২০০৫ : ১০)।

শিতালং শাহ ঊনবিংশ শতকের সময়সীমায় জীবন-কাল অতিবাহিত করেছেন। রাধারমণ (১৮৩৪-১৯১৫) একই শতকের লোককবি হলেও তাঁর জন্ম কয়েক দশক পরে এবং শিতালং শাহর মৃত্যুর পরেও কয়েক দশক জীবিত ছিলেন। দুই কবি একই অঞ্চলে বসবাস করার ফলে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত বা সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাকে খাটো করা যায় না। দুই কবির পদকে পাশাপাশি পাঠ করলে কিছু অলংকার-নির্মাণ বা কবিভাষায় সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শিতালং শাহর পদ :

যোগিনী অইলাম শ্যাম তোমার পিরিতে মজিয়া
জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরি উদাসিনী অইয়া
ক্ষুধা নিদ্রা নাই বন্ধু উদাসিনী হইয়া
তুষের আনলের মত জ্বলে ঘইয়া ঘইয়া।
(শিতালং শাহ ২০০৫ : ১৩৭)

রাধারমণের পদে আমরা দেখি অন্তর্দহনকে 'তুষের আনলে'র সাথে তুলনা দেয়ার একই রীতি :

কারে দেখাব মনের দুঃখগো আমি বুক চিরিয়া
অন্তরে তুষেরই অনল জ্বলে গইয়া গইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৪৩৭)

এখানে, 'গইয়া' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে – যেমনটা শিতালং শাহ'র গানে 'ঘইয়া' হয়েছে। সিলেট অঞ্চলে এই শব্দযুগলের অর্থ 'ধিকি ধিকি' বা ধীরে ধীরে। অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণের পার্থক্য সত্ত্বেও গোপন

অন্তর্দহন অর্থে 'গইয়া গইয়া' (জ্বলা) ব্যবহৃত হয়। এ অন্তর্দহন দুই লোককবির, একই সঙ্গে সাধকের। দুই কবির কাব্যসাধনার সাদৃশ্যের আরও একটি উদাহরণ :

শিতালং শাহর পদ :

প্রথম প্রহর নিশিনাথ ফুটে নাগেশ্বর
বিরহিণী হৈয়া ঝুরি আইস প্রাণেশ্বর।
...
দ্বিতীয় প্রহরে ফুটে বন্ধু চামেলি গোলাব
প্রাণরক্ষা করনাথ আসিয়া সিতাব।
...
তৃতীয় প্রহরে ফুটে নাথ সেউতির ফুল
মদন শোকেতে প্রাণী মোর বিরহে আকুল।

(শিতালং শাহ ২০০৫ : ১৮৬)

রাধারমণের পদেও আমরা রাত্রির প্রতি প্রহরের বর্ণনার মাধ্যমে রাধার প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠার তীব্রতা প্রকাশিত হতে দেখি।

শিতালং শাহ'র মরমি বা বৈষ্ণবীয় রীতির গান সিলেট অঞ্চলে এখনো বেশ জনপ্রিয়। কবির গানে 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা মূলত রাধার বিরহ অনল ও প্রেমনিবেদন ও ভাবাবেগের আড়ালে নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ' (শামসুল করিম কয়েস ২০১২ : ১৮৬)। আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করে জাতীয়ভাবেও তাঁর কোনো কোনো গান শ্রোতাদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর গানের কথা ও সুর হৃদয়গ্রাহী। ফলে শিতালং শাহ'র গানদ্বারা রাধারমণ মুগ্ধ হয়ে থাকতে পারেন এবং তাঁর সৃজনশীলতায় প্রেরণা জোগাতে ভূমিকা রাখতে পারে।

লোকসাহিত্যের ধারাবাহিকতায় দু'জন কবি পরস্পরের নিকট ঋণী – কিংবা, দু'জনই একই লোকরীতির অনুসারী, একথা বলা যায়।

৭.১০ কালাশাহ

কালাশাহ (১৮২০-১৯৬৯) সুফিধারার লোককবি। সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার ধাইপুর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এই কবি প্রায় চারশত গান লিখেছেন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন (সুমনকুমার দাশ ২০১২ : ৭৪১)। 'অসাম্প্রদায়িক' চেতনার অধিকারী কবি কলাশাহ ছিলেন 'নিষ্ঠাবান মাওলানা, স্বভাবকবি ও উচ্চাঙ্গের সুফিসাধক' (নন্দলাল শর্মা ২০১৪ : ১০)। প্রায় দেড়শত বছর জীবনকালে তিনি পরমকে পাওয়ার সাধনা করেছেন। এই সাধনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গানে।

সমসাময়িক এই কবির গানের বিষয়ের সাথে রাধারমণের গানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। রাধারমণের গানে 'গুরুভক্তি' তাঁর সাধনার অংশ হিসেবে প্রকাশিত। গুরুকে নিয়ে রাধারমণের রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি :

ক. গুরুর চরণ অমূল্যধন সার করিবে কবে
বন্ধু কে আর ভবে।
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৭৭)

খ. ভাবিয়া রাধারমণ বলে গুরু পরম সার
কৃপা করি পুরাও গুরু বাসনা আমার ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৭২)

কালাশাহর লক্ষ্যও গুরুর করুণা। 'গুরু' বা 'মুর্শিদ'-এর কৃপাপ্রার্থী দুই কবির পদে মিল বা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে বলেই অনুমান করা যায়। তবে কালা শাহর 'মুর্শিদ' কিংবা রাধারমণের বৈষ্ণবীয় 'গুরু' বা প্রেমাস্পদ দু'জনেই যে 'লোহা'কে 'সোনা' বানানোর পরশমণি, তা প্রকাশ পায় নিম্নোক্ত পদে :

কালাশাহর পদ : আমার মুর্শিদ পরশমণি গো, লোহারে বানাইল কাঞ্চা সুনা।
মুর্শিদ রতন অমূল্য ধন, জীবন থাকতে চিনলাম না ॥
(কালাশাহ ২০১৪ : ১৬৪)

রাধারমণের পদ : আর আমার বন্ধু পরশমণি
কতো লোহা বানায় সোনা গো ॥
আর সকলের জ্বালা যেমন-তেমন
আমার বন্ধের জ্বালা দুনা গো ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০৯ : ২৬১)

কালাশাহর মতো রাধারমণও সুনামগঞ্জের অধিবাসী। ফলে স্থান ও কালের নৈকট্যের কারণে ভাবকে ভাষারূপ দিতে গিয়ে রাধারমণ কালা শাহর ভাষাদ্বারা কোথাও-বা প্রভাবিত হয়েছিলেন – এমন অনুমান করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

পরবর্তী কবিদের রচনায় রাধারমণের প্রভাব

রাধারমণ লোককবি। মৃত্যুর প্রায় শত বছর পরেও তাঁর গান বা পদ লোকমুখে আনন্দের সাথে উচ্চারিত। সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে লোকসমাজে তাঁর গান যেমন জায়গা করে নিয়েছে, তেমনি কোথাওবা সাধন-ভজনের উপায় হিসেবেও গৃহীত হয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, শিল্পের কিংবা সাধনার সার্থকতাই এর পেছনে ক্রিয়াশীল। যার ফলে, কেবল সাধারণ শ্রোতা বা পাঠক নন, তিনি আগ্রহের কারণ হয়েছেন অনেক লোককবি বা শিল্পী-সাধকের। তাঁদের গীত কোনো কোনো গানে বা কবিতায় রাধারমণে তাঁদের মুগ্ধতার পরিচয় ফুটে ওঠে। আমরা প্রখ্যাত কয়েকজন লোককবির রচনায় রাধারমণের শিল্প-সাধনার প্রভাব লক্ষ করি এবং তাতে রাধারমণের শিল্প-চর্চার উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। মহৎ শিল্পের এই রীতি – কালের মানসে তা সার্থকতার স্বাক্ষর এঁকে যায়।

আমরা রাধারমণ-পরবর্তী কয়েকজন লোককবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরব এবং তুলনামূলক আলোচনায় রাধারমণের কবিতার সাথে তাঁদের রচনার সাযুজ্য উপস্থাপন করব।

৮.১ শেখ ভানু

শেখ ভানু (১৮৪৯-১৯১৯) হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার ভাদিকারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তিনি লাভ করতে পারেননি। সংসারের অভাব-অনটন ঘোচাতে ব্যবসার কাজ শুরু করেন। সফলতাও আসে একসময়। শেখ ভানু 'ভানুব্যাপারী' নামে পরিচিত হন। ঘটনাক্রমে মানুষের লাশ কাক-কুকুরের খাদ্য হতে দেখে মানুষের পরিণতি উপলব্ধি করে বৈষয়িক কাজকর্মের ইস্তফা দিয়ে পীরের পরামর্শে আধ্যাত্মিক সাধনায় মশগুল হলেন। সাধনার ফসল হলো গজল, মুরশিদি ইত্যাদি। তিনি নিজে লিখতে জানতেন না। সঙ্গীরা তাঁর গান লিখে রাখতেন। 'তত্ত্বজ্ঞানী' মরমি কবি শেখ ভানু রচিত শ'খানেক গান সংগৃহীত আছে। (মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৩৮৪ : ২৭, তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল ২০০৪ : ১৩-২৯, শামসুল করিম কয়েস ২০১২ : ১৯৭-১৯৯)

স্থানীয়ভাবে শেখ ভানু দরবেশ, আউলিয়া, বুজুর্গ হিসেবে পরিচিত; তিনি মূলত কাদেরিয়া ধারার একজন সাধক। কাজী আবদুল ওদুদ শেখ ভানুকে দার্শনিক কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলিম তত্ত্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চার কবির একজন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অন্যরা হলেন – হাছন রাজা, মদন, লালন শাহ (তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল ২০০৪ : ৫১-৫৩)। কয়েকটি উদাহরণে শেখভানুর কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যাবে :

ক. পড় কলেমা শাহাদৎ, শাহাদৎ কলেমার মাঝে তরাইবার পথ
লা-শরীক মাবুদ যে, মনে মনে মানব
মুহাম্মদ রাসুল ঠিক জানি চলব আলবৎ
শাহাদতে তরাইবা পথ ॥
(শেখ ভানু ২০০৪ : ১৪৮)

খ. আমি মরিমু মুর্শিদ ভাবে বুঝা যায়
মরলেনি দয়াল মুর্শিদ তুমি দেখিবে আমায়।
(শেখ ভানু ২০০৪ : ১২৪)

তাঁর পদগুলোতে আল্লাহ, কলেমা, মাবুদ, মুর্শিদ, দয়াল প্রভৃতি শব্দে ইসলামি ভাবধারা বা সুফিধারার তত্ত্বকথাই মূলত প্রকাশিত হয়েছে। তবে শেখ ভানুকে বিজ্ঞজনের নিকট পরিচিতি দিয়েছে তাঁর অনন্য একটি গান –

নিশীতে যাইও ফুলবনেরে ভ্রমরা
নিশীতে যাইও ফুলবনে ॥
নয় দরজা করি বন্ধ লইও ফুলের গন্ধ
অন্তরে জপিও বন্ধের নাম রে ভ্রমরা ॥
(শেখ ভানু ২০০৪ : ১৪৬)

শেখ ভানুর গান মূলত সুফি ধারার এবং কোথাও-বা দেহবাদী বাউলধারা বা তান্ত্রিকধারার পরিচয়ও পাওয়া যায়। আল্লাহ, রসুল, পীর-মুর্শিদ, কলেমা-নামাজ-রোজা ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাঁর গানে বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। তবে কিছুসংখ্যক পদে শেখ ভানু রাধা-কৃষ্ণকে বিষয় করেছেন। যে-পদগুলোকে লোককবির গানের বিষয়ের মৌলপ্রবণতা থেকে আপাত দূরবর্তী বলে মনে হতে পারে। তবে রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত পদগুলোতে রাধারমণের গানের প্রভাব রয়েছে। যেমন :

ক. রাধারমণের পদ : কারে দেখাব মনের দুঃখ গো আমি বুক চিরিয়া
অন্তরে তুষেরই অনল জ্বলে গইয়া গইয়া ॥
কার ফলন্ত গাছ উগারিলাম, পুত্রশোকে গালি দিলাম গো
না জানি কোন অভিশাপে এমন গেল হইয়া ॥
...রাধারমণ ভবে রইল জিতে মরা হইয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৬০)

শেখ ভানুর পদ : কারে বা দেখাইব মনের দুঃখ গো হৃদয় ছিড়িয়া
সোনা বন্ধে মোরে ভুইল্যা গোল গো কুলটা বানাইয়া গো
হৃদয় ছিড়িয়া ॥
...আমি জিয়ন্তে হইয়াছি মরা পিরিতি করিয়া গো
সই পিরিতি করিয়া ॥
(শেখ ভানু ২০০৪ : ১৩৬)

খ. রাধারমণের পদ : সখী যাওগো মথুরায় আমার খবর কইও গিয়া
রসিক বন্ধু কালিয়ায় ॥
নেওগো প্রেমের মালা খানি প্রেমফুল গাথছি তায়–
আমার কথা কইয়া মালা রাখিয়া দিও বন্ধের পায়।
বন্ধে যদি না চিনে গো কইও কইও আমার দায়
তোমার প্রেমের প্রেমিক একজন প্রেম জ্বরে মারা যায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২০৯)

শেখ ভানুর পদ : আমি মরিলাম তার পিরিতের অনলে গো সজনী
ও সজনী বলিও দেখা হলে তারে ॥
ও আমি বন্ধু হারা জিতে মরা
মাথায় মোর কলঙ্কের ডালা গো
ও সজনী বলিও দেখা হলে তারে ॥
(শেখ ভানু ২০০২ : ১২৮)

রাধারমণের বৈষ্ণবপদের ভাব ও ভাষার ইন্দ্রজালে শেখ ভানু আকৃষ্ট হয়েছিলেন – একথা বলা যায়। রাধারমণের রাধার বিরহের যাতনা, অন্তর্ভেদী আর্তি এবং প্রেমাস্পদের দর্শনবঞ্চিত রাধার যে করুণ মূর্তি চিত্রিত হয়েছে, তার প্রভাব শেখ ভানুর পদে বর্তমান। সুফি কবির অন্তর রাধাভাবে বিকশিত হয়ে প্রাণনাথের সাথে মিলনের প্রত্যাশায় ব্যাকুলপ্রাণ। শেখ ভানু এবং রাধারমণের পদে যে শৈল্পিক ঐক্য বর্তমান, তাতে কাল এবং স্থানের নৈকট্য বড় ভূমিকা পালন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৮.২ হাছন রাজা

হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২) মরমি কবি হিসেবে খ্যাত। যে-কজন মরমি কবি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অন্তরে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছেন, হাছন রাজা তাঁদের অন্যতম। তিনি জীবনের গূঢ় রহস্যানুসন্ধানে মর্মে উপলব্ধ ভাবকে গানের আকারে প্রকাশ করেছেন। সাধনার উৎকর্ষ তাঁকে তত্ত্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবির

আসনে সমাসীন করেছে এবং মরমি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি লালনের নামের সাথে তাঁর নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে (আবুল আহসান চৌধুরী ২০০৯ : ৭১৯)।

হাছন রাজাকে লোককবি রাধারমণ দত্তের সমসাময়িক বলা যেতে পারে। হাছন রাজার জন্ম রাধারমণের প্রায় দুই দশক পরে, তবুও কেউ কেউ তাঁকে রাধারমণের বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন (মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৩৮৪ : ২৯, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৯১ : ৪, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ২০০৯ : ৬৭৯)। এরূপ অনুমান করার পেছনে যুক্তি রয়েছে। হাছন রাজা বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন, রাধারমণও তা-ই। লক্ষণশ্রী-রামপাশা এবং জগন্নাথপুরের মধ্যে যে দূরত্ব, তা অতিক্রম করে দুজন মরমি সাধক একে অপরের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন – এ অনুমান কষ্টকল্প নয়।

হাছন রাজা জমিদার ছিলেন। আভিজাত্যের অহংকার এবং বিলাসব্যসনের উত্তরাধিকারী হাছন মর্মে ধারণ করেছিলেন সংসারবিবাগি এক বাউলসত্তাকে – যা ভোগবাদের বিপরীতে এক অনির্বচনীয় আনন্দময় জগতের দিকে তাঁকে নিয়ে যায়। হাছন রাজার গানে 'ঈশ্বরানুরক্তি, নশ্বর পৃথিবী, অনিত্যতার সংসার ও সাধন-ভজনে অক্ষমতার খেদোক্তি – এই বিষয়গুলোই প্রধান' (আবুল আহসান চৌধুরী ২০০৯ : ২৮১)। হাছন প্রচলিত অর্থে বাউল ছিলেন না। তবে বাউলের অসাম্প্রদায়িক জগৎদৃষ্টি তাঁর ছিল। বৈষ্ণব দর্শন, বাউল দর্শন এবং সুফিবাদের মূল যে লক্ষ্য – 'মনের মানুষ' বা প্রেমাস্পদকে পাওয়া হাছন রাজার সাধনায়ও একই প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তিনি প্রেমাস্পদকে 'অন্তরিয়া' বলেছেন। এই অন্তরিয়াই হচ্ছে হাছন রাজার আল্লাহ, খোদা, মৌলা, হরি, গৌরহরি, শ্যাম, ঠাকুর, প্রাণবন্ধু। মুর্শিদ বা প্রেমাস্পদের স্বরূপ দেখে হাছন রাজা আত্মহারা (মোমেন চৌধুরী ২০০৯ : ৭১৫)। 'নিজেকে জানা'র সুপ্রাচীন তত্ত্ব-প্রচেষ্টার সূত্রানুসারী হাছনের গভীর অন্তর্দৃষ্টির উপলব্ধি :

রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে
আমার মাঝত বাহির হইয়া, দেখা দিল মোরে ॥
(হাছন রাজা ২০০৯ : ২৭)

জীবন ও সত্তার অর্থানুসন্ধানী হাছন সাধনক্ষেত্রে দেশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব স্বীকার করলেও তাঁর নিজস্ব পথও বিদ্যমান ছিল। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এ বিষয়ে নিঃসংশয় :

> হাছন রাজার কাব্যজীবনের সূত্রপাত হয় মুমিনরূপে। ক্রমবিকাশের ধারায় তিনি মরমবাদে গিয়ে পৌঁছেন। এ কথা অবশ্য সত্য যে, তিনি মাঝে মাঝে শরীয়তের শুষ্ক দিক নিয়ে তামাশা করেছেন এবং কোনো কোনো শরীয়তের আইন-কানুনকে অস্বীকারও করেছেন। তবে হয়ত পর মুহূর্তেই তিনি মুমিনের জীবনকেই মানব জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন।...তাঁর রচনার মধ্যে হিন্দুদের নানা দেবদেবীর বন্দনা রয়েছে। তিনি দেবী কালীকে বা রাধাকৃষ্ণকে কোনো কোনো গানে আহ্বান ও আরাধনা করেছেন। তবে এগুলো তিনি রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ তাঁর চিন্তাধারায় মূল সুরটি আগাগোড়াই ছিল ইসলামি। (দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ২০০৯ : ৬৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর গানে পাওয়া যায় :

ক. ওবা ঠাকুর আল্লাজি। আমারে রাখিলায় কেবল এই ভবের খেলে।
না করিলাম তোমার কাম দিন গেল অবহেলে ॥
(হাছন রাজা ২০০৯ : ১৫৫)

খ. বাউলা কে বানাইল রে হাছন রাজা রে
বাউলা কে বানাইল রে।
বানাইল বানাইল বাউলা তার নাম হয় মৌলা।
দেখিয়া তার রূপের ছটক হাছন রাজা হইল আউলা ॥
(হাছন রাজা ২০০৯ : ২৪২)

মৌলার সান্নিধ্য লাভের আরাধনার পাশাপাশি হাছন রাজার গানের বেশ কয়েকটি পদে রাধাকৃষ্ণ, ঠাকুর, কানাই, কালাচাঁদ প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষণীয়। বৈষ্ণবীয় প্রেম ও ভক্তিবাদী সাধনার ধারা সিলেটের মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত। এরসাথে সুফিবাদের মিশেলে এক উদার ও সমন্বয়বাদী ধর্মসংস্কৃতির ধারা গড়ে উঠেছে (শামসুজ্জামান খান ২০০৯ : ১২৭-১২৮)। হাছন রাজার গানের মৌলপ্রবণতার বাইরে – ইসলামি সংস্কৃতি বা সাধনরীতি বা সুফিবাদের বাইরে বৈষ্ণবদর্শানুসারী গান বা পদে রাধারমণের 'প্রভাব কিছুটা ছায়াপাত করা অস্বাভাবিক নয়' (প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ২০০৯ : ৬৭৯)।

রাধারমণের পদে রাধা-কৃষ্ণ প্রধান চরিত্র। সংগৃহীত সহাস্রাধিক পদের সিংহভাগে প্রেমলীলার কাব্যিক প্রকাশ সুপরিস্ফুট। কথা এবং সুরের ঢেউ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে গভীরভাবে লেগেছিল – এ ভাবনা অযৌক্তিক নয়। রাধারমণের গানের সঙ্গে হাছন রাজার রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গানের তুলনায় আমরা একই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা লক্ষ করব :

ক. রাধারমণের পদ : জলের ঘাটে দেইখে আইলাম শ্যাম চিকন কালিয়া।
চূড়ার উপরে ময়ূর পাখা বামে দিছে হেলাইয়া ॥
নিতি নিতি দেও খোটা কালিয়া সোনা বলিয়া।
দেখছি অনে লাগছে মনে পাশরিতে পারি না ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮৬)

হাছন রাজার গান : হেরিয়ে হরি মুরারী ধারী, গৃহে রইতে নারি রে।
ভুলি ভুলি করি মনে, ভুলিতে না পারি মনে ॥
(হাছন রাজা ২০০৯ : ৩১৩)

খ. রাধারমণের পদ : জীবনের সাধ নাই গো সখি জীবনের সাধ নাই
আমার দেহার মাঝে যে যন্ত্রণা কারে বা দেখাই ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৭০)

হাছন রাজার গান : বাঁচিবার আর সাধ নাই আছে গো। প্রাণ সজনী
বাঁচিবার আর সাধ নাই আছে।
(হাছন রাজা ২০০৯ : ৪৩২)

গ. রাধারমণের পদ : হরিগুণাগুণ কৃষ্ণ গুণাগুণ রাধা গুণাগুণ গাও হে।
সদায় আনন্দ রাখিও মনে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১০৯)

হাছন রাজার গান : হরির নামে কীর্তন কর সবে গো প্রাণ সই
হরির নামে কীর্তন কর সবে।
হরির নামে কীর্তন করলে, হরিয়ে কোল লবে গো সজনী সই ॥
(হাছন রাজা ২০০৯ : ২৮৯)

হাছন রাজার গানে 'হরি', 'মুরারী ধারী', 'কীর্তন' প্রভৃতি শব্দে বৈষ্ণবীয় রীতির প্রকাশভঙ্গি লক্ষ করার মতো। কবির 'বাঁচিবার আর সাধ নাই' এবং রাধারমণের 'জীবনের সাধ নাই' চরণের মিল কাব্যিক নৈকট্যকে প্রকাশ করে।

বলা যায়, শাশ্বত প্রেমের আকুতি প্রকাশ করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে হাছন রাজা রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন; এবং এক্ষেত্রে তাঁর গানে রাধারমণের ভাব এবং ভাষার প্রভাব রয়েছে।

৮.৩ উকিল মুন্সি

নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলার নূরপুর বোয়ালী গ্রামে জন্মগ্রহণকারী লোককবি উকিল মুন্সির (১৮৮৫-১৯৭৮) প্রকৃত নাম আবদুল হক আকন্দ। উকিল তাঁর ডাকনাম। ইমামতি পেশার কারণে নামের সাথে 'মুন্সি' যুক্ত হয়েছে। প্রায় এক হাজার গানের রচয়িতা এই শিল্পীর গানের মৌল বিষয় সুফিধারার প্রেমতত্ত্ব (সুমনকুমার দাশ ২০১২ : ৭৪৫)। 'তবে তত্ত্বের দাসত্ব করেননি উকিল। তিনি তত্ত্বমত্ত ছিলেন না। তিনি মত্ত ছিলেন সংগীতচর্চা নিয়ে। তার গানে তত্ত্ব এসেছে প্রচ্ছন্নভাবে' (মাহবুব কবির ২০১৩ : ২২)। যেমন :

সে যে আড়ালে থাকে, উঁকি দিয়া দেখে
হাত বাড়াইয়া ডাকে তোমায় মধুর সুরে
কে যাবে আয় তোরা মাশুকপুরে ॥
(উকিল মুন্সি ২০১২ : ৪৬৬)

মাশুকের সাথে সাক্ষাতের জন্য বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে অপেক্ষমান উকিল। প্রেমের এই আশিক-মাশুকের সম্পর্কের নানাভাবে প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গানে। তাঁর সাধনের ধনকে তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথার সাধনরীতি অনুসারে প্রকাশ করেছেন। ফলে তাঁর মাশুক কখনো 'কালা', 'শ্যাম', 'বন্ধু' নামে প্রকাশিত। নিজেকে 'রাধা' সত্তায় উপনীত করে তাঁর অপেক্ষা প্রবাসী বন্ধুর তরে :

ও কঠিন বন্ধুরে
সুখে না রহিতে দিলে ঘরে
সাজাইয়াছো পাগলিনী থাইক্যা দেশান্তরে রে ॥
(উকিল মুন্সি ২০১২ : ৪৭৩)

শ্যামের বিরহে প্রাণ যাওয়ার উপক্রম। রাধারূপী প্রেমিকসত্তার পরমের জন্য অপেক্ষার চূড়ান্ত প্রকাশ:

যাও সখি তোরা, রাধার মনচোরা
দাসীকে কি রে প্রাণে মারিবে
এই রূপে রাধায়, কান্দে যদি সদায়
মরিলে শেষে তোমরা কারে দেখাইবে ॥
(উকিল মুন্সি ২০১২ : ৪৭৪)

আমরা লক্ষ করি, উকিল মুন্সীর গান বৈষ্ণবীয় গান বা সাহিত্যের চরিত্র-উপকরণে সমৃদ্ধ। ফলে অনুমান করা যায়, বৈষ্ণবীয় সাধনরীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল; এবং এক্ষেত্রে রাধারমণের গানের সঙ্গে কবির গানের ভাষিক ঐক্য আমাদের মুগ্ধ করে :

ক. রাধারমণের পদ : কী রূপ হেরিয়া আইলাম কদমতলে।
আর গো শ্যামের মৃদুহাসি বদন কমলে ॥
যাইতে যমুনার জলে শ্যামকালা জলে মিলে
কালরূপ হেরিয়া নয়ন আমার ভুলে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ২২৪)

উকিল মুন্সির গান : কী রূপ দেখে আইলাম সই গো সুরধুনীতে
এক মুখে পারি না সই গো কালো রূপ তার বর্ণিতে।
(উকিল মুন্সি ২০১৩ : ১২২)

খ. রাধারমণের পদ : হেন কালে শ্যামনাগরে বাঁশি থইয়া আমায় ধরে গো
এগো কলসীখানি ভেসে গেল প্রেমের ঢেউ লাগিয়া ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ১৮১)

উকিল মুন্সির গান : আমার কাঙ্খের কলসি গিয়াছে ভাসি
মাঝি রে তোর নৌকার ঢেউ লাগিয়া রে
মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউ লাগিয়া ॥
(উকিল মুন্সি ২০১২ : ৪৭৮)

'কলসী' ভেসে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাধারমণ 'প্রেমের ঢেউ'কে দায়ী করলেও উকিল মুন্সির অনুযোগ ভিন্ন। তবে দুজনই যে বৈষ্ণবপ্রেমে তরি ভাসিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

উকিল মুন্সির জন্মস্থান নেত্রকোনা রাধারমণের জন্মভূমি সুনামগঞ্জের পার্শ্ববর্তী জেলা। রাধারমণের বৈষ্ণবীয় প্রেমের ঢেউ হাওর পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছিল উকিল মুন্সির মন-মন্দিরে – একথা বলা যায়।

৮.৪ শাহ আবদুল করিম

লোককবি শাহ আব্দুল করিম (১৯১৬-২০০৯) একাধারে গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী। বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার ধল আশ্রম গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এই শিল্পী নানা বিষয়ে গান রচনা করেছেন (মিহিরকান্তি চৌধুরী ২০১০ : ১৫-৩৭)। তিনি 'লৌকিক ধর্মসাধকদের সহযাত্রী রূপে লৌকিক তত্ত্বাশ্রয়ী' অনেক গান রচনা করেছেন (যতীন সরকার ২০১০ : ৪৫)। বিষয় এবং সুরের বৈচিত্র্য, গানের ভাষার সারল্য এবং জীবনঘনিষ্ঠতা তাঁর গানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাস্মরণ, নবীস্মরণ, ওলিস্মরণ, পীরস্মরণ, ভক্তি, মনঃশিক্ষা, দেহতত্ত্ব, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গান রচনা করেছেন।

সুনামগঞ্জের নদী-হাওরের মধ্যে বেড়ে ওঠা শাহ আবদুল করিম মূলত মানুষ ও প্রকৃতিকেই বিষয় করেছেন। বিষয়কে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে শিল্প-উপকরণ গ্রহণ করেছেন মানুষের ইতিহাস, পুরাণ, লোককথা, লোকজীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস ইত্যাদি থেকে। ফলে তিনি একই জেলা – সুনামগঞ্জের লোককবি রাধারমণের বৈষ্ণবীয় রীতির গান থেকে শিল্প-উপকরণ গ্রহণ করেছেন – এ ভাবনার পক্ষে উদাহরণ দেয়া যায়, এবং দুই কবির গান পাশাপাশি পাঠ করলে কিছু ক্ষেত্রে ঐক্য দুর্লক্ষ্য নয় :

রাধারমণের পদ : ক. আমি রবনা রবনা গৃহে বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না
বন্ধু আমার চিকন কালা নয়নে লাইগাছে ভালা
বিষম কালা ধইলে ছাড়ে না ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০৯ : ৫৮)

শাহ আবদুল করিমের গান : প্রাণ সখীরে, (আমি) বন্ধু বিনে প্রাণে বাঁচি না।
তারে একবার এনে দেখাও না।
(শাহ আবদুল করিম ১৯৯৯ : ৬০)

রাধারমণের পদ : খ. কুঞ্জ সাজাও গিয়া, আসবে শ্যাম কালিয়া
মনোরঙ্গে সাজাও কুঞ্জ সব সখি মিলিয়া।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৫৪)

শাহ আবদুল করিমের গান : সখী কুঞ্জ সাজাও গো,
আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে।
(শাহ আবদুল করিম ১৯৯৯ : ৭১)

রাধারমণের পদ : গ. গুরুপদ পদরাবৃন্দে মনভুজঙ্গ মজনা রে
সুধামাখা গুরু নামে ভবক্ষুধা যাবে দূরে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০৯ : ৮৭)

শাহ আবদুল করিমের গান : গুরু বাক্য লওরে মন, বিষয়টা মধুর।
নাম স্মরণে মিলবে ধ্যানে দীননাথ দয়ার ঠাকুর ॥
গুরু যারে দয়া করে তরাবে অকুল পাথারে
যাবে যদি ভব পারে সব ছেড়ে হও দিন মজুর।
(শাহ আবদুল করিম ১৯৯৯ : ৩৮)

করিম বৈষ্ণব ছিলেন না। তাঁর গানের মৌলপ্রবণতাও রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা নয়। তাছাড়া, তাঁকে 'বাউল' বলতেও কারো কারো আপত্তি আছে। ফলে করিমের গানে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে শিল্পের উপকরণ হিসেবে। রাধার বিরহের বর্ণনা – 'বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না', কিংবা মিলনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কুঞ্জ সাজানোর যে তাগাদা, তাতে দুই কবির ভাব এবং ভাষায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। করিম রাধারমণের গানের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন বা শিল্পঋণে ঋদ্ধ হয়েছিলেন – একথা বলা যায়। কেননা, সুনামগঞ্জের মানুষ ও মৃত্তিকার

ঘ্রাণের সাথে একাকার হয়ে মিশে আছে রাধারমণের গান। করিম সেই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যেই থেকেই বিকশিত হয়েছেন।

৮.৫ দুর্বিন শাহ

লোকগানের গুরুত্বপূর্ণ কবি দুর্বিন শাহ (১৯২০-১৯৭৭) বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার নোয়ারাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক। তাঁর পিতা সফাত আলী ছিলেন মরমি সাধক ও কবি। ফলে পারিবারিক পরিমণ্ডলেই তাঁর মধ্যে লোক-ঐতিহ্যের ধারায় সংগীতচর্চার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। তাঁর সংগীত-সাধনা বা শিল্পচর্চার স্বাক্ষর বহন করছে 'প্রেমসাগর পল্লীগীতি' গ্রন্থের সাতটি খণ্ড (সুমনকুমার দাশ ২০১৪ : ৫-১৪)। 'আত্ম-অনুসন্ধানের দুর্মর পিপাসা' (টি এম আহমেদ কায়সার ২০১৪ : ৩১৭) নিয়ে দুর্বিন শাহ বাউল, ভাটিয়ালি, গণসংগীত, জারি, সারি, মারফতি, পির-মুর্শিদ প্রভৃতি বিষয়ে গান রচনা করলেও তাঁর গানের মৌলপ্রবণতা সুফি ও মরমিবাদ (আবুল আহসান চৌধুরী ২০১৪ : ৩০০)।

দুর্বিন শাহ'র রচনার কিছু দৃষ্টান্ত :

ক. কাবার পাশে রঙিন বেশে ফুটল গোলাপ ফুল
ত্রিভুবনের ভ্রমর শুনে খুশবয়ে আকুল ॥
(দুর্বিন শাহ ২০১৪ : ৬০)

খ. নমাজ আমার হইল না আদায়
নমাজ আমি পড়তে পারলাম না, দারুন খান্নাছের দায় ॥
ফজরের নামাজের কালে, ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে
জোহর গেল আইতে-যাইতে, আছর গেল কামের দায় ॥
(দুর্বিন শাহ ২০১৪ : ১২১)

তবে ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট এসব রচনার পাশাপাশি দুর্বিন শাহ রচনা করেছেন বেশকিছু সংখ্যক রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান – যা লোককবির অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে ফুটিয়ে তোলে। দুর্বিন শাহ'র এই রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথার সাথে রাধারমণের পদের রয়েছে গভীর ঐক্য। দুই কবির পদ পাশাপাশি পাঠ করলে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে :

রাধারমণের পদ : ক. জলে যাইও না গো রাই
আইজ রাধার জলে যাওয়ার জাতের বিচার নাই।
(রাধারমণ দত্ত ২০০৯ : ৫১)

খ. কী রূপ হেরিয়া আইলাম কদমতলে
আর গো শ্যামের মৃদু হাসি বদন কমলে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০৯ : ১৭৭)

দুর্বিন শাহ'র গান : ক. যাইও না রাই জল আনিতে
যুবা নারীর যৌবন হরে, ঐ ঘাটে জল ভরিতে ॥
(দুর্বিন শাহ ২০১৪ : ২৩০)

খ. ওই যমুনায় কী রূপ হেরিলাম
কদম তলে ওই নিরলে, বাঁশির ধ্বনি শুনিলাম ॥
(দুর্বিন শাহ ২০১৪ : ২২৭)

জলে না-যাওয়ার আবেদন; যমুনায় কৃষ্ণের রূপদেখে মুগ্ধ হওয়ার আনন্দানুভূতি; 'ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী' বিনে কৃষ্ণের মন-উচাটন অবস্থার বর্ণনায় দুই কবির মিল লক্ষণীয়। বিষয় এবং ভাষার সাদৃশ্য পাঠকশ্রোতার দৃষ্টিআকর্ষণ করে। রাধারমণের সংগৃহীত সহস্রাধিক পদের সিংহভাগ রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা নিয়ে রচিত। এবং এই পদাবলি বা গানের কথা ও সুরের একটি সহজ-সুন্দর এবং জাদুকরী প্রভাব রয়েছে, যা শ্রোতার শিল্প-রস পিপাসু অন্তরে সৌন্দর্যের জাদু-প্রভাব রাখবেই। রাধারমণের মৃত্যুর প্রায় শতবছর পরেও বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের লোক-সমাজে তাঁর গানের কদর এবং সংস্কৃতিতে যে প্রভাব লক্ষ করা যায়, তাতে বলা যায় – একই জেলায় জন্মগ্রহণকারী লোককবি দুর্বিন শাহ রাধারমণের গানের বাণীর দ্বারা মুগ্ধ ছিলেন।

৮.৬ কফিলউদ্দিন সরকার

লোককবি কফিলউদ্দিন সরকার (১৯৩২-২০১২) হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার মালঞ্চপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে (১৩৫২ বঙ্গাব্দে) তিনি সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার আকিলপুর গ্রামে বসতিস্থাপন করেন এবং জীবনের সিংহভাগ সময় এখানেই অতিবাহিত করেন। সাধককবি দুর্বিন শাহ'র শিষ্য এই বাউল কবি অনেক লোকগান রচনা করেছেন। ধারণা করা হয় তাঁর গানের সংখ্যা কয়েক হাজার হতে পারে, যদিও সংগৃহীত বা প্রকাশিত অবস্থায় রক্ষিত আছে মাত্র কয়েকশত গান। মালজোড়া গানের প্রখ্যাত এই শিল্পী একাধারে লোককবি, সুরকার এবং গায়ক (সুমনকুমার দাশ ২০১৩ : ১৭-২৫)। কফিলউদ্দিন সরকারের গানের বিষয় বিচিত্র। আল্লাহ-নবী, পীর-মুর্শিদ থেকে আরম্ভ করে দেহতত্ত্ব, ভাটিয়ালি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গান রচনা করেছেন।

কফিলউদ্দিনের গান পাঠে আমাদের এই প্রতীতী জন্মায় যে, এই লোককবি প্রধানত ইসলামি ভাবধারাকে বিষয় করে গান রচনা করেছেন। এবং তাতে তাঁর বিশ্বাস প্রোথিত ছিল – এ ধারণা কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা লক্ষ করি দেহকে ব্রহ্মাণ্ড ভাবার ঐতিহ্যবাহী রীতি – যা ইসলামি ভাবধারা বা সুফিভাবনা প্রসূত নয়। দেহবাদী চিন্তার বাইরে তাঁর পদে 'প্রেমতত্ত্বে'র উপস্থিতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে তাঁর গানে বিচিত্র বিষয়ের উপস্থিতিতে আমরা অনুমান করি – সকল বিষয় তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি থেকে উঠে আসেনি। তিনি লোককবি ছিলেন এবং কবির দৃষ্টি দিয়েই তিনি জগৎকে দেখেছেন। ফলে বিচিত্র বিষয় তাঁর গানে আধেয় হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গও তেমনি।

আমরা জানি, একই অঞ্চলে রাধারমণ এবং কফিলউদ্দিনের বসবাস। ফলে, অনুমান করি, রাধারমণের শিল্পসৃষ্টির উত্তরাধিকারী হিসেবে কবি পূর্বসূরির নিকট শিল্পঋণে আবদ্ধ ছিলেন – বিশেষত, রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা নিয়ে রচিত গানে। কফিলউদ্দিন গানের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেমন রাধারমণ-দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি কবিভাষার ক্ষেত্রেও। দুই কবির পদ পাশাপাশি পাঠ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে :

রাধারমণের পদ : ক. সখীগো সর্পের বিষ ঝারিতে লামে, প্রেমের বিষে উজান বায়
উঝা বৈদ্যের নাই গো সাধ্য ঝারিয়া বিষ লামাইতো চায়।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩০০)

খ. আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একারে সুবল সখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী একবার এনে দেখা।
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ২৪৫)

গ. কী রূপ দেখছনি সজনী সই জলে।
এগো নন্দের সুন্দর চিকন কালা থাকে তরুমূলে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০৯ : ১৭৬)

ঘ. ওরে আজ কেনরে প্রাণের সুবল রাই এলো না যমুনাতে।
আমি রাই অপেক্ষায় বসে আছি
হাতে নিয়ে মোহন বাঁশি রাই এলো না ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০৯ : ৫৫)

কফিলউদ্দিনের পদ : ক. সর্পের বিষ ঝারিলে নামে তন্ত্র মন্ত্রের বলে
প্রেমের বিষে উজান দায়, নামে না ঝারিলে ॥
(কফিলউদ্দিন সরকার ২০১৩ : ১৬২)

খ. সুবল সখা সুবল সখারে, রাধারে আনিয়া একবার দেখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী বিনে যায় না থাকা ॥
(কফিলউদ্দিন সরকার ২০১৩ : ১৬৩)

গ. কি রূপ দেখিলাম আমি গো সখি, এসে জলের ঘাটে
আওলা সুতায় প্যাচ লাগিয়া পড়িলাম সংকটে সখি গো
এসে জলের ঘাটে ॥
(কফিলউদ্দিন সরকার ২০১৩ : ১৬৭)

ঘ. সুবল রে, আজ কেন এল না রাই, কারে দেখে প্রাণ জুড়াই।
(কফিলউদ্দিন সরকার ২০১৩ : ১৬৪)

প্রেমের বিষ যে সাপের বিষের চেয়েও মারাত্মক, তাতে দুই কবির অভিন্ন মত। কৃষ্ণের অপরূপ রূপ দেখে বিমোহিত রাধারমণের রাধা, কফিলউদ্দিনেরও তাই। এবং রাধা বিনে বেঁচে থাকা নিদারুণ কষ্টদায়ক – দুই কবির পদে কৃষ্ণের একই আর্তি।

ফলে, কফিলউদ্দিনের বৈষ্ণবপদ বা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদে রাধারমণের গানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে – একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রাধারমণের গানের বাণী এবং সুরের সহজ-সৌন্দর্যের জন্যে তা সাধারণের নিকট ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে; এবং তা পরিণত হয়েছে লোকসংস্কৃতির অঙ্গে। ফলে একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা রাধারমণ-পরবর্তী কোনো কোনো কবি-গীতিকারদেরকে তা প্রভাবিত বা সমৃদ্ধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

রাধারমণের অন্যান্য গান

রাধারমণ মূলত বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। এতেই তাঁর শিল্প এবং সাধনার প্রকাশ। তবে বৈষ্ণবপদের বাইরেও তিনি রচনা করেছেন শাক্তপদ – যা বৈষ্ণব-বিশ্বাসের বিপরীত ধারার শিল্প-সাধনা হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া শিববন্দনা, 'ধামাইল গান'-এর রচয়িতা হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে।

৯.১ (ক) শাক্তপদ

শক্তিদেবীর স্তুতিকে ভিত্তি করে রচিত হওয়া সাহিত্য শাক্তপদ নামে পরিচিত। পার্থিব দুঃখ-শোক, কামনা-বাসনা, দৈন্য-পীড়া, অভাব-অপূর্ণতার বিপরীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর বাসনাপূর্ণের আশ্রয়রূপে শক্তিদেবী তথা মাতৃরূপিণী শ্যামার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পদ শ্যামাসংগীত হিসেবে পরিচিত। এই শ্যামাসংগীতকেই বলা হয় শাক্তপদাবলি (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ভূমিকা ট-ঠ)। শাক্তপদ মূলত শক্তি অর্থাৎ উমা-পার্বতী-দুর্গা-কালিকাকে কেন্দ্র করে রচিত গান। 'শাক্ত পদাবলির অধিকাংশ পদ শ্যামা-বিষয়ক। শ্যামা বলতে বিশেষভাবে কালীকে বোঝায়। কালীই এখানে প্রধান দেবতা' (জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ১৩৭০ : ৩)। শাক্তপদকে বা দেবীবিষয়ক পদকে 'মালসী' গানও বলা হতো। 'মালবশ্রী' রাগে গাওয়া হতো বলে এর এরূপ নামকরণ বলে অনুমান করা হয় (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ : ২৪০)।

শাক্তপদ বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। এতে গীতিকবির আত্মপ্রকাশ এবং 'ভক্তিরস-পিপাসু' বাঙালির ভাবাবিষ্ট হয়ে এর রসাস্বাদন – এমনটি সম্ভবত বাংলা সাহিতের অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঘটেনি (হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২০১৩ : ২৫)। অষ্টাদশ শতকে শাক্তধারার গানের উৎপত্তি এবং শতাব্দীকালের মধ্যেই এর বিকাশ। 'রামপ্রসাদ এই ধারার প্রবর্তক – রামপ্রসাদেই এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণতি' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৪১৬ : ২২২)। রামপ্রসাদ সেনের একটি শাক্তপদ :

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত ॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত, –
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি
শ্রীপদ মনের মত ॥

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥
(রামপ্রসাদ সেন ২০১০ : ৭৫)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক মানুষের অসহায়তা, ধর্মের কলুষতা, শিল্পসংস্কৃতির বিকৃতি সব মিলিয়ে অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশে শক্তিসাধনার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয় (অরুণকুমার বসু ১৪০৮ : ৭১)। বিশিষ্ট কাব্যরীতির এ ধারায় পরবর্তীতে অনেক কবিই সাহিত্য রচনা করেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ভারতচন্দ্র রায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মুক্তারাম সেন, রাজা শিবচন্দ্র রায়, শম্ভুচন্দ্র রায়, আলি রজা, আকবর আলী, মির্জা হোসেন আলী প্রমুখসহ কাজী নজরুল ইসলামের নাম শাক্তপদের ধারায় বিশিষ্ট হয়ে আছে (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ১৯৯৮ : ভূমিকা– ঠ)।

রাধারমণ মূলত বৈষ্ণব-পদাবলির রচয়িতা হলেও মাতৃস্তুতি নিয়েও তিনি কিছু পদ রচনা করেছেন। এখানে তাঁর আপাত বিপরীতমুখী সাহিত্যসাধনার পরিপ্রেক্ষিত এবং সাযুজ্যতা লক্ষণীয়।

৯.২ শাক্তপদের প্রকার ও প্রকৃতি

শাক্তপদকে দুভাগে ভাগ করা হয় : লীলাগীতি ও সাধনগীতি। লীলাগীতি মূলত আগমনী ও বিজয়া-সংগীত। অন্য গীতিগুলি বিশুদ্ধ সাধনসংগীত (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৪১৬ : ২২৮)।

হিমালয় ও মেনকার কন্যা উমার স্বামীগৃহ কৈলাস থেকে পিতৃগৃহ গিরিপুরে আগমন এবং তিনরাত্রি অবস্থান শেষে পুনরায় ফিরে যাওয়া নিয়েই লীলা-সংগীত। সাধন-সংগীতে ব্যক্ত হয় মাতৃরূপের ধ্যান এবং তান্ত্রিক সাধনা, যদিও দুই ভাবের সংগীতের পার্থক্য এতটা সরল করা সম্ভব নয়। কেননা, লীলা-সংগীতের মধ্যেও সাধনতত্ত্ব যুক্ত থাকতে পারে। 'সাধারণভাবে যেখানে মানবীয়-রসে দেবীর কন্যা-লীলাকেই প্রধান বলিয়া মনে হয় তাহার পিছনেও একটি গভীর সাধনার দিক আছে' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৪১৬ : ২৩৪)।

শাক্তপদ কাহিনিপ্রধান নয় – ভাবই এর প্রধান অবলম্বন। কাহিনির বিস্তৃত বর্ণনার চেয়ে 'অন্তরের একটি শাশ্বত স্নেহবোধকে সংগীতের সুরে প্রকাশ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য' (আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৯৮ : ৬১২)। তবে লীলাসংগীত – যা আগমনী ও বিজয়া-সংগীত হিসেবে পরিচিত তার কাহিনি সরল এবং সাধারণ। মূলত পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করেই এর বিস্তার।[১]

---

১. আগমনী-বিজয়ার কাহিনি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

গিরিরাজ হিমালয় ভিখারি শিবের নিকট নিজের কন্যা উমাকে সম্প্রদান করেন। রাজকন্যা উমা ভিখারি স্বামীর অভাব-পীড়িত সংসারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সন্তান-বিচ্ছেদে জননী মেনকা কাতর – রাজ-ঐশ্বর্যভোগে তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। শারদীয় পূজার প্রাক্কালে মেনকা একদিন শেষরাত্রে ভিখারি স্বামীর স্ত্রী তাঁর দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দুঃখিনী-কন্যা উমাকে স্বপ্নে দেখলেন।

শাক্তপদে উমার আগমনের কাহিনি নিয়ে 'আগমনী' এবং প্রত্যাগমনের আখ্যান নিয়ে 'বিজয়া' রচিত হয়। পৌরাণিক উমা শাক্তপদে কখনো মর্ত্যের দরিদ্র বধূ হয়ে ওঠেন – দেবী মানবী মূর্তিতে অবতীর্ণ হন। ফলে আগমনী-বিজয়ার গানে 'আধ্যাত্মিক আবেদন অপেক্ষা মানবিক আবেদনই অধিকতর সার্থক' হয়ে দেখা দেয় (আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৫৭ : ২৫২)।

শাক্তপদের সঙ্গে সাধন-ভজনের সম্পর্ক অঙ্গীভূত। বৈষ্ণব কবিতায় সাধন-সংগীতের একটি দিক রয়েছে। যদিও সকল বৈষ্ণবকাব্যের প্রেরণা সাধন-ভজন নয়। বৈষ্ণব-প্রার্থনার পদগুলো ব্যতীত অন্যত্র এই সাধনা তথা ধর্মের দিকটি প্রত্যক্ষ নয়। 'শাক্ত-পদাবলিগুলি মুখ্যতঃ সাধনসংগীত' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৪১৬ : ২২৭)। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, লীলা-সংগীতও মূলত সাধন-সংগীত। তবে বিশুদ্ধ সাধন-সংগীতগুলোতে প্রাচীন বাংলাদেশের বিভিন্ন মাতৃসাধনার বিবরণ লক্ষ করা যায়। এ সাধনপদ্ধতি ভক্তি ও যোগাশ্রিত। ফলে সাধকগণের সাধনালব্ধ বিভিন্ন অতিন্দ্রীয় অনুভূতির প্রকাশও শাক্তপদে লক্ষণীয়। যার সাথে চর্যাপদের গূঢ়-রহস্য প্রকাশক রূপকাদির সঙ্গে মিল সহজেই পরিলক্ষিত হয় (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৪১৬ : ২৩০-৩১)।

৯.৩ রাধারমণের শাক্তপদ

রাধারমণের শাক্তপদ ঊনবিংশ শতকের শাক্তপদাবলির রীতির অনুসারী। তাঁর শাক্তপদের প্রেরণার মূলে উমা, দুর্গা বা কালীর প্রতি ভক্তিস্তুতিই। বৈষ্ণবপদের রচয়িতা রাধারমণের অল্পসংখ্যক শাক্তপদ পাওয়া যায়। সংগৃহীত সহাস্রাধিক পদের মধ্যে গোটা দশেক মাত্র শক্তির স্তুতিকে ভিত্তি করে রচিত। রীতি অনুযায়ী রাধারমণের শাক্তপদও মূলত সাধন-সংগীত। আগমনী ও বিজয়ার কাহিনির মধ্যে আরাধনার আরতি প্রকাশই তাঁর শাক্তপদের মূলবৈশিষ্ট্য। মাতৃদেবী উমার সপ্তমীতে পিতৃগৃহে আগমন এবং দশমীতে স্বামীর বাড়ি ফিরে যাওয়ার সরল বর্ণনা এবং এর মাধ্যমে ভক্তের অভাব-অনুযোগ, অশান্তি-অপ্রাপ্তি থেকে মুক্তির তীব্র বাসনা এবং বাসনাপূর্ণে দেবীর অসীম মহিমায় গভীর বিশ্বাস তাঁর পদে শিল্পরূপ লাভ করেছে। এতে লীলাপদের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সাধনতত্ত্বের কথাও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন :

কন্যাকে দেখার তাঁর উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। ধৈর্যহারা হয়ে তিনি স্বামীর নিকট কন্যাকে শারদোৎসব উপলক্ষ্যে পিতৃভবনে নিয়ে আসার অনুরোধ করলেন। এদিকে উমাও জননীকে স্বপ্নে দেখে সহসা ভূমিশয্যা ত্যাগ করে উঠলেন। মাতা-পিতাকে একবার দেখার জন্য কন্যা অধীর হয়ে উঠলেন। স্বামী শিবের নিকট মাত্র তিনদিনের সময় ভিক্ষা করে উমা পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন। মাত্র তিনদিনের জন্য কন্যা এসেছে বাবার বাড়ি। মাতা মেনকার এই আনন্দ-মিলন দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল। তিনদিন পর পিতৃগৃহ অন্ধকার করে উমা স্বামীর হীনদরিদ্র সংসারে ফিরে গেলেন। (জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ১৩৭০ : ৭৯-১০৮, আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৯৮ : ৬১৩)

Dhaka University Institutional Repository

ক. হইল বর্ষাগত শরৎ আগত
আশ্বিন যামিনী।
অতি মনোরঙ্গে নারীপুত্র সঙ্গে
মহানন্দ ধরণী ॥
এল দেবীপক্ষ অতিশয় মুখ্য
বিচিত্র বাখানি।
যার ভক্তি যেমন করেরে চয়ন
পূজিতে জননী ॥
তারা মনোমত দান যজ্ঞব্রত
করেছে যত ধনী।
কায়মনোবাক্যে অতি মন সুখে
দ্রব্যের আমদানি ॥
এল সপ্তমী তিথি উমা ভগবতী
উদয় অবনী।
হেরি মার শোভা অতি মনোলোভা
হরের ঘরণী ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৫৩৯)

খ. ঐ অষ্টমী তিথি অতি পুণ্যবতী
মহাষ্টমী গণি।
যাগ যজ্ঞ ধর্ম জপ তপ কর্ম
করে ঋষি মুনি ॥
কেহ চণ্ডী পাঠে আর কেহ ঘাটে
কুলবন্দ আনি।
নব বেল পত্র করি মন্ত্রপুত
দিতেছে অমনি ॥
অষ্টমী গতে এই নবমীতে
কম্পিত মেদেনী।
ঢেলে যজ্ঞের ঘৃত নববেম্যপত্র
জলন্ত আগুনী ॥
হল পূজা সাঙ্গ করল মনভঙ্গ
এল ত্রিশূলপাণি।
কাল দশমীতে ঐ ভবের সাথে
যাবেন ভবানী ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৫৩৬)

শারদীয় পূজায় মাতৃদেবী উমার কৈলাস থেকে আগমন এবং পিতৃগৃহে তিনদিন অবস্থান শেষে 'ভব' তথা শিবের সাথে পুনরায় স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে উপরিউক্ত পদে। মাতৃদেবীর আগমনে পূজারির আয়োজন এবং যাগযজ্ঞের প্রস্তুতি এবং নানা উপাচারে দেবীকে স্বাগত জানানো, স্তুতির মঙ্গলশ্লোক পাঠ প্রভৃতির বর্ণনায় ফুটে উঠেছে শক্তি-অনুসারীর সাধনভজন।

পূজার অর্ঘ্য সাজানোর পশ্চাতে পূজারীর মনোবাসনার দিকটিও রাধারমণের পদে প্রকাশিত। যাতে পারলৌকিকতার চেয়ে জাগতিকতার আশা-আকাঙ্ক্ষাই বেশি পরিস্ফুট। যেমন :

দীন দয়াময়ী ত্রিভুবন জয়ী
বিদিত সংসারে ॥
মায়ের চরণ যে নেয় শরণ
দুঃখ যায় দূরে।
হয় অট্টালিকা বালক বালিকা
ধন জন বাড়ে ॥
মহর পয়সা পিতল কাঁসা
তাতি ঘোড়া চড়ে ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৫৩৩)

দেবীর এই 'দয়াময়ী' মূর্তির যে পরিচয় আমরা লাভ করি তাতে শাক্তানুসারী ভক্তের চাওয়ার আছে অনেক। কিন্তু রাধারমণের চাওয়ার আছে সামান্য। ধনজন, মোহর-পয়সার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। 'পরমতত্ত্বে'র প্রত্যাশী সাধক-কবির চাওয়ার সরল প্রকাশ নিম্নোক্ত পদে :

আমি অনিত্য সংসারে সুখে মত্ত
ভুলে ভুলে দিন যায় স্ত্রীপুত্রধনের মায়ায়
মোহের মদিরা পানে না চিন্তিলেম পরমতত্ত্ব
ত্রিতাপে তাপিত অঙ্গ অনুষঙ্গ হইল মা
মাগো মা বিনে সন্তানের দুঃখ কার কাছে কহিগো ॥
মিছে মায়ামোহে দেহ পরিপূর্ণ
এ তনু আপনা নয় রিপুর বশে রয়
আত্মবশে হইয়ে মাগো না চিন্তিলেম ধন
কহে শ্রীরাধারমণ এই নিবেদন মা
মাগো মা বিনে সন্তানের দুঃখ কার কাছে কহি গো ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৫৩৮)

ভক্তরা যখন জাগতিক কামনা-বাসনার হিসাব মিলাতে ব্যস্ত কবি তখন পরিবার তথা জগৎ-সংসারের মোহ-মায়া জড়িয়ে পড়ার আক্ষেপে অনুতপ্ত। তিনি জগতিক বাসনার বেড়াজাল থেকে মুক্তি সন্ধান করছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পরম আশ্রয় মাতৃমূর্তি মহাদেবী দুর্গা। এ ভবসমুদ্র পাড়ি দিতে দেবীর নাম ভরসা। তাতে আস্থা রেখেই রাধারমণের পথ চলা :

আমি যদি মরি ডুবে নামেতে কলঙ্ক রবে
অপযশ রহিবে অবনী ॥
তরঙ্গ আকুল নদী তুমি পার কর যদি
সাঁতার দিয়াছি নাম শুনি।
দুর্গা নামে দুঃখ যায় অন্তে যেন কৃষ্ণ পায়
শ্রীরাধারমণের এ বাণী ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৫৩৭)

এখানে, 'অপার' রাধারমণ পার হওয়ার গভীর বাসনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। 'দুর্গা' নামে ভরসা করে অন্তে 'কৃষ্ণ' পাওয়ার আকুতিতে জড়িয়ে আছে গভীরতর তত্ত্বের কথা।

৯.৪ রাধারমণের পদে 'দুর্গা' এবং 'কৃষ্ণ'

রাধারমণ মূলত বৈষ্ণব কবি। সহজিয়া শাখার সাধনরীতির পরিচয় তাঁর পদে আমরা প্রত্যক্ষ করি। রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথাকে ভিত্তি করে তাঁর সাধনভজনের বিস্তার, যার মূলে রয়েছে জগৎবাসনার ঊর্ধ্বে ওঠা। মহাভাবরূপ সহজানন্দ মূলত এতে অন্বিষ্ট। শাক্তপদ এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 'শাক্ত-সাধক কবি বৈষ্ণব কবির মত বিষয়-বিমুখ নন, তিনি বিষয় প্রত্যাশী' (পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৯৯৪ : ৩৯৯)। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,'বৈষ্ণব পদাবলি ভাববৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণের সূক্ষ্মরসোত্তীর্ণ প্রেমগীতিকা, আর শাক্ত পদাবলি বাস্তব বাংলাদেশের বাস্তব মায়ের বেদনার গান' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ : ২৪২)। রাধারমণ 'ভাববৃন্দাবনে'র যাত্রী। অথচ তিনি জাগতিক বাসনাপূর্ণের আচারিক সাধনানুসারী গান বা সাধনপদ রচনা করবেন – এমন ভাবনা দ্বিধান্বিত করতে বাধ্য। কিন্তু এই দ্বিধার আগল উন্মুক্ত করে তাঁর কবিতা। দুটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায় :

ক. দেবাদিদৈত্যমানব কীটপতঙ্গাদি যত
যক্ষগন্ধর্বাদি প্রসূতিনী।
তুমি কল্প তরুলতা পল্লবাদি পুষ্পলতা
তুমি ধাত্যস্বত স্বরূপিনী ॥

তুমি তুল্য তুলসী তুমি গয়া তুমি কাশী
বৃন্দাবনে যশোদা নন্দিনী।
তুমি রাধা তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ বলরাম
শ্রীরাম তারিণী তারা শুনি ॥
অবতার অবতারি সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গকারী
তুমিগো মা অনন্তরূপিণী।
নিরাকারে ঝটপত্র তাহে স্থিতি পথনেত্র
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রসূতিনী ॥
শ্রীরাধারমণ আশা মা না করিও নিরাশা
অন্তে দিও চরণ দুখানি ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭৩)

খ. এস মা জগজ্জননী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
ভব ভয় বিপদ নাশিনী।
কালি ভৈরবীবাসা সারদা নিভা শিবানী
মা কাত্যায়নী কার্যরূপিনী ॥
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক শ্রীগণপতি
এ সো গো মা মৃগেন্দ্রবাহিনী।
তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ ক্ষিতিতেজ মরুৎব্যোম
তুমি গঙ্গে পতিত পাবনী ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি মা জগৎ আর্য
দেবদেব হরের ঘরণী।
তুমি মা ব্রহ্মসাবিত্রী তুমি মা বেদগায়ত্রী
স্বাহা সদা প্রণবরূপিনী ॥
তুমি দিবা নিশা কাল তুমি নক্ষত্রমণ্ডল
তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।
শ্রীরাধারমণের আশা মা না করিও নিরাশা
অন্তে দিও চরণ দুখানি ॥
(রাধারমণ দত্ত ২০০২ : ৩৭১)

উপর্যুক্ত পদযুগলে এক 'অনন্তরূপিনী' 'জগজ্জননী'র মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। এই মাতৃমূর্তি শিবের ঘরনি অর্থাৎ উমা এবং দুর্গা, কালি । আবার তিনিই চন্দ্র-সূর্য, দিবা-নিশি, সত্ত-রজঃ-তমঃ গুণের আধার। এবং

একইভাবে তিনি যেমন রাধা তেমনি কৃষ্ণ, আবার রাম-বলরাম। তিনি 'অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রসূতিনী'। এই মহামাতৃমূর্তির চিত্র-অঙ্কনের রয়েছে কাব্যিক এবং দার্শনিক ঐতিহ্য।

রাধারমণের পদে জগজ্জননীর যে মহারূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর মূলে রয়েছে ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব। এই তত্ত্বে একটি অস্পষ্ট আদিদেবীর কল্পনা করা হয় এবং তাতে মাতৃত্ব আরোপ করা হয়। পৃথিবীর অপরাপর দেশেও এই আদিদেবীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে 'বিশ্বপ্রসূতি একটি বিশ্বশক্তি' ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে যেভাবে গৃহীত হয়েছে, অন্যত্র তা হয়নি। এই শক্তিবাদের প্রভাব শুধু শাক্ত বা শৈবসম্প্রদায়ের ওপরেই নয় – ভারতের প্রায় সকল ধর্মের ওপর এর প্রভাব রয়েছে। বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য। এমনকি বৈষ্ণব মতবাদগুলির ওপরেও শক্তিবাদের প্রভাব স্বীকার্য। 'দর্শনের ক্ষেত্রে যে-জাতীয় দর্শনই ভারতবর্ষে যখন প্রাধান্য লাভ করুক না কেন, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের গণ-মানসের ভিতরে এই শক্তিবাদের বিশ্বাস স্থিরবদ্ধ হইয়া ছিল' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ৩-৪)।

ফলে বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়ার তত্ত্ব লোকবিশ্বাসে শিব-শক্তিরূপে কল্পিত হয়েছে। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিরও একই পরিণতি বা পরিচয়। তন্ত্র-পুরাণেও এই লোকবিশ্বাসের সাক্ষ্য মেলে। রাধা-কৃষ্ণের গৌড়ীয় দার্শনিক ব্যাখ্যা যাই থাকুক না কেন, লোকমানসে তা পুরুষ-প্রকৃতি তথা শিব-শক্তি (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ৫)।

আমরা জেনেছি, শক্তির অনুসারীরা শাক্ত। শক্তিবাদ বৈদিক না অবৈদিক এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা স্পষ্ট যে, বেদে অবিসংবাদিতভাবে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত – যে দু'চারজন স্ত্রী-দেবতার উল্লেখ রয়েছে তুলনায় তাদের ভূমিকা একেবারে গৌণ। অথচ শক্তিবাদ মূলত দেবীর স্তুতি তথা পূজাকেন্দ্রিক। শক্তিবাদ এবং শক্তিপূজার বহুল প্রসারে আর্যেতর ভারতীয় আদিম জনগোষ্ঠীর অবদানই মুখ্য উল্লেখ করে একদল পণ্ডিতের অভিমত :

> এই সকল আর্যেতর জাতিগণের মধ্যে পিতৃপরিচয় ছিল গৌণ, মাতৃপরিচয়েই সন্তানের পরিচয়। সমাজ-জীবনের এই মাতৃতান্ত্রিকতাই ধর্মজীবনেরও নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিল; এই ভাবেই তাহাদের ধর্মে মাতৃপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা এবং হয়ত এই মাতৃপ্রধান ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদের উদ্ভব এবং ক্রমপ্রসার। (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ৬)

এই শক্তিবাদের মূল উৎস ধরা হয় ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তটিকে। রাধারমণের কবিতায় আমরা যে মহামাতৃমূর্তির পরিচয় লাভ করি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে দেবীসূক্তটিকে পাঠ করা যেতে পারে। এতে বলা হয়েছে :

> ব্রহ্ম-স্বরূপা আমিই রুদ্রবসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি; মিত্র-বরুণ, ইন্দ্র-অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমরদ্বয়কে আমিই ধারণ করি। আমি শত্রুহন্তা সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগ নামক দেবতাগণকে ধারণ করি...আমি জগতের একমাত্র অধিশ্বরী, আমি ধনদাত্রী, আমিই যজ্ঞাঙ্গের আদি – জ্ঞানরূপা; বহুভাবে প্রবিষ্টা আমাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন। জীব যে অন্ন ভক্ষণ করে, দেখে, প্রাণ ধারণ করে, – এ সকল আমা কর্তৃক সাধিত হইতেছে...জনগণের জন্য (রক্ষার জন্য, কল্যাণের জন্য) আমিই সংগ্রাম করি, আমিই দ্যুলোকে ও ভূলোকে সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। এই সকলের (দৃশ্যমান সব কিছুর) পিতাকে আমিই প্রসব করি...। (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬ : ৭)

পরম ব্রহ্মের মহিমাই উপরিউক্ত সূক্তে প্রকাশিত। জগতের সকল ক্রিয়ার মূলে রয়েছে তাঁরই এক সর্বব্যাপিনী শক্তি তথা দেবী। তিনিই মহামায়া। জগতের সমস্ত ক্রিয়া এবং জ্ঞানের মূল কারণ। ফলে শক্তি এবং শক্তিমানে তথা ব্রহ্ম এবং 'ব্রহ্মময়ী'তে পার্থক্য নেই। ব্রহ্মের অন্তরে ব্রহ্মময়ীর বাস। সেই পরম ব্রহ্ম মূলে নিরাকার বা নিরাকারা হলেও ভক্তের বাসনা অনুযায়ী তিনি সর্বপ্রকার ইষ্টমূর্তি গ্রহণ করতে পারেন (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৪১৬ : ২৬৪-৬৫)। রাধারমণের পদে আমরা এই মহামাতৃরূপেরই প্রকাশ দেখতে পাই। এদিক থেকে সাধক কবি রামপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার ঐক্য লক্ষ করার মতো। সাধনার সাযুজ্যই হয়ত এর সমিলতার কারণ। রামপ্রসাদের শাক্তপদের উদাহরণ দেয়া যায় :

ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম – সকল আমার এলোকেশী।
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা রাম-রূপে ধর ধনু কালী-রূপে করে অসি ॥
(রামপ্রসাদ সেন ২০১০ : ১১৪)

রাধারমণের পদে মাতৃমূর্তি তথা দুর্গা কেবল দুর্গতিনাশিনী বা দুর্গরক্ষাকারিণী হিসেবে প্রকাশিত নয়। মহামায়া বা মহামাতৃমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই মহামাতার আরাধনা বা পূজা করে যিনি এই শক্তিরূপিনীকে ধারণ করে আছেন, সেই পরম 'পুরুষ'কে তথা কৃষ্ণকে পাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। ফলে আপাত শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধারার প্রতীক হলেও দুর্গা এবং কৃষ্ণ সাধকের ভাব-জগতে শিব-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত:

> পৌরাণিক যুগে ভারতীয় সাহিত্যে লোকায়ত সমন্বয়ের ফলে বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বৈষ্ণবের বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, তন্ত্রের শিব ও শক্তি বা মহেশ্বর-উমা একই তত্ত্বের দ্যোতকরূপে পরিগণিত হয়েছে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এই সমন্বয়ের তত্ত্বটি অনায়াসে গৃহীত হয়েছে। (ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪০৪ : ৩৩)

অষ্টাদশ শতকের সাধক কবি রামপ্রসাদের পদে আমরা যেমন এই দুই দার্শনিক ধারার সমন্বয় প্রচেষ্টা লক্ষ করি, রাধারমণের পদেও যেন একই রীতির প্রতিধ্বনি।

৯.৫ রাধারমণের শাক্তপদের কাব্যমূল্য

শাক্তপদ মূলত সাধনসংগীত হিসেবে বিবেচিত। শাক্তপদের প্রাণ হচ্ছে এর বাৎসল্য রস। মা-সন্তানের চিরন্তন সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া গান শ্রোতার অন্তরে আকুলতা জাগালেও, সুর ব্যতীত পদগুলোর আবেদন খুব বেশি নেই। আবার শাক্তপদে যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি ফুটে উঠেছে, সেগুলি শুধু কবিতা বা গান পদবাচ্য হয়েছে – আর যাতে কেবল তত্ত্ব বা সাধনার কথা প্রাধান্য তাকে পদ বা কবিতা বলা যায় না

(অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮: ২৪৩)। রাধারমণের পদে সাধনকথারই প্রাধান্য। তবে দু'একটি পদে কবির ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ পরিলক্ষিত হলেও মাতৃস্বরূপার প্রতি কবির যে নিবেদন এবং আকুতি, তাতে কাব্যিক বৈচিত্র্য কম। বলা যায়, কবি-কল্পনার স্থান প্রায় নেই। সরল বর্ণনাই এর মূলবৈশিষ্ট্য। আমরা বৈষ্ণব পদাবলিতে লক্ষ করি – সাধনভজনের অতিরিক্ত একটি সুষম সৌন্দর্যবোধ থাকে, যা পাঠককে, অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকেও সৌন্দর্যরসে মুগ্ধ করে। 'কিন্তু শাক্তপদাবলিতে গীতিরসের অতিরিক্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ-জাত কাব্যলক্ষণ অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ : ২৪২)। রাধারমণের শাক্তপদ সাধনপদ হিসেবে চিন্তার খোরাক যোগায়। তবে তার শাক্তপদ কবিতা হিসেবে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণের জন্য যথাযথ শিল্পরসসমৃদ্ধ নয় – ব্যক্তির আবেগানুভূতির প্রবল উপস্থিতির অভাবই হয়ত এর শৈল্পিক ঊনতার প্রধান কারণ। প্রকাশের দিক থেকে বৈষ্ণব কবিতার রীতির অনুসারী – প্রধানত ছয় এবং আটমাত্রার ত্রিপদীতে তিনি শাক্তপদগুলোকে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন।

(খ) শিববন্দনা

রাধারমণের সংগৃহীত গানে শিববন্দনার পদ কয়েকটি মাত্র। তবে ধারণা করি, এর রচিত প্রকৃত পদের সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। শক্তিস্তুতির পদে আমরা মাতৃবন্দনার যে পরিচয় লাভ করি, তাতে শক্তির বিপরীতে 'শক্তিমান' শিবের উপস্থিতি অনিবার্য।

শিববন্দনার পদে মূলত শিবের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তিনি পুরাণ এবং রামায়ণের কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন :

ববম ববম কমলপদে দণ্ডবৎ ও কাশীনাথ
ও সমুদ্র মন্থনকালে বিষ উঠে উথাইলে ॥
সেই বিষ ও করিলায় পান ও কাশীনাথ
ও বিষ ও খাইয়া বেভোর হইয়া পার্বতী কুলে লইয়া
সেই ধরে নীলকণ্ঠ নাম ॥
লঙ্কাতে রাবণ দুষ্ট মদ মাংস খাইয়া তুষ্ট
সেও তো আছিল তোমার দাস
রাম যারে সংহারিল বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল
তাহারে তরাইলায় নিজ গুণে ॥
সিংহ বাঘেরে থুইয়া বিল্বডালে উঠ বাইয়া
শিবরাত্রি চতুর্দশী দিনে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শম্ভুনাথের পদকমলে
অন্তিমকালে দিও চরণতরী ॥

(রাধারমণ দত্ত ২০১৪ : ৫৫০)

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত পদে শিবের 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ, রাম-রাবণের কাহিনিসহ বর্ণনার ভেতর দিয়ে মূলত শিবের মহিমাই বর্ণিত হয়েছে। রাধারমণ শক্তিমান শিবের পদকমল প্রত্যাশী।

(গ) রাধারমণের ধামাইল গান

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে 'ধামাইল' নামে একধরনের নৃত্যগীতের প্রচলন রয়েছে। এটি এ অঞ্চলের নিজস্ব সম্পদ বলে দাবি করা হয় (হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৩৮৫ : ১৮৭; মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ১৯৯৯ : ৩৯৯)। বিভিন্ন পারিবারিক-সামাজিক ও ধর্মীয়-আচারিক অনুষ্ঠানে এই ধামাইল পরিবেশিত হয়। দলবেঁধে হাতে তালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠিত হওয়া এই নৃত্যগীতের সাথে রাধারমণের নাম জড়িয়ে আছে। বর্তমানে এতে ব্যবহৃত বেশির ভাগ গানই রাধারমণের (দীপংকর মোহান্ত ২০০৭ : ৩৬৫); আবার কারো মতে, 'পঁচানব্বই শতাংশ' গানের রচয়িতা রাধারমণ (নন্দলাল শর্মা ২০০২ : ২৩)। ফলে, কেউ কেউ রাধারমণকে ধামাইল গানের 'প্রতিষ্ঠাতা' বলে বিবেচনা করেন (মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন ২০০২ : ৩৪)।

তবে রাধারমণের জীবন-ইতিহাস এবং জীবনদর্শন-পাঠে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ধামাইল এবং রাধারমণের একীভূত হয়ে যাওয়ার পেছনের কারণটি সাহিত্যিক নয়, বরং লৌকিক। মূলত, রাধারমণের রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদগুলোই প্রচলিত লোকনৃত্য 'ধামাইলে' ব্যবহৃত হয়েছে; এবং ব্যবহারের আধিক্যে কারও নিকট মনে হতে পারে – রাধারমণ সচেতন প্রয়াসে ধামাইলের গান রচনা করেছেন। বস্তুত, রাধারমণ 'ধামাইল' নামে কোনো গান রচনা করেননি। বৈষ্ণবীয় রীতির সাধনভজন বা কীর্তন বা বৈষ্ণবপদগুলো লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে এবং লোকনৃত্যের গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

---

১. ধামাইল : 'ধামালি' বা 'ধামালী' শব্দের অর্থ 'অঙ্গ-ভঙ্গি করে নাচগান' (মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য ২০০০ : ৬৪৫)। সংস্কৃত 'ধাবন্' – যার অর্থ 'দৌড়ানো বা দ্রুত পদক্ষেপ' কিংবা, 'ধুমালী' – কোনো উৎসবে ভূমিকা হিসেবে বাদ্যযন্ত্র বাজানো – থেকে 'ধামাইল' শব্দটির উদ্ভব হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। মধ্যযুগের সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সঞ্জয় মহাভারত, সতী ময়নামতী প্রভৃতিতে 'ধামালী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মূলত রঙ্গ-কৌতুক অর্থে (দুলাল চৌধুরী ২০০৪ : ১৫৬)। 'ধামাইল' মূলত সংগীতমুখর লোকনৃত্য। বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ এবং আসামের বরাক উপত্যকায় এই নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। এটি মেয়েদের নৃত্য হলেও পুরুষরাও এতে অংশ নিয়ে থাকে। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, গোপিনী কীর্তন, পুষ্পদোল, সূর্যব্রত, নৌকাটানা প্রভৃতি আচার-উৎসবে ধামাইলের প্রচলন থাকলেও মূলত হিন্দুবিয়েতে ধামাইলের অধিক প্রচলন দেখা যায়। বিয়েতে পাকা দেখা, মঙ্গলাচরণ, জলভরা, আদ্যস্নান, গায়ে হলুদ, অধিবাস, ফুলচন্দন, বাসিবিবাহ, চতুর্থমঙ্গল প্রভৃতি লোকাচারে ধামাইল নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। মেয়েরা দুই হাতে তালি দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে সমবেতভাবে কণ্ঠে গান পরিবেশন করে; এবং এতে পদভঙ্গির বৈচিত্র্য লক্ষ করার মতো। তালের সঙ্গে সমতা রেখে সামনে-পেছনে পদক্ষেপ বদল করে ঘুর্ণনের কাজটি করা হয়। তবে উৎসব বা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। নৌকাটানায় ধামাইল নৃত্যে বারমাসী

গান, ব্রত অনুষ্ঠানে ভাগবতভিত্তিক কৃষ্ণলীলার লৌকিক রূপ, বিয়ে ইত্যাদিতে লৌকিক রাধাকৃষ্ণের কাহিনি এবং সমসাময়িক বিষয়ের গান ব্যবহৃত হয় (দুলাল চৌধুরী ২০০৪ : ১৫৬)। ধামাইল নৃত্যের সাথে জড়িয়ে আছে 'ধামাইল গান'। 'ধামাইল গান ভাবের দিক থেকে মূলতঃ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হলেও, সুরে ও ছন্দে তা বিরহ-বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যকে অতিক্রম করে পার্থিব উল্লাসে ভরপুর' (হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৩৮৫ : ১৮৭)।

রাধারমণ রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথাই রচনা করেছেন এবং তা গীত হয়েছে। আমরা জানি, বৈষ্ণবপদ কীর্তন হিসেবে পরিচিত (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ৩২)। কীর্তন হলো প্রেম-ভক্তির সাধনভজন। এর মূল লক্ষ্য আত্মনিবেদন – প্রেমমার্গে পরমসত্তার অনুসন্ধান। আর ধামাইল মূলত আনন্দ-উচ্ছ্বাস-মুখর নৃত্যগীত। রাধারমণ প্রচলিত অর্থে গীতিকার ছিলেন না। কীর্তন তাঁর সাধনকার্যের অংশ। ফলে 'সাধক কবির' পক্ষে লোকনৃত্যের গীতিকার হওয়ার ভাবনা কঠিন। তাছাড়া, রাধারমণের জীবনীকারগণও কোথাও তাঁকে ধামাইলগানের রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

উপসংহার

১০.১

রাধারমণের প্রায় আশি বছরের দীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত এখন পর্যন্ত তৈরি করা যায়নি। এর মূল কারণ – প্রায় শতবছর আগে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জীবন সম্বন্ধে লিখিত প্রায় কিছুই নেই। তাঁকে নিয়ে প্রথম ক্ষুদ্রাকৃতির জীবনী প্রকাশিত হয় মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, *শ্রীহট্ট প্রতিভায়* (১৯৬১)। এতে সিলেট অঞ্চলের অন্য অনেক প্রথিতযশার জীবনীর সঙ্গে দুই পৃষ্ঠায় রচিত রাধারমণের জীবনীতে খুব অল্প তথ্যই সন্নিবেশিত হয়; তথ্যের চেয়ে ব্যাখ্যার অংশই তাতে বেশি। যথাসময়ে জীবনেতিহাস রচিত হলে যেসব বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া সম্ভব হতো, তা হয়নি এবং সে সম্ভাবনাও প্রায় নেই। আমরা কবির উত্তরসূরিদের সাক্ষাৎকারগ্রহণ, ক্ষেত্রানুসন্ধান, প্রকাশিত গ্রন্থসহ নানা উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যে জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করেছি, তাতে লক্ষ করি – রাধারমণের জীবনের দুটি পর্ব : বৈষ্ণবপূর্ব জীবন এবং বৈষ্ণবপরবর্তী জীবন। আমরা জানি, স্ত্রীসন্তান হারিয়ে রাধারমণ সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং আশ্রমে আরাধনায় মগ্ন হন। আর তখনি রচিত হতে থাকে তাঁর সাধনপদ। বলা যায়, বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাই তাঁকে পদরচনায় প্রেরণা জোগায়। তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফুরণ ঘটে; রচিত হয় রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদ। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে এদিক থেকে তাঁর মিল লক্ষ করার মতো। শাক্তমত থেকে বৈষ্ণবমতে আশ্রয়গ্রহণ করায় গ্রহণিরোগে কষ্টপাওয়া কবি গোবিন্দদাসের রোগান্ত ঘটেছিল। চল্লিশ বছর বয়সে কবির মতান্তর ঘটে এবং পরবর্তী জীবনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

রাধারমণের বৈষ্ণবমতে আস্থা স্থাপন প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে। তিনি তখন জীবনের শেষার্ধে উপনীত। 'পঞ্চাশ বৎসরের অনভ্যাস ও বাঁধা'কে অতিক্রম করে তাঁর কবিপ্রতিভা জেগে ওঠে (নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১ : ১৭৯) – সমালোচকের এ অভিমত আমাদের বিবেচনায় পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, শিল্পক্ষেত্রে অনভ্যাসের বাধা একেবারে সহজবাধা নয়। একে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য যে প্রেরণা দরকার তা-কি সহজসাধনা কিংবা বৈষ্ণবমতে ছিল? গোবিন্দদাস সম্বন্ধে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কথার অনুকরণ করে বলা যায় (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৯৯৭ : ১৫৭) – রাধারমণ নিশ্চয়ই প্রথমাবধি কবি। সহজিয়া বা বৈষ্ণবতা যত বড় প্রেরণাই হোক কাব্যরচনার অভ্যাস না থাকলে পঞ্চাশোত্তর বয়সে আরম্ভ করে অত বড় কবি হওয়া যায় না। আমরা অনুমান করি – কাব্যচর্চার অভ্যাস রাধারমণের ছিলই। পঠন-পাঠনের অভ্যাস যে ছিল তার পরিচয় আমরা লাভ করি কবির পদাবলি পাঠে। তাঁর কাব্যে জয়দেব-চণ্ডীদাসসহ পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব লক্ষ করে আমরা অনুধাবন করি, মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্যের ব্যাপক পাঠ কবির ছিল; এবং বৈষ্ণব রসতত্ত্বসহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। ফলে বলা যায়, রাধারমণের

কবিপ্রতিভার বিকাশ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। একটি প্রস্তুতি পর্বের ভেতর দিয়েই কবি অগ্রসর হয়েছেন এবং একাকিত্বের অবসর ও নতুন সাধনভজনের প্রেরণার সমন্বয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার সমূহ প্রকাশ ঘটে।

তবে এ শুধু যুক্তির কথা। রাধারমণের পরিপূর্ণ জীবনকে জানা হয়ত আর কখনোই সম্ভব হবে না – রহস্যের আবরণে ঢাকা থেকে যাবে তাঁর জীবনের অনেক অজানা অধ্যায়।

১০.২

রাধারমণকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি প্রধানত দুই রূপে : সাধক এবং কবি। তিনি বিশিষ্ট সাধনরীতির অনুসারী উপাসক। উপাসনার নির্দিষ্টতা তাঁকে সহজিয়াবৈষ্ণব মতের বা পথের সাধক হিসেবে চিহ্নিত করে। আমরা রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা কেন্দ্রিক সাধনভজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে যেমন বৈষ্ণব হিসেবে আখ্যায়িত করি, তেমনি শরীর নির্ভর গূঢ়-সাধনের মাধ্যমে তিনি সহজিয়া হিসেবেও নিজেকে প্রকাশ করেন। এ দ্বৈত সাধনরীতির সমন্বয় ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে নতুন কিছু নয় – ধর্মমতের বা দর্শনের ইতিহাসই হচ্ছে গ্রহণ-বর্জনের বা স্বীকরণের ইতিহাস। বৌদ্ধ সহজিয়া এর নিকটতম উদাহরণ।

রাধারমণকে আমরা শুরু থেকেই একজন সংসারবিবাগী জগৎ-জীবনের গূঢ় রহস্যের সন্ধানে নিয়োজিত ভাবুক হিসেবে পাই। ভববন্ধনের কারণ এবং এর থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধানে তিনি নিয়োজিত। এই জগৎ-ভাবনা তাঁকে সাধনকাজে প্ররোচনা জোগায়। ফলে তিনি একদিকে যেমন অনুসন্ধান করেছেন শরীরের রহস্য – এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা 'ব্রহ্মাণ্ডে'র ক্ষুদ্রাকৃতিরূপ, অন্যদিকে প্রেমময় পরমসত্তার অন্বেষণে হয়েছেন ভাববৃন্দাবনের নিবিষ্ট পথিক। এই দুইয়ের সমন্বয়ে 'রাধারমণ' নামে যে সাধকমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, তাঁর নামের পাশে অঙ্কিত আছে সহস্রাধিক ভজনসংগীত বা কীর্তন। ফলে রাধারমণকে আমরা নিষ্ঠাবান আরাধক বা সফল সাধক হিসেবে উপস্থাপন করেছি।

একই সঙ্গে, রাধারমণ কবি – লোককবি। আমরা কবির জীবনের নানা দিক আলোচনা করে তাঁর লোককবি হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত যেমন আলোচনা করেছি, তেমনি তাঁর সাধনপদ বা কীর্তনকে পদাবলি সাহিত্যের রীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছি। এতে গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করে মধ্যযুগীয় কবিতার ধারার সঙ্গে মিল-অমিল আবিষ্কার করে কখনো চমৎকৃত হয়েছি। তাঁর কবিত্বের উৎকর্ষের বর্ণনাও উপস্থাপিত হয়েছে। আবার, রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথার গতানুগতিক বর্ণনার একঘেয়েমিতার পরিচয়ও আমরা লাভ করেছি। কখনো-বা পূর্ববর্তী কবির অনুসরণের সাদামাটা রূপ দেখে কবির সীমাবদ্ধতার চিত্রও উন্মোচন করার প্রয়াস পেয়েছি। তবুও, ছন্দ-অলংকার, কাব্যিকতার লক্ষণ কিংবা শিল্পপ্রয়াসের স্বকীয়তায় রাধারমণ বিশিষ্ট লোককবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি হাজার বছরের কাব্যিক ধারার সঙ্গে আধুনিক সময়ের যোগসূত্রের একজন ধারকও। এখানে তিনি সমসাময়িক অনেক লোককবির চেয়ে ব্যতিক্রম। বৈষ্ণবের তত্ত্বকথা এবং সাধনভজনকে শিল্পরূপ প্রদান করে রাধারমণ হয়ে উঠেছেন ঊনবিংশ শতকের অন্যতম প্রধান গীতিকবি।

রাধারমণ আচারনিষ্ঠ উপাসক এবং মরমি কবি। তবে এই দুই পরিচয়ের কোনটি প্রধান হয়ে উঠেছে – এ-প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা মধ্যযুগের গীতিকবি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের মতোই রাধারমণের ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য। কবির জীবনবৃত্তান্ত, জীবনদর্শন আলোচনাকালে রাধারমণের তাত্ত্বিক-ভাবনা, বিশ্বাসের ভিত্তিমূলের পরিচয়, তেমনি তাঁর কাব্যকুশলতা বিশ্লেষণ করে দুটি পরিচয়ই প্রায় সমভাবে ফুটে উঠেছে।

আমরা বলতে পারি, উপাসকের একনিষ্ঠতায় যে আন্তরিকতা থাকে, তা পূর্ণরূপে নিবেদিত ছিল বলেই রাধারমণের মনোভূমি সৃজনশীলতার উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হতে পেরেছিল।

১০.৩

অপরিহার্য শব্দের শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসই কবিতা। শব্দের যথাযথ ব্যবহারের কুশলতায় ফুটে ওঠে কবির উৎকর্ষের পরিচয়। সুতরাং কবিমাত্রই শব্দের কারিগর। রাধারমণের বৈষ্ণবপদ বা কবিতা একই রীতির অধীন। তবে, যেহেতু তা প্রথমাবধিই কবির স্বহস্তে লিপিকৃত নয় বলে মেনে নেয়া হয়েছে এবং কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপিও রক্ষিত নেই – ফলে রাধারমণের গানের মূল রচনার অক্ষুণ্নতার যে প্রত্যাশা তা পূরণের সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। গান বা পদের বাণী ও সুরের আকর্ষণীয় রূপ একে শ্রোতাপ্রিয় করে তুলেছে এবং সিলেটসহ বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়েছে। মুখে মুখে এর বিস্তার ঘটার ফলে লোকসাহিত্যের রীতি অনুযায়ী তা একেক অঞ্চলে একেকরূপ লাভ করেছে। ফলে একই গানের অঞ্চলভেদে বিভিন্ন পাঠ লক্ষ করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় গানের গায়ক বা শ্রোতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। লোকগানের গায়ক বাণী অনুধাবনের ক্ষমতা এবং গায়নের দক্ষতার জন্য হয়ত কোনো শব্দের বা চরণের পরিবর্তন সাধন করেছেন। শ্রোতার ক্ষেত্রেও অনুধাবনের বোধ থাকা জরুরি। তবে সংগৃহীত পদগুলোর মৌলপ্রবণতা – ছন্দ, অলংকার এবং শব্দব্যবহারের রীতি অনুসরণ করলে আরোপিত শব্দ বা চরণের উপস্থিতি আবিষ্কার দুরূহ নয়। এক্ষেত্রে লোকগায়ক বা শ্রোতার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষিত সংগ্রাহকের অংশগ্রহণ রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। কোনো কোনো পদে আঞ্চলিকতার সৌন্দর্যকে পরিমার্জনা করে একে নাগরিক কবিতায় রূপদেয়ার প্রবণতাও লক্ষ করার মতো।

রাধারমণের গানের বা পদের বিজ্ঞানসম্মত সংগ্রহ বা সম্পাদনা অনেক ক্ষেত্রে হয়নি বলেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। ক্ষেত্রগবেষণা বা তথ্যসংগ্রহে 'বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি' কিংবা, ক্ষেত্রবিশেষে 'আসক্তি'র বা দুটোর সমন্বয়ের আবশ্যকতা রয়েছে (তুষার চট্টোপাধ্যায় ২০০৪ : ৩৮৮)। রাধারমণের পদে সবক্ষেত্রে সঠিক 'পদ্ধতি'র অনুসরণ হয়েছে – এমনটা বলা যাবে না। ফলে, কোথাও কোথাও পদের স্বতস্ফূর্ততা এবং শিল্প-সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়েছে। পদাবলি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যা অবশ্য নতুন নয়।

১০.৪

রাধারমণের বৈষ্ণবপদ কি তাঁর জীবনবিমুখতাকে প্রকাশ করে? সহজসাধনায় দীক্ষা নিয়ে সমাজ-সংসারের জাগতিককর্ম অবহেলায় দূরে সরিয়ে কবি আপন করে নিয়েছেন আশ্রমের নির্জনতাকে। আমরা জীবনবৃত্তান্ত

আলোচনাকালে দেখেছি – নিকটজনের সান্নিধ্যবঞ্চিত রাধারমণ তত্ত্বকথার সান্নিধ্যে নির্জনতার, একাকিত্বের, বঞ্চনার কিংবা প্রেমহীনতার যে সীমাহীন মর্মযাতনা, তা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। বলা যায়, সাধনভজনের নতুন পথ তাঁকে সেই মুক্তির সন্ধান প্রদান করে। ফলে প্রেমের চিরন্তন স্থানে – ভাববৃন্দাবনে যাত্রাপথে রাধারমণ আশ্রয়গ্রহণ করেছেন প্রেমমার্গের। জীবনসায়াহ্নে রাধার আকুতি 'আমার কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণনাম ললিতে গো'। সাধনরীতির 'আরোপতত্ত্বে'র অনুসারী রাধারমণের এবং রাধার অভিন্ন হয়ে ওঠাই প্রত্যাশিত। ফলে সহচরীর নিকট শেষ ইচ্ছা – 'আমার মরণকালে দেখাইও শ্যাম'। জগতের মায়াময়তা থেকে ভাবের চিরস্থায়িত্বের পথে সাধকের যাত্রাপথে আপাত জীবনমুখিতা দেখা যায় না। বৈরাগ্য জীবনের বিপরীত কোটিতে অবস্থান করে। জীবনের সম্মুখগামিতাকে পশ্চাতে ফেলে বৈষ্ণবের বৈরাগ্য অনুসন্ধান করে জীবনোত্তরকে – যেখানে হারানোর বেদনা নেই, বঞ্চনার যাতনা নেই, অপেক্ষা কিংবা উপেক্ষার অপমানও নেই – আছে কেবল 'দ্বৈতে'র 'অদ্বৈতে' বিলীন হওয়ার পরিণতি; চির মিলন, মিলনের সীমাহীন আনন্দ।

রাধারমণ জীবনকেই আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জীবন তাঁকে ঠেলে দিয়েছে বৈরাগ্যের নির্জন পথে। ফলে জীবনবঞ্চনা ভিত্তিভূমি হলেও তাঁর কাব্য ধারণ করে আছে বৈরাগ্যদর্শনকে।

১০.৫

রাধারমণ তাঁর কাব্যে পদাবলির ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন। হাজার বছরের সাধন-ভজনের রীতি-পদ্ধতির পরিচয় আমরা যেমন তাঁর পদে প্রত্যক্ষ করেছি, তেমনি পরবর্তী লোককবিদের রচনায় তাঁর পদের প্রভাবও প্রত্যক্ষ করেছি। ফলে, এর মধ্য দিয়ে রাধারমণের কবি হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত প্রকাশিত হয়েছে। জয়দেব থেকে আরম্ভ করে সমকালীন কোনো লোককবির পদ বা গান দ্বারা কবির পদ সমৃদ্ধ হতে দেখে আমরা অনুমান করি, পদাবলি-রচনায় তাঁর সৃজনশীলতার পাশাপাশি ব্যাপক পাঠ এবং গভীর অভিনিবেশ ছিল। আর এর অনেকটাই তিনি লাভ করেছিলেন পারিবারিক পরিমণ্ডলে।

একই সঙ্গে, রাধারমণের কবি হিসেবে বিকশিত হওয়ার পেছনে তৎকালীন বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করি। ঊনবিংশ শতকে সিলেটে হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবানুসারীরাই বেশি ছিল। একই সঙ্গে একথাও স্মরণযোগ্য যে, মুসলমানরা ছিল অন্যসকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের চেয়ে কিছুটা সংখ্যাগরিষ্ঠ (ওয়াকিল আহমদ ১৯৯৯ : ৪৫৩)। ফলে, রাধারমণের কবি হওয়ার পেছনে ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত কারণ কার্যকর ছিল। বৈষ্ণবানুসারীদের নিকট তিনি পদাবলির গীতিকার হিসেবে সহজেই ঠাঁই করে নিয়েছিলেন, এমন অনুমান করা যায়। কিন্তু, রাধারমণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা পাঠকশ্রোতার নিকট ব্যাপক গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ ভিন্ন। বলা যায়, রাধারমণ বিকশিত হয়েছিলেন মুখ্যত বৈষ্ণব-পরিবেশে। কিন্তু রাধারমণ টিকে আছেন প্রধানত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশে।

পদাবলি বৈষ্ণবদের সাধনকথা হলেও তা মানবিক ভাবাধারে প্রকাশিত। এর অন্তরে তত্ত্বকথা, কিন্তু বাইরে মানবিক প্রেমের উপাখ্যান। এর চরিত্রগুলো রাগ-অনুরাগ, বিরহ-মিলনের দুঃখ-সুখকে ধারণ করে আছে, যা ধর্ম-বর্ণ, স্থান-কালের অতীত। ফলে, রাধারমণের পদের দুই দিক – একটি সাধনার, অপরটি

শিল্পের। রাধারমণ পাঠক-শ্রোতার নিকট স্থায়ী হয়ে আছেন যতটা না সাধকরূপে, তার চেয়ে বেশি কবিরূপে। অ-বৈষ্ণব সমাজে তাঁর তত্ত্বকথার গুরুত্ব খুব বেশি হবার কথা নয়। তবে প্রেম-সম্পর্কের নানা দিক প্রকাশের যে শিল্পপ্রচেষ্টা, তা সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালি পাঠক-শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করেছে। ফলে রাধারমণের পদ কেবল রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকথা প্রকাশের বাহন আর থাকে না, মানবিক চিরায়ত প্রেমগাথার আধার হয়ে ওঠে। রাধারমণ গৃহীত হন প্রেমকথার গীতিকার বা কবিরূপে।

সংকেত

তা.বি. : তারিখ বিহীন।
পৃ.ন.বি. : পৃষ্ঠা নম্বর বিহীন।

সহায়ক গ্রন্থ

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ২০০৯, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৪১১, *কাব্যজিজ্ঞাসা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯৯২, *গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব*, বেস্টবুক্স্, কলিকাতা।

অনিমেশ বিজয় চৌধুরী (সম্পাদিত), *রাধারমণ- নির্বাচিত গান*, রাধারমণ স্মৃতিতর্পণ, সিলেট।

অনুরাগী ১৪০৮, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, তৃতীয় সংস্করণ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত ও সম্পাদিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪)।

অমলেন্দু ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) ২০০৪, *মনসা পাঁচালী*, রাধামাধব দত্ত, মেঘালয়।

অরুণকুমার বসু ১৪০৮, *শক্তিগীতি-পদাবলী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৩৭১)।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬)।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-২০১১, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯)।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০-১১, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, (প্রথম সংস্করণ ১৯৬২)।

আবদুল ওয়াহাব ২০০৮, *বাংলাদেশের লোকগীতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা।

আবদুল ওয়াহাব ২০০৯, *লালন-হাসন: জীবন-কর্ম-সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল কাদির ২০০১, *ছন্দ-সমীক্ষণ*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

আমিনুল ইসলাম ২০০২, *জগৎ-জীবন-দর্শন*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

আমিনুল ইসলাম ২০০৮, *বাঙালির দর্শন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আরকুম শাহ ২০১১, *আরকুম শাহ সমগ্র*, সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

আরিস্টটল ২০০৩, *কাব্যতত্ত্ব*, শিশিরকুমার দাশ অনূদিত, প্যাপিরাস, কলকাতা।

আল মাহমুদ ২০০৬, *কবিতাসমগ্র*-১, তৃতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা।

আলাওল ২০১৩, *পদ্মাবতী*, সপ্তম মুদ্রণ, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮)।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ১৯৫৭, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৯৮, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, অষ্টম সংস্করণ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

আহমদ কবির ১৯৮৬, *রবীন্দ্রকাব্য: উপমা ও প্রতীক*, মুক্তধারা, ঢাকা।

আহমদ শরীফ ২০০৩, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা।

আহমদ শরীফ ২০০০, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮) ।

আহমদ শরীফ ২০০৮, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২০১২, *ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ*, পঞ্চম মুদ্রণ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, (প্রথম সংস্করণ: ১৯৬৯)।

উকিল মুন্সি ২০১২, *বাংলাদেশের বাউল ফকির: পরিচিতি ও গান*, সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

উকিল মুন্সি ২০১৩, *উকিল মুন্সির গান*, মাহবুব কবির সংগৃহীত ও সম্পাদিত, ঐতিহ্য, ঢাকা।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৪৬, *চক্রপাণি বংশ*, শ্রীহট্ট।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৮, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, তৃতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪)।

এস এম লুৎফর রহমান ১৯৯০, *বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান*, ধারণী সাহিত্য-সংসদ, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ ১৯৯৯, *লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ ২০০০, *বাউল গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ ২০০৬, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ ২০১০, *বাউল গানের ধারা*, গতিধারা, ঢাকা।

কফিলউদ্দিন সরকার ২০১৩, *কফিলউদ্দিন সরকারের গান*, সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত, কালিকলম প্রকাশনা, ঢাকা।

কবীর চৌধুরী ২০০৮, *সাহিত্যকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

করুণাময় গোস্বামী ২০০৪, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম ২০১১, *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, (প্রথম সংস্করণ ১৯৭০)।

কালাশাহ ২০১৪, *কালাশাহ গীতিসমগ্র*, নন্দলাল শর্মা সম্পাদিত, মাতৃভূমি প্রকাশনী, ঢাকা।

কালিদাস ১৯৯৯, *কালিদাসের মেঘদূত*, বুদ্ধদেব বসু অনূদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

কাহ্নপা ২০০৭, *Buddist Mistic Songs*, Translated with annotations by Dr. Muhammad Shahidullah, Mowla Brothers, Dhaka, (First published: 1960).

কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৯৭৮, *সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান*, ফার্মা কেএলএম (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা।

কৃষ্ণদাস ১৩৯৭, *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*, সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার (সম্পাদিত) ১৩৫৯, *বিদ্যাপতির পদাবলী*, নতুন সংস্করণ, কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কলিকাতা।

গগন হরকরা ১৪০৮, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, তৃতীয় সংস্করণ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত ও সম্পাদিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪)।

গোপাল হালদার ২০০৭, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, মুক্তধারা, ঢাকা।

গোবিন্দদাস ১৯৯৮, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

গোবিন্দদাস ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

গোবিন্দদাস ১৯৬১, *গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ*, বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

গোবিন্দচন্দ্র দেব ২০০৪, *তত্ত্ববিদ্যা সার*, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা।

গোপাল হালদার ২০০৭, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা (মুক্তধার প্রথম সংস্করণ ১৯৭৪)।

চণ্ডীদাস ১৩৪১, *চণ্ডীদাস-পদাবলী*, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির, কলিকাতা।

চণ্ডীদাস ১৯৯৮, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

চণ্ডীদাস ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

চন্দ্রশেখর ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

চৌধুরী গোলাম আকবর ১৯৮১, *রাধারমণ-সংগীত*, মদনমোহন কলেজ সাহিত্য পরিষদ, সিলেট।

জসীম উদ্‌দীন ২০১০, *নক্সী-কাঁথার মাঠ*, ঊনবিংশ প্রকাশ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, (প্রথম প্রকাশ ১৯২৯)।

জসীম উদ্‌দীন ২০১০, *রাখালী*, একাদশ প্রকাশ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ ১৯২৭)।

জয়দেব ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ১৩৭০, *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা*, তৃতীয় সংস্করণ, ডি, এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৩)।

জিননূরিন নাহার রাজা (সম্পাদিত) ২০০৫, *হাছন নন্দন একলিম রাজায় বলে*, ব্রাত্যজন, কুমিল্লা।

জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৯৩, *বাঙলা ছন্দ*, একাদশ সংস্করণ, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ (প্রা.) লি.,কলিকাতা, (প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৬)।

ডোম্বীপা ২০০৭, *Buddhist Mystic Songs*, Translated with annotations by Dr. Muhammad Shahidullah, Mowla Brothers, Dhaka, (First Published: 1960).

তপন বাগচী (সম্পাদিত) ২০০৯, *রাধারমণের গান*, বর্ণায়ন, ঢাকা।

তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল ২০০৪, *সূফী দার্শনিক কবি শেখ ভানু*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

তাড়কপাদ ১৩৮৮, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, (প্রথম সংস্করণ ১৩২৩)।

তুষার চট্টোপাধ্যায় ২০০৪, *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান*, চতুর্থ সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা. লি., কলকাতা।

দীন ভবানন্দ ২০১১, *হরিবংশ*, মোস্তফা সেলিম সম্পাদিত, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

দীন ভবানন্দ ২০১২, *বাংলাদেশের বাউল ফকির : পরিচিতি ও গান*, সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

দীনেশচন্দ্র সেন ২০০২, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত) ২০০৪, *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা।

দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা (সম্পাদিত) ২০০৯, *হাছন রাজা সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

দেবিদাস ভট্টাচার্য ১৩৮৯, *বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪১৩, *লোকায়ত দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, (প্রথম সংস্করণ ১৩৬৩)।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২০১১, *ভারতীয় দর্শন*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৯৬০)।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ১৯৯৭, *শাক্ত পদাবলী*, পঞ্চম মুদ্রণ, রত্নাবলী, কলকাতা।

নন্দলাল শর্মা (সংগৃহীত ও সম্পাদিত) ২০০২, *রাধারমণ গীতিমালা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

নন্দলাল শর্মা ২০০৬, *সিলেটের জনপদ ও লোকমানস*, যুক্তরাজ্য।

নন্দলাল শর্মা (সম্পাদিত) ২০১৪, *কালাশাহ গীতিসমগ্র*, মাতৃভূমি প্রকাশনী, ঢাকা।

নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ১৯৬১, *শ্রীহট্ট প্রতিভা*, শ্রীহট্ট।

নরেন বিশ্বাস ২০০০, *অলঙ্কার-অন্বেষা*, অনন্যা, ঢাকা।

নরেশচন্দ্র জানা ১৯৮৬, গাথাসপ্তশতী ও বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

নীলরতন সেন ২০০০, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

নীলরতন সেন ২০১০, ভূমিকা, *চর্যাগীতিকোষ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় ১৪১৬, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬)।

নূর-ই-ইসলাম সেলু বাসিত ২০০৮, *সিলেটের উপভাষা : সাংগঠনিক বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

নৃপেন্দ্রলাল দাশ ২০০৮, *রাধারমণ, তাঁর শাক্ত পদাবলী*, শ্রীমঙ্গল।

পবিত্র সরকার ১৯৯৯, *ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৯৯৪, *সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের পরিচয়*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা।

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০১২, *বৈষ্ণব পদাবলী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা।

প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯৭৭, *ছন্দ-পরিক্রমা*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯৯৭, *নূতন ছন্দ-পরিক্রমা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

ফরহাদ মজহার ২০০৯, *সাঁইজির দৈন্য গান*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮০, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৬১)।

বংশীধর মোদক ১৯৯৪, *বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক : শ্রী শুভকান্তি দাস ও কাকলী দাস, কলকাতা।

বড়ু চণ্ডীদাস ১৪০৭, *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, ষষ্ঠ সংস্করণ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

বড়ু চণ্ডীদাস ১৯৯৮, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বড়ু চণ্ডীদাস ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

বরুণকুমার চক্রবর্তী ২০০৬, *প্রাচীন কাব্য: শিল্পজিজ্ঞাসা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

বলরাম দাস ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

বার্ট্রান্ড রাসেল ২০০০, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, প্রদীপ রায় অনূদিত, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

বিদ্যাপতি ১৩৫৯, *বিদ্যাপতির পদাবলী*, নতুন সংস্করণ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কলিকাতা।

বিদ্যাপতি ১৯৯৮, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বিদ্যাপতি ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

বিনয় ঘোষ ২০০৯, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯, *সাহিত্য-বিবেক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিমানবিহারী মজুমদার ১৯৬১, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

বিষ্ণু দে ১৯৯২, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিহারীলাল চক্রবর্তী ২০০৬, *বিহারীলাল কাব্যসমগ্র*, আবুল বাশার সম্পাদিত, কথারূপ লাইব্রেরি, ঢাকা।

ভারতচন্দ্র ১৪০৫, *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

ভুসুকুপাদ ১৩৮৮, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, (প্রথম সংস্করণ ১৩২৩)।

মঞ্জুলা বেরা ১৪০৬, *বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাশৈলী*, সোনার তরী, কলিকাতা।

মনীন্দ্রমোহন বসু (সম্পাদিত) ১৩৪১, *দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

মনো মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮, *উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দার্শনিক চেতনা*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা।

মাইকেল মধুসূদন ২০০৯, *মধুসূদন রচনাবলী*, পঞ্চম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫)।

মাহবুব কবির ২০১৩, *উকিল মুন্সির গান*, মাহবুব কবির সংগৃহীত ও সম্পাদিত, ঐতিহ্য, ঢাকা।

মিহিরকান্তি চৌধুরী ২০১০, *শাহ আবদুল করিম: জীবন ও কর্ম*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত) ১৯৯৫, *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) ১৯৯৮, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মুহম্মদ আসাদ্দর আলী ১৯৯৮, *ছিলোটি ভাষা*, তাইয়্যীবা প্রকাশনী, সিলেট।

মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৯১, *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদিত) ২০০৫, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৩৮৪, *হারামণি*, সপ্তম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (সম্পাদিত) ২০০০, *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, (অখণ্ড), দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫)।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ২০০৭, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, তৃতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, (প্রথম সংস্করণ ১৯৬৫)।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ২০০৯, *যার যা ধর্ম*, ঐতিহ্য, ঢাকা।

মোস্তফা সেলিম ২০১১, *প্রসঙ্গ-কথা*, হরিবংশ, দীন ভবানন্দ, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ২০০৬, *শিলহটের ইতিহাস*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন ২০০২, *বৈষ্ণব কবি রাধারমণ দত্ত ও তাঁর ধামাইল গান*, প্রকাশক: নাজমুন নাহার লাভলী, মৌলভীবাজার।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২০০১, *বাংলা কবিতার ছন্দ*, প্রতীতি প্রকাশন, ঢাকা।

মোহিতলাল মজুমদার ১৩৫২, *বাংলা কবিতার ছন্দ*, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লি. কলিকাতা।

মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ১৯৯৮, *বাংলার কীর্তন গান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯৯৫, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী (সংগৃহীত ও সম্পাদিত) ১৯৮৮, *বাউলকবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ*, সরস্বতী বুক ডিপো, আগরতলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৮, *সঞ্চয়িতা*, পুনর্মুদ্রণ, প্রতীক, ঢাকা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১১, *প্রবন্ধসমগ্র*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১১, *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ২, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১১, *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২, *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ১৫, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ মাইতি (সাল অনুল্লেখিত : মুখবন্ধ রচিত ১৯৬২), *চৈতন্য-পরিকর*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ২০০৮, *ভারতীয় দর্শন*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রাধারমণ দত্ত ১৩৮৪, *হারামণি*, সপ্তম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সংগৃহীত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রাধারমণ দত্ত ২০০২, *রাধারমণ গীতিমালা*, নন্দলাল শর্মা সংগৃহীত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রাধারমণ দত্ত ২০০৯, *রাধারমণের গান*, তপন বাগচী সম্পাদিত, বর্ণায়ন, ঢাকা।

রাধারমণ দত্ত ২০১৪, *রাধারমণ গীতিমালা*, নন্দলাল শর্মা সংগৃহীত ও সম্পাদিত, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

রামপ্রসাদ সেন ২০১০, *শাক্ত পদাবলী* (চয়ন), অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, দ্বাদশ সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

রূপগোস্বামী, *উজ্জ্বলনীলমণি*, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভারতী প্রকাশন, কলিকাতা।

লঙিনুস ১৯৯৭, *লঙিনুসের সাহিত্যতত্ত্ব*, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত, পড়ুয়া, ঢাকা।

লালন শাহ ২০০০, *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

লালন শাহ ২০০৯, লালনসমগ্র, আবুল আহসান চৌধুরী সংগৃহীত ও সম্পাদিত, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

লুইপা ১৩৮৮, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, (প্রথম সংস্করণ ১৩২৩)।

লোচন দাস ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

শক্তিনাথ ঝা ২০১০, *বস্তুবাদী বাউল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৯৯৭, *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*, নবম সংস্করণ, জেনারেল, কলকাতা।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২০০৮, *চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭)।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০১১, *বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা : বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা*, মর্মানুবাদ : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, কলকাতা।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৯৬, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯)।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০০৪, *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৪১৬, *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য*, অষ্টম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭)।

শামসুল করিম কয়েস ২০১২, *শামসুল করিম কয়েস রচনাসমগ্র-১*, প্রকাশক : সাইফুল আলম টিপু, লন্ডন।

শান্তিরঞ্জন ভৌমিক ২০০২, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

শাহ আবদুল করিম ২০১০, *কালনীর কূলে*, বইপত্র, সিলেট।

শাহ আবদুল করিম ১৯৯৯, *কালনীর ঢেউ*, সিলেট।

শিতালং শাহ ২০০৫, *মরমী কবি শিতালংশাহ*, নন্দলাল শর্মা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৯৬২, *অলংকার-জিজ্ঞাসা*, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

শ্রীশচন্দ্র দাশ ২০০৩, *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ : পুনর্মুদ্রণ, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা।

শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৮৮, *অলংকার-চন্দ্রিকা*, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা।

সত্যবতী গিরি ২০০৭, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সরদার ফজলুল করিম ১৯৮৬, *দর্শন-কোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সরহ পাদ ২০০৭, *Buddist Mistic Songs*, Translated with annotations by Dr. Muhammad Shahidullah, Mowla Brothers, Dhaka, (First published: 1960).

সুকান্ত ভট্টাচার্য ২০১৩, *সুকান্ত-সঞ্চয়ন*, অবসর, ঢাকা।

সুকুমার সেন ১৯৯২, *ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুকুমার সেন ১৯৯৩, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

সুকুমার সেন ২০১০, *চর্যাগীতি পদাবলী*, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬)।

সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭, *বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়*, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১৯৯৮, *কাব্যালোক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী ১৩৪৫, *কীর্ত্তন পদাবলী*, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত) ১৩৯৬, *পৌরাণিক অভিধান*, ষষ্ঠ সংস্করণ, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা (প্রথম সংস্করণ ১৩৬৫)।

সুবীরা জায়সবাল ১৯৯৩, *বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

সুবোধ চৌধুরী ২০০৯, *বাঙালির বৈষ্ণব-ভাবনা*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

সুমনকুমার দাশ (সম্পাদিত) ২০১৪, *দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা*, দুর্বিন শাহ সমগ্র, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

সুমনকুমার দাশ (সম্পাদিত) ২০১৩, *সংকলনপ্রসঙ্গে*, কফিলউদ্দিন সরকারের গান, কালিকলম প্রকাশনা, ঢাকা।

সুমনকুমার দাশ (সম্পাদিত) ২০১২, *বাংলাদেশের বাউল ফকির : পরিচিতি ও গান*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ মুর্তাজা ১৯৯৮, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক ১৯৯১, *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ শাহনূর ২০১২, *বাংলাদেশের বাউল ফকির : পরিচিতি ও গান*, সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত) ১৩৮৮, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, চতুর্থ মুদ্রণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, (প্রথম সংস্করণ ১৩২৩)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২০১৩, *বৌদ্ধধর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮, *পদাবলী-পরিচয়*, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

হাছন রাজা ২০০৯, *হাছন রাজা সমগ্র*, পুনর্মুদ্রণ, দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা সম্পাদিত, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, (প্রথম প্রকাশ ২০০০)।

হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২০১০, *সাহিত্যতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২০১৩, *শাক্ত পদাবলী পরিক্রমা : তত্ত্ব ও কাব্যরূপ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৩৮৫, *লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

হুমায়ূন আজাদ ২০০০, *আমার অবিশ্বাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ২০০৯, *বাংলার বাউল*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

ক্ষুদিরাম দাস ২০০৯, *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ক্ষেত্র গুপ্ত ১৪০৩, *প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬)।

জ্ঞানদাস ১৯৯৮, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

জ্ঞানদাস ২০১০, *বৈষ্ণব পদাবলী*, চতুর্থ মুদ্রণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)।

সহায়ক প্রবন্ধ

আবুল আহসান চৌধুরী ২০০৯, হাসন রাজার মরমি-সঙ্গীতভুবন, *হাসন রাজা : মরমি মৃত্তিকার ফসল*, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

আবুল আহসান চৌধুরী ২০১৪, দুর্বিন শাহ : শ্রীভূমির মরমি সাধককবি, *দুর্বিন শাহ সমগ্র*, সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

আবুল ফতেহ ফাত্তাহ ২০০৪, বাউল কবি রাধারমণের গান : লোকজিজ্ঞাসা ও প্রেমানুভূতি, *রাধারমণ দত্ত স্মারকগ্রন্থ*, জুবায়ের আহমদ হামজা ও মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন সম্পাদিত, রাধারমণ একাডেমি, যুক্তরাজ্য।

আশরাফ সিদ্দিকী ২০০৪, তত্ত্ব সাহিত্যের কবি রাধারমণ দত্ত, *রাধারমণ দত্ত স্মারকগ্রন্থ*, জুবায়ের আহমদ হামজা ও মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন সম্পাদিত, রাধারমণ একাডেমি, যুক্তরাজ্য।

আহমদ কবির ২০০৮, পদাবলি ও জীবনীসাহিত্য, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আহমদ মিনহাজ ২০১০, শাহ আবদুল করিম : যুগজীবনের কণ্ঠস্বর, *শাহ আবদুল করিম : পাঠ ও পাঠকৃতি*, শুভেন্দু ইমাম সংকলিত ও সম্পাদিত, বইপত্র, সিলেট।

ওয়াকিল আহমদ ১৯৯৯, সিলেটে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য, *সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা।

চৌধুরী গোলাম আকবর ২০০৫, সুফিসাধক মোঃ ছলিম ওরফে শিতালং শাহ (র.), *মরমী কবি শিতালং শাহ*, নন্দলাল শর্মা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ ১৯৯৮, কবিতার কথা, *শ্রেষ্ঠ জীবনানন্দ*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, অবসর, ঢাকা।

টি এম আহমেদ কায়সার ২০১৪, দুর্বিন শার গান, *দুর্বিন শাহ সমগ্র*, সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, *বৈষ্ণবপদাবলী আলোচনা*, মাহবুবুল আলম সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

দীপংকর মোহান্ত ২০০৪, প্রসঙ্গ সহজিয়া পন্থা ও সিলেটের গ্রাম-সমাজে রাধারমণের প্রভাব, *রাধারমণ দত্ত স্মারকগ্রন্থ*, জুবায়ের আহমদ হামজা ও মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন সম্পাদিত, রাধারমণ একাডেমি, যুক্তরাজ্য।

দীপংকর মোহান্ত ২০০৭, সিলেট জেলার লোকসঙ্গীত, *লোকসঙ্গীত*, মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৯১, বাউল কবি রাধারমণ, *মাসিক সমীকরণ*, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ১৯৯১, সিলেট।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ২০০৯, হাছন-মানসের ধারা ও তাঁর সাহিত্য, *হাছন রাজা সমগ্র*, দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা সম্পাদিত, পাঠক সমাবেশ , ঢাকা।

নির্মল দাশ ২০১২, চর্যাপদের সহজপাঠ, *দশদিশি*, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০১২-মার্চ ২০১৩, কলকাতা।

নুরুল ইসলাম চৌধুরী, সাধক বাউল রাধারমণ : জীবন গাথা, *রাধারমণ-এর নির্বাচিত গান*, অনিমেশ বিজয় চৌধুরী সম্পাদিত, রাধারমণ স্মৃতিতর্পণ, সিলেট।

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ২০০৯, গানের রাজা হাছন রাজা, *হাছন রাজা সমগ্র*, দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা সম্পাদিত, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৯৯৮, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস, *বৈষ্ণবপদাবলী আলোচনা*, মাহবুবুল আলম সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

মমতাজুর রহমান তরফদার ২০০৮, ধর্মীয় জীবন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ২০০৫, শিতালং শাহ, *মরমী কবি শিতালংশাহ*, নন্দলাল শর্মা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোমেন চৌধুরী ২০০৯, একজন প্রেমিকের মন, *হাছন রাজা সমগ্র*, দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা সম্পাদিত, পাঠক সমাবেশ ঢাকা।

মোস্তাক আহমাদ দীন ২০১২, রাধারমণের গানে নারী, তার রূপক ও বাস্তব, *আটকুঠুরি*, শস্যপর্ব, সিলেট।

মোহম্মদ আলী খান ২০০৪, রাধারমণের গান : ফোকলোরের এক মূল্যবান সম্পদ, *রাধারমণ দত্ত স্মারকগ্রন্থ*, জুবায়ের আহমদ হামজা ও মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন সম্পাদিত, রাধারমণ একাডেমি, যুক্তরাজ্য।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ২০০৪, কবি রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ, *রাধারমণ দত্ত স্মারকগ্রন্থ*, জুবায়ের আহমদ হামজা ও মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন সম্পাদিত, রাধারমণ একাডেমি, যুক্তরাজ্য।

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ১৯৯৯, সিলেটের লোকসংগীত : বৈশিষ্ট্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য, *সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা।

যতীন সরকার ২০১০, শাহ আবদুল করিমের গীত : সর্বহারার দুঃখজয়ের মন্ত্র, *শাহ আবদুল করিম : পাঠ ও পাঠকৃতি*, শুভেন্দু ইমাম সংকলিত ও সম্পাদিত, বইপত্র, সিলেট।

শামসুজ্জামান খান ২০০৯, হাসন রাজার মানস-ভুবনের পটভূমি, *হাসন রাজা : মরমি মৃত্তিকার ফসল*, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

শামসুল করিম কয়েস ২০১২, রাধারমণ দত্ত, *শামসুল করিম কয়েস রচনাসমগ্র-১*, লন্ডন।

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৯৮, সিলেটী, *ছিলোটি ভাষা* (পরিশিষ্ট-১), মুহম্মদ আসাদ্দর আলী , তাইয়্যীবা প্রকাশনী, সিলেট।

স্বপন নাথ ২০১১, যমুনা উজান বহে শ্যামের বাঁশির সনে, *উলুখাগড়া* (সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক), সংখ্যা : ১৪, জুলাই ২০১১, ঢাকা।

হুমায়ুন কবীর জাহানূর ২০০৪, রাধারমণ : কালের দর্পণে অন্তরঙ্গ অবলোকন, *রাধারমণ দত্ত স্মারকগ্রন্থ*, জুবায়ের আহমদ হামজা ও মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন সম্পাদিত, রাধারমণ একাডেমি, যুক্তরাজ্য।

সাক্ষাৎকার

অনিমেশ বিজয় চৌধুরী, প্রপ্রপৌত্র, বয়স : ৩৩, সংগীত শিল্পী, সেনপাড়া, সিলেট। সাক্ষাৎকারগ্রহণ : ৩১. ০৩. ২০১২, সেনপাড়া, সিলেট।

অমিত বিজয় চৌধুরী, প্রপ্রপৌত্র, বয়স : ৩৫, পেশা : বৃটিশ হাইকমিশনের সিলেট ভিসাসেন্টারের কর্মকর্তা। সাক্ষাৎকারগ্রহণ : ৩১. ০৩. ২০১২, সিলেট।

নিশিতরঞ্জন দত্ত (জন্ম : ১৯৫৮), রাধারমণ দত্তের প্রপৌত্র, পেশা : ইঞ্জিনিয়ার, সাক্ষাৎকারগ্রহণ : ০৬. ০৪. ২০১২, শ্রীমঙ্গল।

শুক্লা চৌধুরী (জন্ম : ১৯৫৩), রাধারমণ দত্তের প্রপৌত্রী, গৃহিণী। সাক্ষাৎকারগ্রহণ : ৩১.০৩.২০১২, সেনপাড়া, সিলেট।